জুলে রিমে থেকে ফিফা

জয়ন্ত দত্ত

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ১৯৮২
ভাদ্র ১৩৮৯
প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ২৯
মুদ্রাকর
মথুরামোহন দত্ত
৭০ ডবলু. সী. ব্যানার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৬
প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়

২৬ টাকা

প্রলয় সেন

শ্রদ্ধাভাজনেষু

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

পেলের ডায়েরী	১২·০০
আমি ভিশ বলছি	১৫·০০
দুরন্ত ক্রিকেটার কপিলদেব	১২·০০

ফুটবল !

ফুটবল মানেই আনন্দ। ফুটবলের মধ্যে আছে প্রাণ, সুর, ছন্দ। সুরের সাবলীল ঐকতানে ফুটবল ক্রমান্বয়ে হয়ে উঠেছে সুসংযত এবং বিন্যস্ত।

পৃথিবীর সেরা খেলার মধ্যে ফুটবলের স্থান হলো সবার ওপরে। ফুটবল খেলে না এমন দেশ আজ আর নেই বললেই চলে। অথচ যে ফুটবলকে নিয়ে বিশ্বময় এত উন্মাদনা, উত্তেজনা এত হানাহানি, তর্কবিতর্ক—সেই ফুটবল কিন্তু আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করেছে মাত্র কয়েক বছর, যার হিসাবে শতবর্ষ পার হয় নি।

ফুটবলকে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক মূল্যবোধে পরীক্ষামূলক ভাবে জায়গা দেওয়া হয় ১৯০০ ও ১৯০৪ সালের ওলিম্পিক আসরে। ১৯০৮ সালে লণ্ডন ওলিম্পিকে ফুটবল সরকারীভাবে পাকা আসর গড়েছিলো। ১৯১৪ সালে এই আসর আরো সুসংঘবদ্ধ হয়। অর্থাৎ বলা যায় স্টকহোম ওলিম্পিকে ফুটবল সর্বপ্রথম পাকাপাকি ভাবে নিজেকে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিষ্ঠা করে।

ফুটবলের এই সীমারেখা বোদ্ধাজনেরা কিন্তু মন থেকে মেনে নিতে পারলেন না। কারণ ওলিম্পিক আসর মূলত সীমাবদ্ধ ছিল অপেশাদার গোষ্ঠীর মধ্যে। ফলে পেশাদার ফুটবল গোষ্ঠীর এই আসরে কোন ঠাঁই ছিল না। অথচ ফুটবলের যা কিছু সার্বিক সাফল্য তার মূলে ছিল পেশাদার ফুটবলারদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং প্রতিভা। বিশেষ করে ইউরোপে তখন মাথা-চাড়া দিয়ে উঠেছিলেন প্রতিভাবান ফুটবলারেরা। এরা ছিলেন মনেপ্রাণে পেশাদার, অথচ

এসব খেলোয়াড়দের মূল্য নির্ধারণ করার জন্য কোন উপযুক্ত ভূমি গড়ে উঠেনি, ফলে তাদের মধ্যে এক সুপ্ত দাবি সোচ্চারিত হয়ে উঠেছিল। তারাও চাইছিলেন প্রতিভার বিন্যাসিত রূপকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলার জন্য একটি উপযুক্ত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ভূমি —যা মূল্যবোধে সমান মর্যাদায় মাথা তুলে দাঁড়াবে ওলিম্পিক আসরের পাশাপাশি।

পেশাদার মানসিকতার এই গোপন যন্ত্রণা সর্বপ্রথম যাকে কঠিন ভাবে আঘাত করেছিল তিনি হলেন ফরাসী ফুটবল সংস্থার আচার্য মশিঁয় জুলেরিমে। তিনি তখন ফিফার সভাপতি। ১৯২০ সালে আন্টওয়ার্পে বার্ষিক সম্মেলনে তিনি এই পদ গ্রহণ করেন। সুখের কথা সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার মধ্যে বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার কথা নতুন করে নাড়া দেয়। অথচ এর বহু আগে বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার কথা ফিফা কর্তৃপক্ষের ভাবা উচিত ছিল। ১৯০৪ সালের ২১শে মে তারিখে প্যারিসে সর্বপ্রথম ফিফার অধিবেশন শুরু হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, সুইডেন ও সুইজারল্যাণ্ডের প্রতিনিধিরা। এই সভায় সর্বপ্রথম বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার স্বপ্ন আলোচনার মাধ্যমে দানা বেঁধে ছিল, ঠিক হয়েছিল এই আসর ওলিম্পিক নিয়মে প্রতি চার বছর অন্তর পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বসবে এবং পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে ফিফার হাতে।

অথচ আশ্চর্য—সেদিনের এই আলোচনা আলোচনাতেই থেকে গেল। বিশ্বকাপ নিয়ে আর কোন চিন্তা ভাবনা করা হলো না।

জুলেরিমে সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর আবার নতুন করে শুরু হলো আলোচনা। ১৯২০ সালে ঠিক হয় এই আসর অল্পদিনের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু কার্যত আলোচনার পর আলোচনা করে কেবল সময় হরণ হলো, কাজের কাজ কিছুই হলো না। ১৯২৮ সালে নবম ওলিম্পিক আসর চলাকালীন আমস্টারডামে বসলো

ফিফার সম্মেলন। এখানেও জুলেরিমের প্রস্তাবে উৎসাহ দেখানো হল বটে কিন্তু আলোচনা খুব একটা সুদূর প্রসারী হলো না। গোল বাধালো স্থান নির্বাচন নিয়ে। অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব নিতে আগ্রহী হলেন ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশ—সেই সঙ্গে লাটিন-আমেরিকা গোষ্ঠীও।

ইউরোপের ধারণা ছিল, তারাই হলো পেশাদার ফুটবলের পথিকৃত অতএব ফুটবলের দেবভূমি যখন ইউরোপ তখন বিশ্বকাপ ইউরোপেই অনুষ্ঠিত হোক।

ইউরোপের এই দাবি যেমন একেবারে অমূলক ছিল না, তেমনি একবারে উড়িয়ে দেওয়া গেল না দক্ষিণ মার্কিন মুলুকের দেশ উরুগুয়ের প্রস্তাবকে।

উরুগুয়ের প্রতিনিধি পরিষ্কার জানালেন, গত ওলিম্পিকের দুটি আসরেই তারা সোনা জয় করে প্রমাণ করেছেন বিশ্বে তারা ফুটবলের শ্রেষ্ঠ দল, কাজেই তারা চান তাদের দেশের মাটিতেই বিশ্বকাপের আয়োজন করা হোক।

আলোচনার অবস্থা দেখে সহজে অনুমান করা গেল কোন পক্ষই স্বার্থত্যাগ করতে রাজি নয়। এমত অবস্থায় জুলেরিমে পড়লেন বিপাকে। তার অবস্থা তখন শ্যাম রাখি না কুল রাখি। তবু তিনি ঠাণ্ডামথায় ধৈর্যের পরিচয় দিতে কসুর করলেন না।

এরপর উরুগুয়ের প্রতিনিধি বললেন, ১৯৩০ সাল অর্থাৎ আগামী বছর আমাদের স্বাধনীতা শতবার্ষিকী উদযাপন হবে। কাজেই আমরা চাই আমাদের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানকে ঐতিহাসিক করে তুলতে বিশ্বকাপের আয়োজন করতে—মনে হয় স্বাধীনতার কথা স্মরণ করে আমাদের এই প্রস্তাব সবাই সমর্থন করবেন।

মোক্ষম অস্ত্র—স্বাধীনতার শতবার্ষিকী, অতএব মুখে কেউ আর রা কাটতে পারলেন না। তবু ইউরোপ গোষ্ঠী থেকে কেউ কেউ বললেন, উরুগুয়ে খেলা হলে আমাদের ব্যয়ভার বৃদ্ধি পাবে।

উরুগুয়ের প্রতিনিধি উঠে দাঁড়িয়ে জানালেন, 'আমরা এই ব্যয়ভার বহন করতে রাজি।' অতএব সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো প্রথম বিশ্বকাপ আসর উরুগুয়েতে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু ইউরোপের দেশগুলির এই প্রসঙ্গে অনিহা দেখা গেল। তারা নিজেদের এই লড়াইয়ের জন্য তৈরী করলো না। নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন কোন নাম পাওয়া গেল না, তখন বেশ চিন্তায় পড়লেন ফিফার কর্তারা। তাহলে কি উরুগুয়েতে আসর বসবে না?

বহু টানাপোড়েনের পর কিছু নাম পাওয়া গেল। ফ্রান্স মোটেই আগ্রহী ছিল না, তবু তাদের যেতে হলো, কারণ মশিঁয় জুলেরিমে সভাপতি এবং তিনি তাদের প্রতিনিধি। এছাড়া বহু ধরাধরি করার পর উরুগুয়ে যেতে রাজি হলো বেলজিয়াম, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া। তাও রুমানিয়াকে একরকম প্রায় জোর করেই পাঠানো হলো। তারা মোটেই তৈরী ছিল না। কেন যে তারা উপযুক্ত সময় থাকতে তৈরী হলো না তা বোঝা গেল না। আসলে তাদের মোটেই ইচ্ছে ছিল না উরুগুয়ে যাওয়ার, অথচ এই রুমানিয়া প্রথম থেকেই উৎসাহ প্রকাশ করেছিল ষোলোআনা। তাদের যোগদানের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে, তারা জানালেন, তাদের দেশের নামী খেলোয়াড়েরা সবাই বৃটিশ অয়েল কম্পানীতে কাজে আছেন, ছুটি পাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত এই অচল অবস্থাকে দূর করলেন রুমানিয়ার কিং ক্যারল। তিনি নিজে ওই অয়েল কম্পানীর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে খেলোয়াড়দের ছুটি মঞ্জুর করালেন। বলাবাহুল্য কিং ক্যারল নিজে আগ্রহী না হলে প্রথম বছর বিশ্বকাপে রুমানিয়ার অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হতো না।

বহু কাঠখড় পোড়ানোর পর শেষ পর্যন্ত মোট তেরোটি দেশ নাম লেখালো। অশুভ তেরো দল নিয়েই তৈরী করা হলো চারটি মাত্র গ্রুপ। একটি গ্রুপে রাখা হলো চারটি দল, এক নম্বর পুলে রইল—আর্জেন্টিনা, চিলি, ফ্রান্স ও মেকসিকো, দুই নম্বর পুলে—যুগোশ্লাভিয়া,

ব্রাজিল, বলিভিয়া, তিন নম্বর পুলে—উরুগুয়ে, পেরু, রুমানিয়া এবং চতুর্থ পুলে আমেরিকা, প্যারাগুয়ে বেলজিয়াম।

প্রথম বিশ্বকাপ আসর একদিকে যেমন অশুভ তেরো দল নিয়ে শুরু হলো, তেমনি উদ্বোধনের তারিখ নির্ধারিত হলো জুলাই মাসের ওই একই অশুভ দিনে অর্থাৎ ১৩ই জুলাই।

জুলেরিমে প্রতিযোগিতা শুরু : (১৯৩০)

বিশ্বকাপ আসর জনমহলে জুলেরিমে নামে পরিচিত, ফিফার সভাপতি মঁশিয়ে জুলেরিমে বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে এই স্বর্ণ কাপটি দান করেন। বিজয়ী দলকে জুলেরিমের নামানুসারে যে ট্রফি দেওয়া হয়—তাকেই বলা হয় 'সোনার পরি', সাড়ে বারো ইঞ্চি লম্বা সুদৃশ্য ট্রফিটি একটি পরীর মূর্তিতে গড়া।

রাজসিক পরিবেশের মধ্যে ১৩ই জুলাই তারিখে শুরু হলো জুলেরিমের শুভ উদ্বোধনী পর্ব। এই উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হলো ফ্রান্স ও মেকসিকো দলের মধ্যে। প্রথম কিক অফের সম্মান পেয়েছিল ফ্রান্স দল।

এই ম্যাচে প্রথম গোলটি এলো ফ্রান্সের তরুণ লেফট ইন লুই লরেন্টের পা থেকে। এই ম্যাচে ফ্রান্স জয় পেয়েছিল ৪-১ গোলে। অন্যদিকের পুল লীগে যুগোশ্লাভিয়া হারালো ২-০ গোলে ব্রাজিলকে, পরের ম্যাচে ব্রাজিল অবশ্য ৪-০ গোলে জয় পেয়েছিল, তবু একটি ম্যাচ হারার জন্য তারা সেমিফাইনালে উঠার সুযোগ পেলো না। ক বিভাগ থেকে আর্জেন্টিনা তিনটি খেলায় জয় পেয়ে উঠলো সেমিফাইনালে। পরের দুটো ম্যাচেই হার হলো ফ্রান্সের। খ বিভাগে দুটি খেলায় চার পয়েন্ট পেয়ে চাম্পিয়ান হলো যুগোশ্লাভিয়া। গ বিভাগে উরুগুয়ের জায়গা হলো প্রথম সারিতে, তারা দুটি ম্যাচে হারালো পেরু ও

রুমানিয়াকে। সবচেয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে সেমিফাইনালে উঠলো যুক্তরাষ্ট্র। দুটি ম্যাচেই তারা জয় পেলো ৩-০ গোলে। তাদের কাছে প্রথম হারলো প্যারাগুয়ে ও শেষ খেলায় বেলজিয়াম।

গ্রুপ লীগের শেষে চারটি গ্রুপ থেকে সেমিফাইনালে উঠলো মোট চারটি দল।

সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হলো যুক্তরাষ্ট্র এবং যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে উরুগুয়ে।

এই দুই সেমিফাইনালের মধ্যে সেরা খেলা হলো যুগোশ্লাভ বনাম উরুগুয়ের মধ্যে। উরুগুয়ে সে বছর বিশ্বের একটি সেরা দল। ১৯২৪ ও ১৯২৮ সালের ওলিম্পিকে তারা স্বর্ণপদক শুধু জয় করেনি, গত আসরে তারা আর্জেন্টিনাকে বড়সড় ব্যবধানে হারিয়েছিল। কাজেই সদ্য ওলিম্পিক বিজয়ী দল হিসাবে তারা প্রাণশক্তি উজাড় করে নামলো মাঠে। সেই সঙ্গে মনে রাখা দরকার উরুগুয়ে ছিল সংগঠন দল—কাজেই তাদের পক্ষে যে জনসমর্থন ষোলোআনা জয়ের প্রেরণা যোগাবে তাতে কারো মনে কোন সন্দেহ ছিল না। বিপুল জনসমর্থনের প্লাবনে উরুগুয়ে অতিসহজে ৬-১ গোলে ম্যাচ জিতলো যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে। চমৎকার খেললেন সি. ও অ্যানাসেলমো। আগের ম্যাচেও তারা গোল করেছিলেন। ইউরোপের প্রতাপশালী দেশ যুগোশ্লাভ এই ম্যাচে দাঁড়াতেই পারলো না। দ্বিতীয়ার্ধে কোনরকমে একটি মাত্র গোল দিলেন সিউলিক।

অন্যদিকে দুর্ধর্ষ আর্জেন্টিনা ৬-১ গোলের ব্যবধানে হারালো যুক্তরাষ্ট্রকে। ফলে ফাইনালে মুখোমুখি হলো দক্ষিণ মার্কিন মণ্ডলের দুই সেরা প্রতিদ্বন্দ্বী—আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ে। ফুটবল ঘিরে এই মিলন ছিল উত্তেজনায় পরিপূর্ণ। ফুটবল তো খেলা নয়, যেন রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। কেউ কারো চেয়ে কম নয়।

৩০শে জুলাই—উরুগুয়ের নবনির্মিত স্টেডিয়ামে বসলো ঐতিহাসিক ফাইনাল আসর। তৈরী হলো দুই দেশ—কেউ কাউকে

পথ ছেড়ে দিতে রাজি নয়। আর্জেন্টিনার প্রতিটি খেলোয়াড় তৈরী হলো মনেপ্রাণে—এই ম্যাচে তাদের পূর্ব পরাজয়ের বদলা নিতে হবে। যে করেই হোক হারাতে হবে উরুগুয়েকে। ম্যাচের আগে নদীপথ পার হয়ে বুয়েনস এয়ার্স থেকে দলে দলে আর্জেন্টিনার সমর্থকেরা এসে হাজির হলো উরুগুয়ে। মন্টিভিডিও শহর তখন উত্তেজনার আগুনে উত্তপ্ত। দেখতে দেখতে বেড়ে গেল মন্টিভিডিওর বাজারের বাজির দর।

যে দুরন্ত মানসিকতা নিয়ে আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়েরা মাঠে নেমেছিলেন, তার কণামাত্র ফলশ্রুতির পরিচয় তাদের খেলায় পাওয়া গেল না। ম্যাচ শুরু হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আত্মপ্রত্যয়ের কঠিন প্রাচীর গড়ে তুললো উরুগুয়ের খেলোয়াড়েরা। একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে তারা বিধ্বস্ত করে তুললো আর্জেন্টিনার রক্ষণ-ভাগকে। তাদের সেই অপ্রতিরোধ্য আক্রমণের সামনে অচিরেই গুঁড়িয়ে গেল আর্জেন্টিনার আত্মনির্ভর কঠিন কাঠামো। ৪-২ গোলের ব্যবধানে ঐতিহাসিক ম্যাচ জিতলো উরুগুয়ে। এই জয় তাদের জাতীয় জীবনের কাছে এনে দিল এক নতুন প্রেরণা। মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে তারা জয় করলো ফুটবলের দুই শ্রেষ্ঠ সম্মান। ওলিম্পিকের স্বর্ণপদক সহ বিশ্বকাপ জয় প্রমাণ করে দিলো বিশ্ব ফুটবলের সার্বিক মূল্যায়নে উরুগুয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দল। তাদের এই সাফল্য আন্তজার্তিক পর্যায়ে মর্যাদা বাড়িয়ে দিল। বাড়িয়ে দিল ল্যাটিন আমেরিকার আত্মনির্ভর ফুটবল চেতনাকে। বুঝিয়ে দিল সার্থকতা ও সাফল্যের শীর্ষে বিশ্বফুটবলে উরুগুয়ের প্রকৃত পরিচয়।

একে বিশ্বকাপ জয়—তায় আবার প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ আর্জেন্টিনাকে হারানো—মন্টিভিডিওতে বয়ে গেল উচ্ছ্বাসের বন্যা। জাহাজের ভেঁপু বাজলো। বাজালো হাজার হাজার মোটর গাড়ির হর্ন। রাজপথে পটকা ফাটল, বাজির ফোয়ারায় আলোকিত হলো গোটা শহর। রেস্তরাঁয় রেস্তরাঁয় শ্যামপেনের জোয়ার বয়ে গেলো। জয়ের আনন্দে

হাজার হাজার জনতা রাজপথ, জনপথে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো বিজয় উৎসব পালনে। লক্ষ লক্ষ দর্শকদের জয়ধ্বনির মধ্যে দিয়ে রাজসমারোহে সুদৃশ্য স্বর্ণকাপ হাতে তুলে নিলেন বিজয়ী দলের নেতা নাসাজি। পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্কে তৈরী 'সোনার পরি' সেই এলো উরুগুয়ের দখলে। চরম এই শুভ ঐতিহাসিক মুহূর্তে নিঃশব্দে চোখের জল ফেললেন একজন মানুষ। আবেগে তার গোটা শরীরটা থরথর করে কাঁপছিল। তার এই কান্না তো কান্না নয়—এ যে তার আনন্দাশ্রু। জীবনের পরম এক স্বপ্ন সত্য এতদিনে চরম বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে তার জীবনে। সভাপতি জুলেরিমে আজ সম্পূর্ণ তৃপ্ত মানুষ। বহুদিনের প্রত্যাশা সফল হয়েছে।

ফাইনালে উরুগুয়ে জয় পেল—সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হলো বিশ্ব ফুটবলে তাদের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি। কিন্তু ইউরোপ গোষ্ঠী এই প্রাধান্যকে মেনে নিলো না। তারা বললেন, যে আসরে বিশ্বের সেরা পেশাদারেরা যোগ দেয়নি—সেই আসরে আবার শ্রেষ্ঠ দল নির্বাচিত হয় কি করে।

থাক এই সম্পর্ক—এবার ফিরে তৃতীয় স্থান নির্বাচন প্রসঙ্গে। এই আসরে তৃতীয় স্থান নির্ধারণের জন্য কোন খেলা হয় নি। গোল এ্যাভারেজে এই পুরস্কার দেওয়া হয় যুক্তরাষ্ট্রকে।

প্রথম বিশ্বকাপ আসরে সর্বপ্রথম মাঠ থেকে বহিষ্কৃত হলেন পেরুর অধিনায়ক ও রাইট ব্যাক ভিলা ক্যাসিয়াস। রুমানিয়ার বিরুদ্ধে তিনি দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করে খেলার জন্য বেচারা স্টিনারের পায়ের হাড় ভেঙে যায়। রেফারি ক্যাসিয়াসকে এই ঘটনার জন্য মাঠের বাইরে বার করে দেন। ফাইনাল সহ এই টুর্নামেন্টে আর্জেন্টিনার গোল করার সংখ্যা দাঁড়ায় আঠারোটি। আর এই আঠারোটি গোলের মধ্যে এক আর্জেন্টিনার পুল লীগেই গোল সংখ্যা ছিল দশটি। টুর্নামেন্টে গোলের মোট সংখ্যা ছিল সত্তরটি।

প্রথম বিশ্বকাপ আসরে সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান পান আর্জেন্টিনার স্ট্যাবাইল। তিনি দিয়েছিলেন আটটি গোল। স্ট্যাবাইলের পর জায়গা হয় উরুগুয়ের সি'র—তার গোলের সংখ্যা ছিল পাঁচটি।

প্রথম বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা সাফল্যের সঙ্গে শেষ হওয়ার পরই ফিফার কর্তারা পরবর্তী আসর সম্পর্কে আলোচনায় বসলেন। দীর্ঘ আটটি আলোচনা চক্রের পর সভার সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিলেন ১৯৩৪ সালে দ্বিতীয় বিশ্বকাপের আসর বসবে ইতালির রোম শহরে।

ইতালির জয়জয়কার

ফুটবলে যে ইউরোপের প্রাধান্য অনেক বেশী তার প্রমাণ মিললো পরবর্তী আসরে। লাটিন-আমেরিকা গোষ্ঠীর সমস্ত প্রাধান্যকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বিশ্ব ফুটবল তুনিয়ায় ইউরোপীয় শক্তি প্রতিষ্ঠা করলো নিজস্ব সাম্রাজ্য। ওলিম্পিক আসরে শুধু নয়, জুলেরিমের রণাঙ্গনেও পিছু হটতে বাধ্য হলো দক্ষিণ মার্কিন মণ্ডলের শক্তিশালী দলগুলি। ১৯৩২ সালের ওলিম্পিক আসরে ইউরোপের প্রধান শক্তি ইতালি সোনা জয় করলো। এই জয় ইতালির মানসিক দৃঢ়তা বাড়িয়ে দিলো জুলেরিমে জয়ের পথে নতুন প্রেরণা যোগাতে।

বলাবাহুল্য ১৯৩৪ সালের বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছিল ওলিম্পিক জয়ী ইতালী দল। মহান পোজো নেতৃত্বে ইতালি সেদিন সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিল বিশ্বকাপ জয়ের সংকল্পে।

ইতালিতে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হওয়ায় ইউরোপের দেশগুলি মোটের ওপর খুশী ছিল। তারাও তৈরী হলো কোমর বেঁধে লড়াই করার জন্য। কিন্তু এই আসর নিয়ে এবার নানান অজুহাতে আপত্তি এলো দক্ষিণ মার্কিন মণ্ডলের শ্রেষ্ঠ দলগুলির পক্ষ থেকে। একমাত্র

ব্রাজিল ছাড়া আর কোন দল নাম পাঠাতে রাজি হলো না। বিশেষ করে গতবারের বিশ্বকাপ জয়ী উরুগুয়ে বিগত অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে বদলা নিলো। তারা পরিষ্কার জানালো তাদের পক্ষে এই মুহূর্তে ইউরোপে গিয়ে ফুটবল খেলা সম্ভব নয়। আসলে ওলিম্পিক আসরের ব্যর্থতা উরুগুয়ের মানসিক শক্তিকে অনেকখানি দুর্বল করে দিয়েছিল। ইতালির প্রাধান্য সম্পর্কে তাদের মনে কার্যত কোন সন্দেহ ছিল না। তাছাড়া ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইতালি ছিল চৌত্রিশ সালের সংগঠন দেশ—অতএব সে দেশে গিয়ে বিশ্বকাপ জয় করা যে উরুগুয়ের পক্ষে সম্ভব হবে না, সেই বিষয়ে তারা প্রায় একরকম নিশ্চিন্ত হয়েই বিশ্বকাপ যুদ্ধের সঙ্গে নিজেদের নামকে যুক্ত করতে রাজি হলো না। যারা বোদ্ধা তারা কিন্তু উরুগুয়ের মনোভাবকে সমর্থন করলেন না। বরং উরুগুয়ের এই হীনমন্য আচরণের জন্য যে ভবিষ্যত ফুটবল অধ্যায়ে প্রতিহিংসা বৃদ্ধি পাবে একথাই তারা বললেন।

মনে মনে হেসেছিলেন পোজো। উরুগুয়ে হাজির না হলেও, শেষ পর্যন্ত লাটিন আমেরিকা থেকে ইতালির আসরে উপস্থিত হয়েছিল ব্রাজিল ও গতবারের রানার্স আর্জেন্টিনা। ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশই এলো এই আসরে অংশ নিতে। ইংল্যাণ্ড বিশ্বকাপ নিয়ে উৎসাহী নয়—তাদের কাছে এফ. এ কাপের গুরুত্ব অনেক বেশী।

ইতালির আসরে যে কে জিতবে সে কথা হলফ করে বলা সম্ভব হলো না কারো পক্ষে। ইতালির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ইউরোপে তখন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে অস্ট্রিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, সুইডেন, চেকোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরী। এরা কেউ কারো চেয়ে কম নয়। তবু এর মধ্যে শক্তি বিচারে ইতালির পক্ষেই ছিল ষোলোআনা বাজির দর। মহান পোজো তার দলকে সামরিক শৃঙ্খলায় গড়ে তুলে ছিলেন। তার একটিমাত্র প্রশ্ন ছিল দলীয় খেলোয়াড়দের কাছে—"আমি তোমাদের কাছে হারজিৎ চাই না, চাই বিশ্বকাপ। তোমরা যেমন ভাবে আমাকে

ওলিম্পিকের সোনা এনে দিয়েছ, সেইভাবে এনে দেবে জুলেরিমে !"

ইতালির আসরে প্রথম রাউণ্ডের খেলায় জয় পেলো ইউরোপের দলগুলি। নকআউট পদ্ধতির খেলায় প্রতিযোগিতার আসর থেকে ছিটকে গেল ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, যুক্তরাষ্ট্র।

ইতালি প্রথম ম্যাচ জিতলো আমেরিকার বিরুদ্ধে ৭-১ গোলে। সহজ জয়। এই ম্যাচে ইতালির ছেলেরা ইচ্ছে করলে গোল সংখ্যা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করতে পারতো, কিন্তু পোজো তাদের অযথা শক্তিক্ষয় করতে নিষেধ করলেন। গায়ের জামা ঘামে ভেজার আগেই দেখা গেল ইতালি সাত-সাতটা গোল দিয়ে বসে আছে। প্রথম রাউণ্ডে ইতালির সাফল্য ইউরোপের অন্য দেশগুলিকে সতর্ক করে দিল। তারা পরিষ্কার বুঝতে পারলো, মুসোলিনীর আদর্শ পালিত পোজো সহজে কাউকে ছেড়ে দেবেন না। তিনি তার দলকে মিলিটারী কায়দায় চালিত করছেন। মাঠে হাজির থাকছেন স্বয়ং মুসোলিনী। কাজেই সব মিলিয়ে ইতালির জয় সম্পর্কে একরকম প্রায় নিশ্চিত ছিলেন সে দেশের সমর্থকেরা। তবুও আমরণ লড়াই করলো অস্ট্রিয়া, জার্মানী, চেকোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরী। প্রথম রাউণ্ডে সেরা খেলা হলো সুইডেনের সঙ্গে আর্জেন্টিনার। উভয় দলই প্রাণপাত করলেন গোলের জন্য। সমানভাবে লড়াই চালালেন। একদল গোল দিলে পরক্ষণে অন্যদল গোল শোধ করলেন। খেলা চলেছিল দুরন্ত গতিতে। এত করেও আর্জেন্টিনা নিজেদের ধরে রাখতে পারলো না। সুইডেনের জোহানসনের দেওয়া শেষ গোলে স্মরণীয় ম্যাচের নিষ্পত্তি ঘটলো ৩-২ গোলে।

নেপলসে হাঙ্গেরীকে মুখোমুখি হতে হলো মিশরের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচ নিয়ে হাঙ্গেরীয়ানদের মনে সন্দেহ ছিল। ১৯২৪ সালে প্যারিস ওলিম্পিকে হাঙ্গেরীর সোনা জয়ের সমস্ত সম্ভবনাকে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিয়েছিল এই মিশর। কাজেই পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করেই হাঙ্গেরীয়ানরা আত্মনির্ভরতার ক্ষেত্রে কিছুতেই সক্রিয় হতে

পাচ্ছিলেন না। ম্যাচ শুরু হওয়ার আগেই তারা পরাজয়ের দুঃস্বপ্নে উদভ্রান্তের মতো হোটেলের করিডোরে পায়চারি করতে লাগলেন। একথা মিথ্যে নয়, যে ইজিপ্ট তখন একটি শক্তিশালী দেশ। তারা শুধু ওলিম্পিক আসরে যে হাঙ্গেরীকে ৩-০ গোলে হারিয়ে দিয়েছিল তাই নয়—চার বছর বাদে আমস্টার্ডামে সেমিফাইনালে উঠে তুমুল লড়াই করেছিল আর্জেন্টিনার মতো শক্তিশালী দেশের সঙ্গে। যদিও তারা ম্যাচ হেরেছিল ৪-২ গোলে, তবু এই খেলা বহুকালের জন্য স্মরণীয় হয়েছিল। অতএব সব মিলিয়ে হাঙ্গেরীয়ানদের এই ম্যাচ সম্পর্কে ভীত হওয়ার পিছনে কারণ ছিল যথেষ্ট। নেপলসে ম্যাচ নিয়ে উত্তেজনার শেষ ছিল না। এই ম্যাচ হাঙ্গেরীর খেলোয়াড়েরা স্বদেশের মর্যাদা রক্ষায় জীবন উৎসর্গের সংকল্প নিলেন। প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে হাঙ্গেরী ফুটবলের সমস্ত আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ করে শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জিতলো ৪-২ গোলে। সেরা খেলোয়াড় জর্জ সারোশি খেলতে না পারলেও অসাধারণ ফুটবল খেললেন টেলেকি, ভিনজ। ক্ষতবিক্ষত হাঙ্গেরীয়ানরা ম্যাচ জিতে মাঠের মধ্যে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তাদের ভাব দেখে মনে হলো, তারা যেন এই ম্যাচ জিতেই জুলেরিমে ঘরে তুলে নিয়েছেন।

অন্যদিকে মিলানে সুইজারল্যাণ্ড হল্যাণ্ডকে হারালো ৩-২ গোলে। চমৎকার দুটি দর্শনীয় গোল দিলেন সুইস দলের সুযোগ সন্ধানী ফরোয়ার্ড চশমা চোখো কিয়েলহোল। অন্য গোলটি হলো অ্যাবেগ্লেনের দুরন্ত শট থেকে। হল্যাণ্ডের পক্ষে দুটি গোল দিলেন যথাক্রমে স্মিট ও ভেনটি।

তুরানের ম্যাচে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল ফ্রান্স। অপেক্ষাকৃত কমজোরী দল নিয়ে দুর্ধর্ষ অস্ট্রিয়াকে তারা ভীষণভাবে রুখে দিলো। এই ম্যাচে শেষ পর্যন্ত কোনপক্ষে জিতবে একথা কারো পক্ষে হলপ করে বলা সম্ভব ছিল না। ভাগ্য অনুকূল না থাকায় শেষ মুহূর্তের

গোলে ম্যাচ হারতে বাধ্য হলো ফ্রান্স। খেলা শেষ হলো ৩-২ গোলের ব্যবধানে। এই গোল সম্পর্কে প্রতিবাদ ছিল ফরাসীদের। তারা অতিরিক্ত সময়ের এই বিতর্কিত গোলটির জন্য দায়ী করলেন ডাচ রেফারী ভ্যান মুর্সেলকে। সমালোচনায় পরিষ্কার বলা হলো, স্কল অফসাইডে দাঁড়িয়ে বলটি ধরেছিলেন। আর অফসাইড নিশ্চিত জেনেই স্কলকে ফরাসীরা কোনরকম বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে নি।

আশ্চর্য মন্দভাগ্য ফ্রান্সের। গত বিশ্বকাপেও তাদের হার স্বীকার করতে হয়েছিল ব্রাজিলের রেফারি অ্যান্টোনিও রিগোর ভুলের জন্য। একাশি মিনিটের মাথায় ফ্রিকিক থেকে প্রথম গোল করে মন্টি এগিয়ে দিয়েছিল আর্জেন্টিনাকে। পরমুহূর্তে ফ্রান্স পালটা আক্রমণে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। তিন মিনিটের মধ্যেই যখন ফ্রান্সের ল্যানজিলার গোল প্রায় শোধ করার জন্য শট নিতে যাবেন, ঠিক তখনই সকলকে বিস্মিত করে খেলা শেষের বাঁশি বাজিয়ে দিলেন রিগো। আর্জেন্টিনার সমর্থকেরা বেড়া টপকে মাঠে নেমে পড়লেন। ফ্রান্সের খেলোয়াড়েরা তেড়ে গেলেন রেফারির দিকে। ছুটে এলেন মাঠের বাইরে থেকে ফ্রান্সের বেশ কিছু কর্তাব্যক্তিরা। তারা ঘড়ি দেখিয়ে রেফারিকে বললেন, খেলা শেষ হতে এখনও কিছু সময় বাকি আছে। এরপরই শুরু হয়ে যায় দুই পক্ষের ধস্তাধস্তি, হাতাহাতি। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য মাঠের মধ্যে নামানো হলো অশ্বারোহী পুলিশ বাহিনী। রেফারি রিগো বুঝতে পারলেন ভুলটা তার নিজের হয়েছে। সত্যি সময়ের আগেই বেজে গেছে মুখের বাঁশি। অতএব আবার মাঠ ফাঁকা করে খেলোয়াড়দের নতুন করে খেলার জন্য অনুরোধ করা হলো। অশান্ত পরিবেশ শান্ত করে যখন খেলা আরম্ভ হলো তখন আর ফরাসী খেলোয়াড়দের মনে কোন উৎসাহ ছিল না। ফলে দায়সারা মনোভাব নিয়ে ফরাসীরা মাঠে নেমে খেলার শেষের বাঁশির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

থাক—পুরনো প্রসঙ্গ। তুরানের ম্যাচের কথায় ফিরে আসি।

শেষ মুহূর্তের বিতর্কিত গোলে ফ্রান্স হারালো ২-১ গোলে। এই গোল সম্পর্কে ফরাসীদের প্রতিবাদ যে মিথ্যে ছিল না তার প্রমাণ মিলেছিল কয়েক বছর পর। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে স্কল বললেন, "সেদিনে গোলটি করার সময় সত্যি আমি অফসাইডে ছিলাম। কেন যে এই অফসাইড রেফারি দিলেন না, তা আমার জানা নেই। আমি তো গোলে শট করার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলাম বাঁশি বাজার জন্য।"

ইতালি বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশী যারা মানসিক ভাবে তৈরী হয়ে এসেছিল তারা হলো জার্মানি। অথচ বেলজিয়ামের সঙ্গে প্রথম খেলায় মাঠে নেমে তারা সুবিধে করতে পারলো না। বিরতির আগেই বেলজিয়াম এগিয়ে গেল দু-দুটো গোল দিয়ে, তাহলে কি জার্মান বিধ্বস্ত হবে?

তাদের চোখের ওপর ভেসে উঠেছিল মহামান্য ফ্যাসিস্ট নেতা হিটলারের মুখটি, দেশে ফিরে কি জবাব দেবেন ফ্রনজ শেপানের, মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে উঠেছিল জার্মান দল। হাফটাইমের পর তারা আগুনের মতো ডেসিংরুমের দরজা খুলে মাঠে নেমে এলেন। তাদের জ্বলে ওঠা আত্মবিশ্বাসে কাছে বেলজিয়ামের মতো একটি ক্ষীণ শক্তির দেশ অচিরে বিধ্বস্ত হলো। হ্যাটট্রিক করলেন কোলেন। অন্যদুটি গোল এলো কোবিরস্কির দূরন্ত শট থেকে।

প্রথম রাউণ্ডের খেলা শেষ হয়ে শুরু হলো দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলা। এই পর্যায়ে দেখা গেল মোট আটটি দেশকে। সবকটি দেশই ইউরোপের। লাটিন আমেরিকা কোন দলই এই আসরে প্রাধান্য বজায় রাখতে পারলো না। এই আটটি দেশ হলো যথাক্রমে—ইতালি, চেকোশ্লাভিয়া, জার্মান, সুইজারল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, অস্ট্রিয়া, স্পেন, সুইডেন।

দ্বিতীয় রাউণ্ডের ফুটবলে সমবেত দর্শকদের দৃষ্টি কেড়ে নিলো দুটি ম্যাচ। একটি ফ্লোরেন্সে ইতালি বনাম স্পেন, অন্য ম্যাচটি ছিল

বলোগনায় অস্ট্রিয়া বনাম হাঙ্গেরীর মধ্যে। ফ্লোরেন্সের এই ম্যাচ সম্পর্কে ভয়ের কারণ ছিল ইতালির, স্পেন তাদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। বিশেষ করে প্রবাদপুরুষ জামোরাকে নিয়ে ভিক্টর পোজোর মতো ইতালীয়ানদের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। যদিও জামোরা বুড়ো হয়ে গেছেন, তার খেলার মধ্যে সেই আর আগের ধার নেই, তবু বোদ্ধা ইতালিয়ানরা সরব হতে পারলেন না। তারা জানতেন স্পেনকে যদি জয়ের মুখ কেউ দেখাতে পারে তাহলে পারবে ওই বুড়ো জামোরা। অতএব পোজো বিশ্বসম্মান অর্জন করার সংকল্পে খেলোয়াড়দের নির্দেশ দিলেন, তোমরা যে করেই হোক ওই বুড়োটাকে একদম ছাড়বে না। প্যারিসের ওলিম্পিক আসরে মাঠে নামার আগে এই জামোরা নাকি সাংবাদকিদের পরিষ্কার বলেছিলেন 'এই ম্যাচে আমরা জিতছি'। এবার দশবছর বাদে সেই সংবাদিকের সঙ্গে দেখা হলে জামোরা বললেন, 'ফলাফল কি হবে জানি না, তবে আমি আমার জীবনের সেরা ম্যাচ খেলবো।'

সত্যি জীবনের সেরা ম্যাচ খেলেছিলেন বুড়ো জামোরা, পোজোর নির্দেশ পেয়ে ইতালিয়ানরা যত বেশী নৃশংস হয়ে উঠেছিল, ঠিক ততোধিক ঠাণ্ডা মাথায় পরিচ্ছন্ন ভাবে জাদু খেলা দেখিয়েছিলেন জামোরা। কোনরকম মারের সামনে তিনি মাথা নত করেন নি। বুক পর্যন্ত পা তুলেও দাবিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি জামোরাকে। তিনি অবলীলায় হজম করেছিলেন বিপক্ষের সমস্ত বাধা। নৃশংস মারের সামনে ক্ষতবিক্ষত জামোরার তোয়াক্কাহীন বেপোরোয়া খেলা দেখে মনে মনে তারিফ করেছিলেন পোজো। আহা এমন একজন যদি তার দলে থাকতো। বিরতির আগেই প্রায় কুড়িটি কর্ণার কিক ইতালি নষ্ট করতে বাধ্য হলো জামোরার জন্য। স্পেনের পক্ষে প্রথম গোল এলো ফ্রিকিক থেকে। বল বসিয়ে স্পেন ফরোয়ার্ড ল্যাঙ্গারো ফলস্ ছুটলেন। মুহূর্তে দেখা গেল সেই বলে উল্টো দিক থেকে ছুটে এসে বাঁকা শট নিলেন রিগুইয়ে। চমৎকার সোর্য়াব শট বাতাসে

বাঁক খেয়ে গোলে ঢুকে গেল। হতভম্ব হয়ে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকলেন ইতালির গোলরক্ষক কম্বি। বিরতির পর পোজোর উস্কানিতে মরিয়া হয়ে খেললেন ইতালিয়ানরা। শোনা গেল মুসেলিনী মাঠে আসছেন। ইতালিয়ানরা গোল শোধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য করলেন জামোরাকে। পেনালটি বক্সের মধ্যে বুড়ো জামোরো তখন একা। শিয়াভিও গোল করার জন্য যতটা সম্ভব ভিতরে ঢুকে জোরালো শট নিলেন। বেচারা বুড়ো জামোরার কিছু করার ছিল না। তবুও তিনি প্রাণপণে শূন্যে বাজপাখির মতো শরীরটা ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। বল তার হাত স্পর্শ করে পোস্টের গা ঘেঁষে জালে জড়িয়ে গেল।

এতক্ষণ মাঠের বাইরে ছটফট করছিলেন ভিক্টোর পোজো, তিনি মহাখুশী। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখের ঘাম মুছলেন তারপর টাচ লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে উপদেশ দিতে লাগলেন খেলোয়াড়দের। অতিরিক্ত সময় খেলা হলো, পোজোকে সারাক্ষণ মাঠের বাইরে তৎপর থাকতে দেখা গেল। তিনি ঘনঘন মাঠের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে ছুটে শিয়াভিও, গাইতা, ওরিসিকে উজ্জীবিত করতে লাগলেন। কিন্তু এত করেও প্রথম দিনের ম্যাচে আর কোন গোল হলো না।

পরের দিন রিপ্লে। চিন্তায় পড়লেন স্পেন কর্তৃপক্ষ। প্রথম ম্যাচে ইতালির নৃশংস অত্যাচারে বুড়ো জামোরা ক্ষতবিক্ষত। তার পক্ষে রিপ্লে ম্যাচে মাঠে নামা সম্ভব হলো না। তার জায়গায় গোলে নামলেন নগুয়ের্ট। জামোরা না খেলায় ইতালিয়ানরা নিশ্চিন্ত হলো অনেকখানি। এই ম্যাচে পোজো বহু ভাবনা চিন্তা করে দলের কিছু রদবদল করলেন। পিজিওলোর পায়ে গুরুতর আঘাত লাগায় তার জায়গায় আনা হলো ফেরারিকে। সেই সঙ্গে সুযোগ পেলেন মারিয়া ও বোরেল। এই ম্যাচে স্পেনের খেলোয়াড়েরা ড্রেসিংরুমেই দান ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন। গত ম্যাচের সবাই প্রায় আহত,

মাত্র গতদিনের চারজনকে রিপ্লে গেমে মাঠে নামানো সম্ভব হলো। তবু এই অবস্থায় ইতালিয়ানরা ম্যাচে জিততে পারলো না বড় সড় ব্যবধানে। ওরিসির উঁচু সেণ্টারে মাথা ছুঁয়ে ইতালির একমাত্র গোলটি করলেন মিজ্জা, গতকাল এই ধরনের কর্ণার বহু বার করেছেন ওরিসি, মির্জা একবারও তার নাগাল পান নি। বুড়ো জামোরা প্রতিবারই তার মাথার ওপর থেকে বল তুলে নিয়ে গেছেন। আজ যদি নবাগত নগুয়েট গোলে না দাঁড়িয়ে তার জায়গায় জামোরা থাকতেন তাহলে এই বল মিজ্জার মাথায় পড়তো কিনা সন্দেহ। ওই একটি গোলের বিনিময়ে ইতালি উঠে এলো সেমিফাইনালে। অন্যদিকে মিলানে প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে খেলে জার্মানীরা ম্যাচ জিতলো সুইডেনের বিরুদ্ধে।

তুরানে চেকদল দারুণ খেলা দেখিয়ে ম্যাচ জিতলো সুইজারল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে। চেকেরা আগাগোড়া এই ম্যাচে স্কিল, স্ট্যামিনা ও স্টেনথ বজায় রেখেছিল। চশমা চোখো সুইস ফরোয়ার্ড কিয়েল হোলের সমর্থক ছিল অনেক বেশী। এই ম্যাচেও তিনি একটি দর্শনীয় গোল করলেন। প্রথম গোল দিলেও সুইস দল ব্যবধান ধরে রাখতে পারলো না। ছ'মিনিটের মাথায় চেকেদের চতুর ফরোয়ার্ড স্ববেদা চমৎকারভাবে বল দেওয়া-নেওয়া করে এগিয়ে গেলেন স্ববোটকার সঙ্গে। এরপরেই চকিতে স্ববেদা নিলেন জোরালো শট। বল জালে জড়িয়ে গেলো। বিরতি পর্যন্ত ফলাফল থাকলো সমান সমান। কোন পক্ষ যে জয় পাবে হলফ করে কিছু বলা সম্ভব হলো না। বিরতির পর চেকেরা আবার নতুন করে আক্রমণ শুরু করলো। শুরুর চার মিনিটের মধ্যেই স্ববেদা ও এ্যাটাকিং হাফ ক্যাম্বাল ওপরে উঠে এলেন বল দেওয়া-নেওয়া করে। চমৎকার কায়দায় ক্যাম্বাল দুজন সুইস রক্ষণ ভাগের খেলোয়াড়কে ধোঁকা দিয়ে নিখুঁত থ্রু বাড়িয়ে দিলেন স্বাবেদাকে, সঙ্গে সঙ্গে গোলে শট নিলেন স্বাবেদা। ২-১ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পরই সুইস দল যেন বোমা বর্ষণ শুরু করলো। অল্প সময়ের মধ্যে ট্রেলো গোল শোধ করলেন। হতাশ হয়ে পড়লো

চেক দল। আক্রমণ তখনও সুইস পক্ষে। খেলা যেভাবে চলছিল তাতে সুইস দলের জয়ের সম্ভাবনা একরকম প্রায় নিশ্চিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সমাপ্তির শেষ মুহূর্তে ভোজবাজির মতো উল্টে গেল খেলার ভাগ্য। ফাঁকায় একটি বল পেয়ে গেলেন নেজলি। বল ধরেই তিনি দ্রুত গতিতে ছুটলেন সুইস গোলের দিকে। তার চকিত রানিং শটে চেক দল ৩-২ গোলের ব্যবধানে এগিয়ে গেল।

ফুটবল নিয়ে রীতিমতো যুদ্ধ হলো বলোগনায়। হাঙ্গেরী-অস্ট্রিয়ার খেলাটি ছিল উত্তেজনায় ভরা। কেউ কারো চেয়ে কম নয়। ফুটবল নিয়ে এই দুই দেশের মধ্যে রক্তের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বরাবরের। প্রথমেই হরওয়াথ একটি চমৎকার গোল দিয়ে এগিয়ে দিল অস্ট্রিয়াকে। দু মিনিট সময় পার হতে না হতেই আবার গোল। এবার গোল এলো জিসেক বিকানের পা থেকে। দু-গোলে পিছিয়ে পড়া হাঙ্গেরী দল তবু বশ্যতা স্বীকার করতে রাজি হলো না। ডাক্তার জর্জ সরোসি একাই তখন একশো, তাকে আগলে রাখা মুশকিল। সীমানার মধ্যে বল পায়ে সারোসিকে ফাউল করায় পেনালটি পেলো হাঙ্গেরী। ব্যবধান কমলো। সারোসি নিজেই পেনালটি শটে গোল দিলেন। গোল পেয়ে হাঙ্গেরী দল ম্যাচ বাঁচাবার জন্য লড়াই করতে লাগলো। ফাউলের সংখ্যা বাড়াতে লাগলো অস্ট্রিয়া। এই ফাউলের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে লাগলো। রেফারী খেলাকে অনুকুলে রাখার জন্য মাঠের বাইরে বার করে দিলেন রাইট উইং মার্কসকে। হাঙ্গেরী খেলোয়াড়েরা উসকে গেলেন। তারা মেজাজ হারানোর ফলে খেলার গতি ব্যাহত হলো। অস্ট্রিয়া যেন এই চাইছিল—চাইছিল হাঙ্গেরীয়ানদের মেজাজ উসকে দিয়ে তাদের খেলার ধারাকে অবিন্যস্ত করতে। হলোও তাই, আর এর ফলেই হাঙ্গেরী ম্যাচ হারতে বাধ্য হলো। সেমিফাইনালে উঠে এলো অস্ট্রিয়া।

সেমিফাইনালে যে চারটি দেশ লড়াই করার যোগ্যতা পেল, তাদের মধ্যে জার্মানরাই ছিল অপেক্ষাকৃত কমজোরি। তারা যে

সেমিফাইনালের বেড়া টপকাতে পারবে না একথা সবাই জানতেন। এমন কি জার্মানরাও মাঠে সেদিন নেমেছিল কেবল মাত্র গোল সংখ্যা না বাড়িয়ে অল্প ব্যবধানে হার স্বীকার করার জন্য। তাদের সৌভাগ্য যে রোমে তারা সত্যি-সত্যি বেশী ব্যবধানে পরাজিত হয় নি। চেকেরা এই ম্যাচে সমস্ত শক্তি উজাড় করে দিলো। জয়ের জন্য যা যা দরকার, তার সবটুকু তাদের মধ্যে বজায় ছিল ষোলাআনা। ডাবলু পদ্ধতিতে খেলে চেকেরা দেখিয়ে দিল ফুটবলে তারা কতখানি এগিয়ে গেছে, এই ম্যাচ দেখতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন মুসোলিনি। চেকেরা প্রথম গোল দিলেও তার মধ্যে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায় নি। প্রথমার্ধের ২১ মিনিটে প্রথম গোল দিয়ে দলকে এগিয়ে দিলেন নেজলি। জুসেকের শট প্রতিহত হলে নেজলি ছুটে গিয়ে আসল কাজটি করলেন। গোল দিয়ে চেকেরা একটু ঢিলে দিলেন আক্রমণে। দেখে মনে হচ্ছিল তারা যেন অযথা শক্তি ক্ষয় করতে রাজি নয়। দ্বিতীয়ার্ধে জার্মানরা তাদের স্বরূপ ধারণ করলো। তাদের খেলা দেখে মনে হলো এক সময় তারা যেন এই ম্যাচে অবধারিত জিতবেই। প্রথম জার্মান গোল পেলো প্লানিকার ভুলের জন্য। জার্মান লেফট ইন নোয়াকের শট যে তার কাছে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছাবে এই বিশ্বাস মনে হয় তার ছিল না। ফলে তিনি গোল ছেড়ে যখন এগিয়ে গেলেন, তখন আর তার কিছু করবার নেই। গোল শোধ করার পর জার্মান ফরোয়াডেরা এমন ভাবে খেলতে লাগলো যে তারা যেন চেকেদের পকেটে পুরে রেখেছেন। মাঠের মধ্যে কোন চেক খেলোয়াড় যে আছেন, একথা মনেই হচ্ছিল না। জার্মানদের এই চাপের সামনে আত্মবিশ্বাস হারানো চেক তো একবার প্রায় গোল খেয়ে বসছিলো। টিরকি গোলরক্ষকের উদ্দেশ্যে এত জোরে ব্যাকপাস করলেন যে তা গোল লাইনে ঝাঁপিয়ে শেষ মুহূর্তে কোনরকমে রক্ষা করলেন প্লানিকা। এরপর জার্মানদের একটি ফ্রি-কিক পোস্টে প্রতিহত হলো। জার্মান সমর্থকেরা তো খুব খুশী, এই অবস্থা বেশীক্ষণ চললো না। চেকের

লেফ্‌ট হাফ ক্রিসিল চকিত শটে আবার দলকে ২-১ গোলের ব্যবধানে এগিয়ে দিলেন, এই গোল খেয়ে জার্মানরা সহসা আক্রমণাত্মক খেলার ধরন বদল করলো। সবাই নেমে এলেন গোল মুখে আত্মরক্ষা করতে। আত্মরক্ষার এই দুর্বল মানসিকতার খেসারত দিতে অচিরেই বাধ্য হলো জার্মান দল। সুযোগ বুঝে ব্যবধান বাড়িয়ে নিলো চেকেরা। ৩-১ গোলে ম্যাচ জিতে তারা পৌঁছ গেল ফাইনালে।

অন্যদিকে মিলানে ইতালী কোনরকমে ১-০ গোলে ম্যাচ হারালো অস্ট্রিয়াকে। অস্ট্রিয়া সে বছর দারুণ দল। তবু ইতালির প্রস্তুতি ছিল যেমন বেশী, তেমনি ছিল দলে বহু দামী খেলোয়াড়। ম্যানেজার পোজো জানতেন ইতালিকে যদি বিশ্বকাপ জয় করতে হয় তাহলে তাকে দলের দিকে নজর রাখতে হবে সবচেয়ে বেশী। হয়ত সেই উদ্দেশ্যেই তিনি তিনজন আর্জেন্টিনা খেলোয়াড়কে আগেভাগে নিজের দলে নিয়ে রেখেছিলেন। বলাবাহুল্য এই তিন জন আর্জেন্টিনার সুবাদেই ইতালির পক্ষে সম্ভব হয়েছিল ফাইনালে ওঠা। মন্টি ও ওরিসির স্কিল যেমন অস্ট্রিয়ার রক্ষণভাগে ভাঙন ধরালেন, তেমনি গোল পেল ইতালি মিজ্জার শটে। অস্ট্রিয়া তবু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করতে কসুর করলো না। ঘন ঘন তারা বল নিয়ে ধেয়ে আসতে লাগলো ইতালির সীমানায়। বুকের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল পোজোর। অন্তিম লগ্নে তিনি একবার চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলেন, যখন জিসেক একেবারে মাঝমাঠে বল টেনে নিয়ে এলেন একক প্রচেষ্টায়। দুর্ভাগ্য অস্ট্রিয়া জিসেকের দুরন্ত শট গোলরক্ষক কম্বিকে পরাস্ত করেও অল্পের জন্য বাইরে বেরিয়ে গেল।

ইতালি ফাইনালে উঠলো।

১০ই জুন রোমে অনুষ্ঠিত হলো ফাইনাল ম্যাচ। ফাইনালের তিনদিন আগে নেপলসে অস্ট্রিয়াকে ৩-২ গোলে হারিয়ে জার্মানী পেল তৃতীয় স্থান।

রোমে ফাইনাল নিয়ে অনীহা ছিল অনেকের মনে। ফাইনাল

ম্যাচকে কেন্দ্র করে কোনরকম উত্তেজনা দেখা গেল না। কেমন যেন থমথমে ভাব। বরং ইতালির তুলনায় চেক খেলোয়াড়দের মানসিক দিক দিয়ে সুস্থ বলে মনে হলো। খেলার দিন সকাল থেকেই ভিড় বাড়তে লাগলো। পঞ্চান্ন হাজার চেকবিরোধী ইতালি সমর্থক পটকা ও পতাকা হাতে নিয়ে হাজির হলো মাঠে। চেক খেলোয়াড়েরা সমর্থন ছাড়াই মাঠে নামলেন। সেই মুহূর্তে পোজোকে পৃথিবীর একজন অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। ইতালির জয় না পাওয়া পর্যন্ত তার মনে কোন শান্তি নেই।

প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে চেকেরা অসাধারণ ফুটবলের পরিচয় রাখলেন। এই ম্যাচে চেক দলের এ্যাটাকিং হাফ ক্যামব্যাল ও গোলরক্ষক প্লানিকার খেলা অসাধারণত্বের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। ইতালির মন্টি, গাইতা ফেরারীও লড়াই করলেন সমান ভাবে। দ্রুতগতির খেলায় সত্তর মিনিট পর্যন্ত কোন দল গোল পেল না। প্রথম গোল এলো পাকের শট থেকে। খানিক আগে পেশীতে টান ধরার জন্য মাঠের বাইরে চলে গিয়েছিলেন তিনি। মাঠে ফিরে এসেই পেলেন একটি কর্ণার। কর্ণার পর বল হঠাৎ করে জটলার মধ্যে থেকে ছিটকে এসে পড়লো পাকের পায়ে। কোনরকম দ্বিধা না করে কম্বি তার পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই তিনি নিলেন জোরালো শট।

গোল পেয়ে চেকেরা যেন ধরে নিলেন, তারা ম্যাচ জিতে গেছেন। ফলে তাদের খেলার মধ্যে সে আত্মতৃপ্তির ভাব লক্ষ্য করা গেল। অন্যদিকে ইতালিয়ানরা হয়ে পড়েছিল খুব ক্লান্ত। শিয়াভিও এত পরিশ্রান্ত ছিলেন যে মাঝে মাঝেই তিনি পেটে হাত দিচ্ছিলেন। গাইতিও বেশ বিভ্রান্তির মধ্যে পড়লেন। মাঝ মাঠে ভাল খেলা দেখিয়েও তিনি গোলের সামনে গিয়ে বার বার এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিলেন। খেলা প্রায় শেষ হয়ে আসছে। অস্থির হয়ে উঠেছিলেন পোজো। তবে কি তার স্বপ্ন ব্যর্থ হবে। তিনি যে তার দেশকে কথা দিয়েছেন দলকে তিনি চাম্পিয়ান করবেন। উদ্বিগ্ন পোজো মাঠের ধারে

দাঁড়িয়ে চিৎকার করে নির্দেশ দিতে লাগলেন, দেখে মনে হচ্ছিল মানুষটি যেন মস্তিষ্ক বিকৃতি রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। অন্তিম লগ্নে সহসা অসাধ্য সাধন করলেন ওরসি। গাইতির কাছ থেকে বল পেয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে গিয়ে বাঁ পায়ে বল তুলে ডান পায়ে নিলেন চকিত শট—এমন গোল দেখার জন্য যে কোন জায়গায় পায়ে হেঁটেও যাওয়া যায়। ওরসি নিজেও জানেন না তিনি কি করেছেন —চমক ভেঙেছিল মাঠ শুদ্ধু লোকের চীৎকারে। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত খেলার ফলাফল থাকলো ১-১। তারপর শুরু হলো অতিরিক্ত সময়ের খেলা। ইতালির সমর্থকেরা প্রাণভরে চীৎকার করতে লাগলেন। পোজোকে বার বার মাঠের ধারে ছুটে গিয়ে কথা বলতে দেখা গেল। ৯৭ মিনিটের মাথায় উত্তেজনার অবসান ঘটালেন মিজ্জা। বেচারি এতক্ষণ আঘাতের যন্ত্রণায় খোঁড়াছিলেন। ওই অবস্থায় বল এল তার পায়ে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে মিজ্জা রাইট উইং ধরে বেশ খানিকটা ছুটে গেলেন। তারপর চকিতে ডান দিকে মোচড় মেরে চলে এলেন একবারে অরক্ষিত চেক সীমানায়। পাশেই দেখলেন গাইতিকে। ক্রশ পাস। গাইতি বল ধরে ঠেলে দিলেন শিয়াভিওকে। শিয়াভিও সামান্য চেষ্টায় টিয়রকিকে কাটিয়ে গোলে নিলেন শট। প্লানিকার কিছু করার ছিল না। ওই গোলের বিনিময়ে ১৯৩৪ সালের বিশ্বকাপ ঘরে তুললো ইতালি, সঙ্গে এলো ১০ লক্ষ লিরা।

ইতালির এই জয় সম্পর্কে অনেকে অবশ্য খুশী হতে পারেন নি। তারা বললেন, এই আসর যদি পৃথিবীর অন্য কোথাও অনুষ্ঠিত হতো তাহলে হয়ত পোজোর দলের পক্ষে সম্ভব হতো না জুলেরিমে জয় করা।

নিন্দুকেরা তো কত কথাই বলে—কি এসে যায় সে কথায়। পোজো কেবল মুচকি হাসলেন। ভাবটা এমন যেন "শুধু জয় চেয়েছিনু, জয়ী আমি— !"

বলাবাহুল্য বিশ্বকাপ জয় করার পর ইতালির খেলোয়াড়েরা ফিফার স্বর্ণপদক শুধু পেলেন না, সেই সঙ্গে ইতালির ফুটবল ফেডারেশনও তাদের দিলেন আর একটি স্বর্ণ পদক উপহার।

এই প্রসঙ্গে পাঠকদের জানিয়ে রাখি দ্বিতীয় বিশ্বকাপ আসরে মোট ১৬টি খেলায় একটি রি-প্লে ও দুটি ম্যাচের কিছুটা করে অতিরিক্ত সময় ধরে মোট গোল হয়েছিল সত্তরটি। এই গোলের মধ্যে সর্বাধিক গোল করেছিল ইতালী—বারোটি। অন্যদের মধ্যে জার্মান ১১টি, চেকোশ্লাভিয়া ৯টি, অস্ট্রিয়া ৭টি, সুইজারল্যাণ্ড ৫টি, হাঙ্গেরী ৪টি। ব্যক্তিগত গোলদাতা হিসাবে সর্বোচ্চ গোল দিয়েছিলেন তিনজন খেলোয়াড়। এরা দিয়েছিলেন চারটি করে গোল। এই তিনজন হলেন যথাক্রমে, শিয়াভিও (ইতালি) নেজলি (চেক) ও কোনেন (জার্মান)।

১৯৩৪ সালের বিশ্বকাপ তো শেষ হলো। লাটিন আমেরিকা গোষ্ঠীর বিগত প্রাধান্যকে ধুয়ে মুছে দিয়ে ইউরোপ আবার মাথা তুলে দাঁড়ালো ইতালির নেতৃত্বে। দ্বিতীয় বিশ্বকাপ সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় আসরের প্রস্তুতিপর্ব শুরু হলো। বসলো ফিফা সদস্যদের আলোচনা।

তৃতীয় বিশ্বকাপ কোথায় অনুষ্ঠিত হবে এই প্রশ্নে আবার মুখর হলো সভাগৃহ। ইতালির সার্বিক সাফল্য ইউরোপের দাবিকে সোচ্চার করে তুললে। কিন্তু পাশাপাশি শোনা গেল আর্জেন্টিনার দাবি। প্রথম বারেও তারা এই আসর আয়োজন করতে চেয়েছিল। কিন্তু ফিফার অধিকাংশ সদস্য মত দিলেন ইউরোপের পক্ষে। বলা হলো, ফিফার সভাপতি জুলেরিমের সম্মান রক্ষায় ফ্রান্সেই অনুষ্ঠিত হবে তৃতীয় বিশ্বকাপ! ফিফার এই সিদ্ধান্তে সুখী হতে পারলো না লাটিন আমেরিকা গোষ্ঠী—বিশেষ ভাবে প্রতিবাদ এলো আর্জেন্টিনার তরফ থেকে। তারা উরুগুয়ের মতো তৃতীয় বিশ্বকাপে দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

আবার ইতালি (১৯৩৮)

ফ্রান্সে তৃতীয় বিশ্বকাপ আসর শুরু হওয়ার আগেই বিশ্ব রাজনীতি অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করেছিল। ইউরোপের প্রায় সর্বত্র দেখা গেলো যুদ্ধের প্রস্তুতি। বাতাসে বারুদের গন্ধ। অহরহ সীমান্ত অঞ্চলে টহল দিতে লাগলো সাঁজোয়া বাহিনী। পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে এত জটিল হয়ে উঠছিল যে ফ্রান্সের আসর শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে কিনা তাই নিয়ে সকলেই সন্দিহান হয়ে পড়লেন।

লাটিন আমেরিকা গোষ্ঠী ইউরোপে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হওয়ায় আগ্রহ প্রকাশ করলো না। উরুগুয়ের মতো এবার আর্জেন্টিনা দলও পালন করলো নীরব ভূমিকা। একমাত্র ব্রাজিল এল ফ্রান্সে।

ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে অস্ট্রিয়ার পক্ষে সম্ভব হলো না ফ্রান্সে নিজস্ব দল নিয়ে খেলতে আসা। বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার বেশ আগেই জার্মান নাৎসী নেতা হিটলার অস্ট্রিয়া আক্রমণ করলেন। ফুটবলে জার্মানি তখনও নিজেদের পুরোপুরি ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। অস্ট্রিয়া আক্রমণ করেই তাই বন্দীদের মধ্যে থেকে বেশ কিছু নামী ফুটবলারকে পাকড়াও করলো জার্মান কর্তারা। অস্ট্রিয়ার চারজন নামি ফুটবলারকে বাধ্য করা হলো জার্মান দলে অংশ নিতে। বলা বাহুল্য সেই বছর জার্মান দলের দায়িত্ব নিলেন শেপহারবারজার।

স্পেন এই আসরে অনুপস্থিত থাকতে বাধ্য হলো গৃহযুদ্ধের জন্য। একমাত্র সাহস সম্বল করে ফ্রান্সে খেলতে এল হাঙ্গেরী। ডাক্তার জর্জ সারোসি তখনও অসাধারণ খেলছেন। ইউরোপীয় ফুটবলে তখন তাকে নিয়ে চলেছে বিস্তর আলোচনা। মাত্র কয়েক মাস আগে সারোসির জন্য হাঙ্গেরী ৮–৩ গোলে জয় পেয়েছিল অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে। সারোসি দিয়েছিলেন সাতটি গোল। চেক, রুমানিয়া, সুইডেন,

সুইজারল্যাণ্ড আসর আলো করে দাঁড়ালেও ফ্রান্সে ফেবারিট ছিল ইতালি। যদিও ইতালির সেই আগের শক্তি আর ছিল না। বহু রদ-বদল হয়েছে দলের। গত বিশ্বকাপে যাদের নিয়ে পোজো বিশ্বকাপ জয় করেছিলেন তাদের অনেকেই বাদ পড়েছিলেন দল থেকে। ১৯৩৪ সালের দুই ইনসাইড মিজ্জা ও ফেরারী ছাড়া দলে দেখা গেল প্রচুর নতুন মুখ। নতুন ফরোয়ার্ড সিলভিও পিওলা তখন সবার সেরা। পোজোর তবু আত্মবিশ্বাস ছিল। কারণ মাত্র দুই বছর আগে এই ইতালি বিশ্বকাপের পর জয় করেছে ওলিম্পিকের স্বর্ণ পদক।

অস্ট্রিয়া না থাকায় ইতালি সম্পর্কে পর্যবেক্ষকেরা ভবিষ্যদ্বাণী করে বললেন, "ইতালি এবারও ট্রফি জয় করবে।" তবু অনেকের ধারণা ছিল হয়ত ইংল্যাণ্ড শেষ মুহূর্তে রাজি হবে অস্ট্রিয়ার জায়গায় খেলতে। কিন্তু তারাও এলো না। ফলে মোট ছত্রিশটি দেশের মধ্যে বেছে নেওয়া হলো মূল আসরের জন্য যোলটি দেশকে। নতুন দল হিসাবে বিশ্বকাপ আসরে এই প্রথম দেখা গেল কিউবা, পোল্যাণ্ড ও ডাচ-ইস্ট-ইণ্ডিজ দলকে। ঠিক হলো প্রতিযোগিতা হবে নকআউট পদ্ধতিতে।

প্রথম রাউণ্ডের খেলায় ঘটলো অঘটন। শক্তিশালী রুমানিয়ার সঙ্গে কিউবা অসাধারণ লড়াই করলো। নব্বুই মিনিট পর্যন্ত খেলা চললো ২-২ গোলে। এরপর অতিরিক্ত সময়ের খেলা। সোসা গোল দিয়ে কিউবাকে এগিয়ে দিলেও—শেষ মুহূর্তে রুমানিয়া গোল শোধ করে মান বাঁচালো।

প্রথম রাউণ্ডে একমাত্র সহজ জয় পেলো হাঙ্গেরী ও ফ্রান্স। হাঙ্গেরী ৬-০ গোলে হারালো নবাগত ডাচ-ইস্ট-ইণ্ডিজ দলকে, এবং ফ্রান্স হারালো ৩-১ গোলে বেলজিয়ামকে।

মার্সাইয়ে ইতালিকে দস্তুর মতো লড়তে হলো নরওয়ে দলের সঙ্গে —ঠিক যেন তোপের মুখে পড়া অবস্থা। রাজনৈতিক কারণে ইতালির খেলোয়াড়েরা মাঠে নামার পর থেকে বিদ্রূপের মধ্যে পড়লেন।

দর্শকদের মধ্যে যারা ফ্যাসী বিরোধী তারা ফ্যাসিস্ত স্যালুট দিলেন। পোজো জানতেন এমন একটা কিছু ঘটবে। তাই তিনি খেলোয়াড়দের বলে দিলেন, ওরা হাত নামালেও তোমরা হাত নামাবে না যতক্ষণ না চিৎকার থামে।

খেলা শুরু হতেই সমর্থকেরা নরওয়ের হয়ে উল্লাস শুরু করে দিলেন। গোড়া থেকে ইতালিকে চাপের মুখে পড়তে হলো। আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণের মধ্যে খেলা চললো দ্রুতগতিতে। নরওয়ের আক্রমণ সংখ্যা ক্রমান্বয়ে যেন বাড়তে লাগলো। বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন পোজো। দু-দুবার নরওয়ের গোল সুযোগ হাতছাড়া হলো পোস্টে বল প্রতিহত হওয়ায়। এরপরই ইতালি একটি গোল পেয়ে গেল। কিন্তু এই ব্যবধান তারা ধরে রাখতে পারলো না। ব্রাস্টাডের শট পরাস্ত করলো ইতালির গোলরক্ষক ওলিভেরিকে। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত খেলার ফলাফল থাকলো ১-১। অতিরিক্ত সময়ের খেলায় পিওলা একক প্রচেষ্টায় নরওয়ের রক্ষণভাগ ভেদ করলেন। সামনে একজন মাত্র ডিফেণ্ডার জোহানসেন। পিওলা কোন রকম দ্বিধা না করে গোলে শট নিয়ে কোনরকমে ম্যাচ জেতালেন ইতালিকে।

স্টসবরোর ভিজে মাঠে খেলা জমলো ব্রাজিল ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে। ব্রাজিল এতদিন ধরে অনুশীলনে রপ্ত থেকে যে কৌশল আয়ত্ত করেছিল, তার কিছুটা প্রমাণ দিল বিরতির আগে ৩-১ গোলে এগিয়ে থেকে। বিরতির পর পোলিশ ফরোয়ার্ডেরা খেলাকে নিজেদের অনুকূলে নিলেন। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় খেলা গড়ালো অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত। লিওনিডাস ও রাইট-ইন রোমিও চমৎকার খেলে ব্রাজিলকে আবার এগিয়ে দিল। গোল শোধ করতে কসুর করলো না উইলমোস্কি। শেষ পর্যন্ত তীব্র লড়াই করে ব্রাজিল ম্যাচ জিতলো ৬-৫ গোলের ব্যবধানে। চেকেরা নেদারল্যাণ্ডকে সরাসরি ৩-০ গোলে হারালো।

আগেই বলেছি রুমানিয়ার বিরুদ্ধে অপ্রত্যাশিত ফলাফল দেখিয়েছে কিউবা। প্রথম ম্যাচ শেষ হয় ৩-৩ গোলে। ফলে আবার অনুষ্ঠিত

হলো খেলাটি। এইদিন কিউবা ২-১ গোলে জয়ী হলো।

প্রথম রাউণ্ডের খেলা শেষ করে মোট সাতটি দেশ উঠলো কোয়ার্টার ফাইনালে। অস্ট্রিয়া শেষ মুহূর্তে না আসায় সেই শূন্যস্থানে আনা হলো সুইডেনকে। কিন্তু সুইডেন যখন তৈরী হয়ে প্যারিসে পৌঁছালো তখন আর তাদের প্রথম রাউণ্ড খেলার সময় ছিল না। ফলে তারা বাই পেয়ে উঠলো দ্বিতীয় রাউণ্ড বা কোয়ার্টার ফাইনালে।

কোয়ার্টার ফাইনালে সুইডেনকে প্রথম লড়তে হলো কিউবার সঙ্গে। এই ম্যাচে সুইডেন দিলো আট গোল। প্যারিসে ফ্রান্স মুখোমুখি হলো ইতালির সঙ্গে। উদ্যোক্তা ফ্রান্স দলে আছেন একগাদা অভিজ্ঞ খেলোয়াড়। ফ্রান্সের দল সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা করে ভিক্টোর পোজো তার দলের কিছু রদবদল করলেন। মঞ্জেগলিওর জায়গায় আনলেন ফনিকে। দুই উইংগার হিসাবে দলে নেওয়া হলো কলৌসি ও বিভাটিকে।

কলম্বাস স্টেডিয়ামে খেলা আরম্ভ হলো অত্যন্ত উত্তেজনার মধ্যে। শুরুতে দুই দলকেই গুছিয়ে খেলতে দেখা গেল না; কেমন যেন এলোমেলো ভাবে খেলা চলছিল। আসলে দুই দলের মধ্যেই ছিল অত্যধিক স্নায়ুর চাপ। প্রথমার্ধে খেলার ফলাফল থাকলো গোল শূন্য। দ্বিতীয়ার্ধে খেলার স্বাভাবিক গতি বদল করলেন পিওলা। অসাধারণ ক্রীড়া-দক্ষতার গুণে তিনি গোটা ফরাসী রক্ষণভাগকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। ঘন ঘন বল নিয়ে ধেয়ে এলেন ফ্রান্সের গোল সীমানায়। তাকে বাধা দেওয়ার মতো কেউ নেই যেন। দেখে মনে হচ্ছিল পিওলা একজন দক্ষ যাদুকর, তিনি যেন আপন ইন্দ্রজালে গোটা ফরাসী দলটাকে মন্ত্র সিদ্ধ করে রেখেছেন। দু' দুবার গোলের সুযোগ তৈরী করেও কেবল মাত্র দুর্ভাগ্যের জন্য গোল পেলেন না পিওলা। গোল এলো কলৌসির দুরন্ত শট থেকে। তার বাঁ পায়ের কামানের গোলার মতো শট সোয়ার্ভ করে গোলরক্ষক ব্যাস্টনের হাতের পাশ দিয়ে গোলে চলে গেল। কিন্তু এই ব্যবধান ইতালি ধরে রাখতে পারলো

না। পরক্ষণেই ফরাসী ফরোয়ার্ডের। এগিয়ে গেলেন। ডেলফোরের পাশ থেকে বল পেলেন ভিনান্ত। বল যখন ভিনান্তের কাছে এলো তখন তার সামনে দাঁড়িয়ে অস্টন। ভয়ানক ভাবে তিনি ছুটে এলেন। ভিনান্ত এবার সেই বল বাড়িয়ে দিলেন অসকার হাইসেরের কাছে। চকিত শটে গোল দিতে ভুল করলেন না হাইসের।

এবার খেলার মধ্যে যেন প্রাণ ফিরে এলো। পিওলা অসাধারণ ভূমিকা নিলেন। গোটা ফরাসী রক্ষণভাগকে তিনি যেন সম্মোহিত করে রেখেছেন। জর্ডান ও ডিয়াগ্নের মতো ডিফেনডার বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকলেন যখন তাদের সামনে দিয়ে বল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন পিওলা। তারপরই দেখা গেল চমৎকার ভাবে ক্রশপাস করতে কলৌসীর উদ্দেশ্যে। কিন্তু তিনি বল পাওয়ার আগেই ক্রশফিল্ড বল ধরার চেষ্টা করলেন। বল তার সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসার আগেই বিভাটি খোঁচা মেরে ক্রশফিল্ডের আয়ত্তাধীন বল ঠেলে দিলেন আগুয়ান পিওলাকে। চমৎকার উঁচু বলে পিওলা ভলি না মেরে নিচু হয়ে মাথা ছুঁয়ে দিলেন—ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে গোল। এই গোলের পর ফরাসীরা যেন দিশেহারা হয়ে পড়ল। তারা কিছুতেই নিজেদের আর নতুন করে সংগঠিত করতে পারলো না। বরং কলৌসী ও পিওলার বোঝা-পড়ায় ফরাসী রক্ষণভাগে তৈরী হলো এক মস্ত ফাটল। তৃতীয় গোল এলো খেলার শেষ দিকে। এবারও গোল দিলেন পিওলা। মাঝ মাঠ থেকে বল ধরে প্রথম বল বাড়ালেন কলৌসীকে। পরে সেই বল বিভাটির পা হয়ে যখন তার কাছে এলো তখন আর পিওলার মতো খেলোয়াড়ের গোল দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ফলে ৩-১ গোলে ম্যাচ জিতে ইতালি উঠল সেমিফাইনালে।

অন্য খেলায় জয়ের জন্য বিশেষ গা ঘামাতে হলো না হাঙ্গেরীকে। গত ম্যাচে তারা জিতেছিল আট গোলে। এবার এতবড় ব্যবধানে জয় না পেলেও হাঙ্গেরী অত্যন্ত গোছানো ফুটবলের পরিচয় দিল। সারোসি, সেঞ্জেলার, টিটকস সহ অনবদ্য ভূমিকা নিলেন লাজার ও

সালয়। সুইজারল্যাণ্ডকে সরাসরি সেঞ্জেলারের দেওয়া গোলে হারিয়ে প্রথমে তারা এবারের টুর্নামেণ্ট জয়ের জন্য তৈরী হয়ে এসেছে। গুস্তাভকে অত্যন্ত আত্মতৃপ্ত বলে মনে হলো। ম্যাচ শেষে তিনি সাংবাদিকদের বললেন, ফাইনালে আমরা কিভাবে খেলবো সেই পরিকল্পনায় ব্যস্ত আছি।

ফুটবল নৃশংস চেহারা নিলো বোরাদেও'তে। ব্রাজিল ও চেকোশ্লাভ কেউ কারো চেয়ে কম নয়। পরস্পর পরস্পরকে মোক্ষম পেটালো। রক্তারক্তিতে ফুটবল হয়ে উঠল ভয়াবহ। এমন নৃশংস পাশবিকতা এর আগে দেখা যায় নি। দর্শকেরা খেলা দেখতে দেখতে শিউরে উঠলেন। মাঠের মধ্যে ফুটবলের আইন বলে কিছুই ছিল না। খেলা শুরু হতে না হতেই ব্রাজিলের লেফট হাফ জেজে অকারণে আঘাত করলেন নেজলিকে। বেচারা নেজলি—জেজের লাথি খেয়ে মাটিতে ছিটকে পড়লেন। ছুটে এলেন হাঙ্গেরীয়ান রেফারি হার্টকা। তিনি তৎক্ষণাৎ জেজেকে মাঠের বাইরে পাঠালেন। দশজনে খেলেও ব্রাজিল প্রথম গোল দিয়ে এগিয়ে গেল। বিরতির কিছু আগে বল কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে জন্তুর মতো হাতাহাতি ও ঘুষোঘুষি করলেন রিহা ও ম্যাচাডোস।

মাঠের আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। তবু তার মধ্যে নিখুঁত বল কনট্রোল দেখালেন লিওনিডাস। বিরতির পর ব্রাজিলের রাইট ব্যাক ডোমিঙ্গোস ডাগুইয়া দৃষ্টিকটু ভাবে বাধা দিলেন চেক ফরোয়ার্ডকে। প্রায় একেবারে বুকের ওপর পা উঠে গিয়েছিল আর কি—শিউরে উঠেছিলেন সারা মাঠের মানুষ। তাতেও অবস্থা আয়ত্ত করতে না পেরে বল হাত দিয়ে থামানোর জন্য পেনালটি পেল চেক দল। গোল শোধ হলো। এই গোল শোধের পর খেলা হলো চড়া মেজাজে। ব্রাজিল একতরফা আক্রমণ চালিয়েও গোল পেল না। অতিরিক্ত সময় খেলা হওয়া সত্ত্বেও ফলাফলের কোন বদল হলো না।

রিপ্লে গেমে ব্রাজিল নামলো তৈরী হয়ে। বদল হলো উভয়

দলের বেশ কিছু খেলোয়াড়। চেকের বদলী ছয়জন, ব্রাজিলের নয়জন।

এই ম্যাচে প্রথম মাঠে নামলেন শল্য-চিকিৎসক ডাঃ নারিজ। এই ম্যাচে ব্রাজিল অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দিল। তারা ম্যাচ জেতার জন্য গোছানো ফুটবল খেললো এইদিন। নবাগত নারিজের গোলে দল এগিয়ে থাকার পর, ব্রাজিল যেন আর ব্যবধান বাড়াতেও রাজি হলো না। ইচ্ছে করেই তারা বল ধরে রেখে রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলে গেলেন আগাগোড়া। চেক দলের ডাউকিক ছাড়া আর কোন খেলোয়াড়কে এই দিন সক্রিয় হতে দেখা গেল না।

ব্রাজিল সেমিফাইনালে উঠলো—এবার তাদের লড়তে হবে ইতালির সঙ্গে। অন্য আর একটি সেমিফাইনালে হাঙ্গেরী লড়াই করলো সুইডেনের সঙ্গে।

এই আসরে সুইডেনকে বড় একটা পরীক্ষামূলক ভূমিকায় সক্রিয় হতে দেখা যায় নি। তাদের তুলনায় হাঙ্গেরী যে অনেক সতেজ দল, একথা সবাই জানতেন। গুস্তাভ অবশ্য সুইডেনকে নিয়ে খুব একটা চিন্তায় ছিলেন না। তিনি জানতেন এই ম্যাচে তারা অনায়াসে জিতবেন। হলোও তাই—প্যারিসে হাঙ্গেরী তাদের ইস্পাত কঠিন ঝাঁ চকচকে দল নিয়ে পরিষ্কার পাঁচটি গোল দিলো। যদিও খেলার শুরুতে সুইডেন প্রথম গোল দিয়ে এগিয়ে যায়, তবু হাঙ্গেরীয়ানদের কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। বরং তারা অত্যন্ত সহজ বোঝা-পড়ার মধ্যে রাজসিক মেজাজে হারালো সুইডেনকে। এই ম্যাচে ইচ্ছে করলে হাঙ্গেরীয়ানরা কেবল পাঁচটি গোল নয় আরো তিনগুণ বেশী গোল দিতে পারতো।

মার্সাইয়ে ইতালি—ব্রাজিল সেমিফাইনাল হলো দেখার মতো। এই ম্যাচে ব্রাজিল তার দলকে আবার রদ-বদল করলো। পোজো জানতেন শক্তি সামর্থ্য দেখিয়ে ব্রাজিলের সঙ্গে কোন লাভ

হবে না। তাই তিনি যথা সম্ভব কৌশল প্রয়োগ করলেন। তিনি পিওলাকে নিযুক্ত করলেন কেবলমাত্র ব্রাজিলিয়ানদের রাগিয়ে দেওয়ার জন্য। পিওলাও তাই করলেন। ঘন ঘন খোঁচা মারা খেলে তিনি রাগাতে লাগলেন ব্রাজিল ডিফেনডারদের। এর ফলে কাজের কাজ হলো। ফাঁকায় বল পেয়ে প্রথম গোল দিলেন কলৌসী। দ্বিতীয় গোল এলো মিজ্জার পেনালটি কিক থেকে।

শেষ মুহূর্তে ব্রাজিলের রোমিও একটি গোল শোধ করলেন বটে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না। বরং ইতালি উঠে গেল ফাইনালে।

উদ্বোধনের পনেরো দিন পরে অর্থাৎ ১৯শে জুলাই কলম্বাস স্টেডিয়ামে বসলো ফাইনাল। এই ম্যাচ সম্পর্কে হাঙ্গেরী প্রায় নিশ্চিত ছিল। দিনটা ভিক্টোর পোজোর কাছে খুব একটা সুখকর ছিল না। মাঠে নামার আগেই তার হাতে এলো একটি টেলিগ্রাম। টেলিগ্রামে ছিল দলের গোলরক্ষক রোমার ম্যাসেটির বাবার মৃত্যুর খবর। পোজো তার হাতে চিঠি না দিয়ে নিজের কোটের পকেটে রেখে দিলেন। খেলার আগে পোজো ও দলের কোচ উভয়কে পুলিশ পাহারায় গ্যালারিতে গিয়ে বসতে হলো। বিস্মিত পোজো বললেন —একি, আমরা বন্দী হয়ে গেছি নাকি?

আজ্ঞে না, আপনারা কেবল খেলা চলাকালীন সময় নিজের জায়গায় বসে থাকবেন। কোনরকম নির্দেশ যাতে না মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে দিতে পারেন তারই জন্য এই ব্যবস্থা।

অস্বস্তি বোধ করলেন পোজো। গত বিশ্বকাপে তিনি যা করেছেন, মনে হয় সে কথা স্মরণ রেখেই তার বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কর্তৃপক্ষ। পাহারাদার জানালো, খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে তারা যদি কোন কথা বলেন তো তাদের গ্রেপ্তার করতে বাধ্য করা হবে।

অতএব পোজো শান্ত ছেলের মতো হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলেন গ্যালারীতে। কিকঅফের প্রথম ছ মিনিটের মাথায় ইতালি গোল

পেল। মাঝ মাঠে বল পেলেন বিভাটি। তিনি দ্রুতগতিতে দু'জনকে পিছনে ফেলে ক্রশপাস করলেন, পিছন থেকে ছুটে আসা মিজ্জাকে। দিলেন কলৌসীকে। বিনা বাধায় কলৌসী সেই বল গোলে ঠেলে দিতে কসুর করলেন না।

ব্যবধান ধরে রাখতে পারলো না ইতালি। এক মিনিটের মধ্যেই দর্শনীয় গোল দিলেন সারোসি।

ইতালি তখন অসাধারণ খেলছে। কলৌসীকে ধরে রাখা মুশকিল হয়ে উঠলো হাঙ্গেরীর। মিজ্জা এক সময় লম্বা পাস বাড়ালেন পিওলাকে। চমৎকার থ্রু পাস। এই রকম একটা পাসের জন্য যেন অপেক্ষা করছিলেন পিওলা। চকিত শটে তিনি এগিয়ে দিলেন ইতালিকে। ব্যবধান বেড়ে যাওয়ায় ইতালি যেন নতুন উদ্যমে জ্বলে উঠলো। বিরতির কিছু আগে অরক্ষিত জায়গায় বল পেয়ে কলৌসী দিলেন দলের তৃতীয় গোল। ৩-১ গোলে পিছিয়ে পড়া হাঙ্গেরী তবু লড়াই করতে কসুর করলো না। বহু চেষ্টার পর সারোসি ব্যবধান কমিয়ে আনলেন। এরপর দ্রুত গতিতে খেলা চললো। শেষ গোল এলো সমাপ্তির সাত মিনিট আগে। এরপর বিভাটির গোড়ালি দিয়ে সেণ্টার করা বলে মাথা ছোঁয়ালেন পিওলা। চমৎকার গোলে ইতালি জিতলো ম্যাচ। ৪-২ গোলে ফাইনালে জিত হলো ইতালির। ম্যাচ শেষ হতেই পোজো অভিনন্দন জানালেন খেলোয়াড়দের। তারপর তিনি সংবাদিকদের বললেন, 'এবারের বিশ্বকাপ জয় সম্পর্কে কি বলবেন, এবার তো আমরা আমাদের দেশের মাটিতে জয় পাইনি।'

সত্যি ১৯৩৮ সালের বিশ্বকাপ জয় সম্পর্কে ইতালির বিরুদ্ধে কারো কোন প্রশ্ন ছিল না। বরং বোদ্ধার দল বললেন, ইতালি যোগ্য দল হিসাবেই বিশ্বকাপ জয় করেছে। বিশ্বে এখন তারা সেরা দল। পেশাদার বাজারে দর বেড়ে গেল পিওলার। বলা হলো তাকে ইউরোপের ফুটবল যাদুকর।

১৯৩৮ সালে ইতালি হলো চ্যাম্পিয়ান আর সেই সূত্রে হাঙ্গেরী হলো দ্বিতীয়। তৃতীয় স্থান নিয়ে খেলা হলো সুইডেন ও ব্রাজিলের মধ্যে। এই ম্যাচে ৪-২ গোলে জয় পেলো ব্রাজিল। তৃতীয় স্থান দখল করে তারা জানালো আগামী দিনের সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি। বলা বাহুল্য তৃতীয় বিশ্বকাপে সর্বাধিক গোল দিয়েছিল হাঙ্গেরী। তাদের দেওয়া গোলের সংখ্যা ছিল সর্বসাকুল্যে ১৫টি। তারপরই ছিল ব্রাজিলের স্থান—১৪টি গোল। সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান পেলেন ব্রাজিলের লিওনিডাস। তিনি দিয়েছিলেন ব্রাজিলের ১৪টি গোলের মধ্যে ৮টি গোল।

এই প্রসঙ্গে পাঠকদের আর একটা খবর জানিয়ে রাখি—ইতালির তিনজন খেলোয়াড়, যথাক্রমে ; আলফ্রেডো কনি, সিট্রো-রাভা ও লোকাডেলি। এরা প্রত্যেকেই ১৯৩৬ সালে বার্লিনের ওলিম্পিকে সোনা জয়ী ইতালি দলে যেমন ছিলেন, তেমনি অংশ নিয়েছিলেন ১৯৩৮ সালে বিশ্বকাপ জয়ী দলে।

ইতালির স্বপ্ন সফল হলো। তারা দু' দুবার জয় করলো বিশ্বকাপ। কেবল একটাই দুঃখ—এত করেও পোজো পারলেন না স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে। ইংল্যাণ্ডকে হারানো তার পক্ষে সম্ভব হলো না। তৃতীয় বিশ্বকাপে ইংল্যাণ্ড যোগ না দিলেও, পোজো সুযোগ পেয়েছিলেন পরের বছর। চ্যাম্পিয়ান ইতালি ১৯৩৯ সালে ১৩ই মে তারিখের সেই খেলায় ১-০ গোলে এগিয়ে থেকেও জয়ের মুখ দেখতে পায়নি। শেষ মুহূর্তে ইংল্যাণ্ড গোল শোধ করে ইতালির স্বপ্ন মুছে দেয়।

ইতিহাস তাই অপেক্ষা করে পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য।

ব্রাজিলের বিশ্বকাপ ১৯৫০

তৃতীয় বিশ্বকাপ আসর শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হলো বিশ্বময় মহাযুদ্ধ। এই ভয়াবহ যুদ্ধের দাবানলে ছিন্নভিন্ন হলো পৃথিবীর মানুষজন। বিশেষ করে এই যুদ্ধের করাল ছায়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হলো ইউরোপের দেশগুলি। অস্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, ইতালি, জার্মান সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হলো। যুদ্ধের তাণ্ডব লীলায় ভেঙে পড়লো পৃথিবীর অর্থনৈতিক কাঠামো। কোন অবস্থার মধ্যেই পৃথিবীর মানুষ সুস্থ জীবনকে খুঁজে পাচ্ছিল না—এই অবস্থায় ফুটবলের কথা চিন্তা করা প্রায় অসম্ভব ছিল। কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে বিশ্ব ফুটবল নিয়ে নতুন করে ভাবনা চিন্তা করা। সেই কারণে বিশ্বফুটবলকে অপেক্ষা করতে হলো দীর্ঘ বারো বছর।

১৯৫০।

ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত হলো চতুর্থ বিশ্বকাপের আসর। ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনারিও'তে আসর শুরু হলো বটে তবে সে আসর মোটেই জমকালো হলো না। ইউরোপ থেকে প্রায় সবাই এলো বটে, তবে কারো মধ্যে কোন প্রাণের সাড়া ছিল না। ইতালি, স্পেন, যুগোশ্লাভ, সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন ছাড়া আর কাউকে এই আসরে অংশ নিতে দেখা গেল না। চূড়ান্ত পর্বে দেখা গেল মোট তেরোটি দেশকে অংশ নিতে। এই তেরোটি দেশের মধ্যে আটটি দেশ ইউরোপের এবং পাঁচটি এলো লাটিন আমেরিকা গোষ্ঠী থেকে। এই আসরে সর্বপ্রথম দেখা গেল ইংল্যাণ্ডকে। গতবারের আসরেই ইংল্যাণ্ডকে যোগ দিতে বলা হয়েছিল, কিন্তু তারা আভিজাত্যের গরিমা তুলে অস্ট্রিয়ার জায়গায় নিজেদের নাম লেখাতে রাজি হলো না। তাছাড়া এই আসরে দীর্ঘদিন বাদে আবার দেখা গেল উরুগুয়েকে। গত দু' দু

বারের আসরে উরুগুয়ে ইউরোপের খেলায় যোগ দেয় নি—ফলে তাদের আবির্ভাবে চতুর্থ বিশ্বকাপ সরগরম হয়ে উঠলো।

গত বিশ্বকাপ আসর যে ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সে তুলনায় এবার কিছু রদ-বদল করা হলো। নক-আউট পদ্ধতি বাতিল করে এই আসরে প্রবর্তন করা হলো প্রথম বিশ্বকাপ নিয়মে লীগ পদ্ধতির খেলা। মোট তেরোটি দলকে ভাগ করা হলো চারটি পুলে। এক নম্বর পুলে দেখা গেল ব্রাজিল, যুগোশ্লাভ, সুইজারল্যাণ্ড ও মেক্সিকোকে। দুই নম্বর পুলে থাকলো ইংল্যাণ্ড, চিলি, স্পেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তিন নম্বর পুলে ইতালি, সুইডেন ও প্যারাগুয়ে এবং চার নম্বর পুলে দেখা গেল মাত্র দুটি দলকে উরুগুয়ে ও বলিভিয়া।

চতুর্থ বিশ্বকাপ উপলক্ষ্যে রিও-ডি জেনারিও শহরে নদী উপকূলে তৈরী করা হলো এক বিশালাকৃতি ত্রিতল স্টেডিয়াম। বলা বাহুল্য এই স্টেডিয়াম পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ স্টেডিয়াম। এতবড় স্টেডিয়াম আজও বিশ্বে নির্মিত হয় নি। মারকানা স্টেডিয়ামটির উচ্চতা ৩১৮ মিটার এবং পরিধি ৯৪৫ মিটার। হিসাবে দেখা গেছে এই স্টেডিয়ামে দর্শক আসন আছে দুই লক্ষ। এই বৃহৎ স্টেডিয়ামটি কিন্তু ১৯৫০ সালের জুন মাসের মধ্যে তৈরী হতে পারেনি। দু'হাজার শ্রমিক দিয়ে ২৪ ঘণ্টা একটানা কাজ করিয়েও সম্ভব হলো না নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্টেডিয়াম তৈরী করা। ফলে সর্বাঙ্গসুন্দর করে মারকানা স্টেডিয়াম গড়ে তোলার আগেই শুরু হয়ে গেল উদ্বোধনী পর্ব।

বিশ্বকাপ জয়ের জন্য এই আসরে ব্রাজিল তৈরী ছিল ষোলো আনা। শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে ব্রাজিলের খেলোয়াড়দের নিয়ে তাঁবু গাড়লেন ম্যানেজার ফ্লেভিও কস্টা। সঙ্গে নেওয়া হলো দুইজন চিকিৎসক। ইংল্যাণ্ড এই আসরে প্রথম যোগ দেওয়ায় তাদের সম্পর্কে প্রত্যেকের উৎসাহ ছিল। দুর্ভাগ্য ইংল্যাণ্ডের—তারা এই আসরে তাদের শ্রেষ্ঠ দলটিকে পাঠাতে পারলো না। বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগের বছর অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের মে মাসে এক ভয়াবহ

বিমান দুর্ঘটনায় তাদের গোটা দলটাই শেষ হয়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় মাত্র একজন প্রাণে বেঁচে ছিলেন—তিনি হলেন ববি চার্লটন। অবশ্য ইংল্যাণ্ড এতবড় দুর্যোগ সত্ত্বেও দমে গেল না, তারা অল্পদিনের মধ্যেই শোক ভুলে দল গঠন করলেন। দলে এলেন গোলরক্ষক বার্ট উইলিয়ামস, ব্যাকে রামসে, ম্যানিয়ন, হাফে ফ্র্যাঙ্কলিন ও ফরোয়ার্ডে ম্যাথিযুজ এবং টমফিনি। ইতালি এই আসরে এলেও, তাদের দেখে খুব একটা তৈরী বলে মনে হলো না।

১৯৫০ সালের ২৪শে জুন মারকানা স্টেডিয়ামে শুরু হল বর্ণাঢ্য পরিবেশে বিশ্বকাপের উদ্বোধন পর্ব।

উদ্বোধন আসরে ব্রাজিলকে মুখোমুখি হতে হলো মেকসিকো দলের সঙ্গে। রাজসিক পরিবেশে বাদ্য বাজিয়ে, তোপধ্বনি সহকারে শুরু হল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। নীল আকাশের বুকে পতপত করে উড়ে গেল শ্বেত শুভ্র পাঁচ হাজার কবুতর। চারদিকে বাতাস কাঁপিয়ে উড়তে লাগলো অংশ গ্রহণকারী দেশগুলির জাতীয় পতাকা।

এই ম্যাচে জয়ের জন্য ব্রাজিলকে খুব একটা পরিশ্রম করতে হলো না। অতি সহজে ব্রাজিলের আত্মশক্তির কাছে পদানত হলো মেকসিকো। ৪-০ গোলে হারলো মেকসিকো। এই ম্যাচে দুটি গোল দিলেন অ্যাডেমির ও একটি করে জায়ার ও বালতাজার।

বেলোহরাইজেন্টে 'ক' বিভাগের অন্য আর একটি খেলায় যুগোশ্লাভিয়া ৩-০ গোলে জয় পেলো সুইজারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। এর ফলে যুগোশ্লাভ দলের সঙ্গে ব্রাজিলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে গোটা শহর উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। এই প্রতিযোগিতা আরও স্পষ্ট হলো যখন পোর্টো অ্যালিগ্রিতে মেকসিকোকে ৪-১ গোলে হারালো যুগোশ্লাভ। প্রথম খেলায় জয় পেয়ে মনে হয় ব্রাজিল দল বড় বেশী আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল, ফলে সুইজারল্যাণ্ডকে দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করায় তাদের ভুগতে হলো—এই ম্যাচে ব্রাজিল অত্যন্ত দুঃখজনক ফুটবল খেলছিলো। কোনরকমে গোল করে ম্যাচ বাঁচালো ব্রাজিল। ফলাফল

হলো ২-২। এই ম্যাচে ব্রাজিলের শোচনীয় ব্যর্থতার জন্য দায়ী করা হলো কোচকে। তিনি অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসী হওয়ায় দলের মধ্যে রদ-বদল করলেন চারজন খেলোয়াড়কে। তার এই ধরনের হঠকারিতার জন্য ব্রাজিলকে ভুগতে হলো। কঠিন সমালোচনার কোপে পড়লেন কোচ কস্টা। ব্রাজিলের তখন ত্রিশঙ্কু অবস্থা। শেষ ম্যাচে তাদের জয় পাওয়া দরকার, নচেৎ মূল আসর থেকে সরে যেতে হবে। এই অবস্থায় মারকানায় ব্রাজিলের শেষ খেলা পড়লো যুগোশ্লাভ দলের বিরুদ্ধে।

এই ম্যাচ নিয়ে উত্তেজনার শেষ ছিল না। যুগোশ্লাভের খেলোয়াড়েরাও যে স্নায়ু দুর্বলতায় ভুগছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেল খেলার আগে মিতিকের দুর্ঘটনায়। বেচারা মিতিক যুগোশ্লাভের শ্রেষ্ঠ তারকা, বেচারা সে বছর দারুণ খেলেছেন। ড্রেসিংরুম থেকে তাড়াতাড়ি বেরোনোর সময় মাথায় আঘাত পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন মিতিক। রক্তে তার জামা ভিজে গেল। মিতিক'কে ধরাধরি করে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাওয়া হলো ড্রেসিংরুমে। দশজনের দল নিয়ে যুগোশ্লাভ খেলা শুরু করলো। এই ম্যাচে ব্রাজিল সম্পূর্ণ নতুন ফর্মে খেলা শুরু করেছিল। কিকঅফের তিন মিনিটের মাথায় আদেমির দেওয়া গোলে এগিয়ে গেল ব্রাজিল। গোল হওয়ার পর মাথায় ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে মাঠে নামলেন মিতিক। আহত থাকায় তার খেলার মধ্যে কোন চাতুর্য ধরা পড়লো না। ভয়ে ভয়ে তিনি খেলার চেষ্টা করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে জিজিনহো আর একটা গোল দিয়ে ব্যবধান বাড়ালো ব্রাজিলের। এই গোলের পরেই যুগোশ্লাভ ম্যাচের ওপর সমস্ত দখল ছেড়ে দিল। তাদের ভরসা মিতিক আহত হওয়ায় ব্রাজিলের পক্ষে সহজ জয় এলো। যারা সুস্থ সমালোচক তারা মিতিকের আহত হওয়ায় জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। তাদের ধারণায় মিতিক যদি ম্যাচের আগে আহত না হতেন তাহলে হয়ত যুগোশ্লাভ আক্রমণে সমস্ত ছক বদলে দিতে পারতো।

দুই নম্বর পুলে বিস্ময় আনলো যুক্তরাষ্ট্র। স্পেনের মতো শক্তিশালী দলকে লড়াই করতে হলো জয়ের জন্য। বলা বাহুল্য বারোরার দক্ষতায় স্পেন ম্যাচ জিতলো ৩-১ গোলে। এই পুলে ইংল্যাণ্ডকে প্রথম খেলতে হলো চিলির বিরুদ্ধে। শক্ত সমর্থ চিলির সঙ্গে বেশ জব্বর লড়াই করলো ইংল্যাণ্ড। মর্টেনসন ও ম্যানিয়নের দেওয়া গোলে জয় পেল ইংল্যাণ্ড। চিলির বিরুদ্ধে জয় পেলেও ইংল্যাণ্ড কিন্তু বড় রকম ধাক্কা খেলো যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। অসাধারণ ফুটবল খেলে অবিশ্বাস্য জয় পেল যুক্তরাষ্ট্র। চমৎকার একটিমাত্র দৃষ্টি-নন্দন গোল এলো গেটজেনসয়ের পা থেকে। শুধু এই একটি ম্যাচে নয় পরের ম্যাচেও ইংল্যাণ্ডকে হারতে হলো স্পেনের বিরুদ্ধে। জারার গোলে স্পেন জয় পেল পেশাদার ফুটবলের গরিমাদীপ্ত দেশ ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। তিনটি খেলায় মাত্র দুটি পয়েন্ট পেয়ে গরিমা সমৃদ্ধ ইংল্যাণ্ডকে মুখ ভোঁতা হয়ে ফিরে যেতে হলো। 'খ' বিভাগের শেষ গুরুত্বপূর্ণ খেলায় স্পেন ২-০ গোলে চিলিকে হারিয়ে হলো গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান।

চতুর্থ বিশ্বকাপের সেরা বিস্ময় তখনও অপেক্ষা করছিল। সাল-পাওলোর দর্শকেরা চোখে দেখার পরও বিশ্বাস করতে পারলেন না, ইতালির হার হয়েছে। গত দু-বারের বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ান ইতালিকে অত্যন্ত দুঃখজনক ভাবে হার স্বীকার করতে হলো সুইডেনের সঙ্গে। সুইডেনের পক্ষে দর্শনীয় দুটি গোল দিলেন জেপসন। ইতালি প্রথমটায় জয়ের জন্যই খেলা শুরু করেছিল। কিন্তু তাদের খেলার মধ্যে সেই আগের মাদকতা ও শৃঙ্খলা কিছুই লক্ষ্য করা গেল না। প্রচণ্ড লড়াই করার পর সুইডেন জিতে গেল ৩-২ গোলে।

আশ্চর্য পরের ম্যাচে সুইডেনকে থমকে দিলো প্যারাগুয়ে। যে সুইডেন দুদিন আগে সম্রাট ইতালিকে হারিয়ে এসেছে সেই দলকেই কোনরকমে খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করে মান বাঁচাতে হলো। শেষ ম্যাচে ইতালি জয় পেলো প্যারাগুয়ের সঙ্গে—কিন্তু

সে জয় পেয়েও কোন কাজের কাজ হলো না। মাত্র এক পয়েন্টের ব্যবধানে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হলো সুইডেন।

চতুর্থ পুলের একটি মাত্র খেলায় বলভিয়া বিধ্বস্ত হলো উরুগুয়ের হাতে। আত্মতৃপ্তির শ্রেষ্ঠ নজির গড়ে উরুগুয়ে ম্যাচ জিতলো ৮-০ গোলে। বিশ্বকাপ পর্যায়ে এর আগে এতবড় ব্যবধানে এর আগে কোন দল জয় পায়নি। আটটি গোলের মধ্যে জুয়ান স্কিয়াফিনো একাই দিলেন চারটি গোল।

প্রাথমিক পর্যায়ের লীগ শেষ হলো। লীগের ফলাফলে দেখা গেল ঃ

ক বিভাগে ঃ ব্রাজিল ঃ ৩—২—১—০—৮—২—৫

খ বিভাগে ঃ স্পেন ঃ ৩—৩—০—০—৬—১—৬

গ বিভাগে ঃ সুইডেন ঃ ২—১—১—০—৫—৪—৩

ঘ বিভাগে ঃ উরুগুয়ে ঃ ১—১—০—০—৮—০—২

প্রাথমিক লীগ শেষ হওয়ার পর, চারটি বিভাগের চারটি চ্যাম্পিয়ান দলকে নিয়ে শুরু হলো শেষ পর্যায়ের লীগ ম্যাচ। চারটি চ্যাম্পিয়ান দলের মধ্যে ব্রাজিল তখন ফেবারিট। তবে কেউ কেউ বললেন, উরুগুয়ের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না— তারাও লড়াই করবে। তবে ফাইনালে যেই উঠুক না কেন জুলেরিমে লাটিন—আমেরিকার দখলে থাকছে। ইউরোপে যাওয়ার সম্ভাবনা কোনমতেই নেই।

ফাইনাল পুল

ফাইনাল পুলে রাজসিক মেজাজে খেলা আরম্ভ করলো ব্রাজিল। আত্মনির্ভরতায় তারা ষোলো আনা পরিপুষ্ট। যেমন তাদের নিখুঁত বল কনট্রোল, তেমনি শারীরিক দক্ষতা। তারা বুঝিয়ে দিল আগামী দিনগুলোতে কি প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিশ্বে আবির্ভূত হচ্ছে।

সুইডেনের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ব্রাজিল খেলোয়াড়েরা মাঠের মধ্যে বল নিয়ে ছেলেখেলা করলেন। তাদের নিখুঁত বল কনট্রোল, পাসিং, স্ট্যাকলিং এবং স্ন্যাচিং ছিল দেখার মতো। বিরতির আগেই ব্রাজিল তিনটি গোল দিয়ে এগিয়ে গেল। আদেমীর, চিকো মানেকা, জিজিনো, জেয়ার—কেউ-ই ওরা কারো চেয়ে কম নয়। দ্বিতীয়ার্ধে গোল হলো আরও চারটি। সর্বসাকুল্যে ব্রাজিল দিল সাত গোল। এর মধ্যে আদেমীর একাই দিলেন চারটি।

সাঁওপোলায় উরুগুয়ে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও ম্যাচ জিততে পারলো না। বিরতি পর্যন্ত ২-১ গোলে পিছিয়ে থেকে কোনরকমে গোল শোধ করে পরাজয় এড়ালো উরুগুয়ে।

এই মাঠে পরের খেলায় উরুগুয়ে জয় পেলো ৩-২ গোলে। বিরতি পর্যন্ত যখন উরুগুয়ে ১-২ গোলে পিছিয়ে ছিল তখন কেউই আশা করেনি হালকা নীল শার্ট ও কালো প্যাণ্টে সাদা ফিতে বসানো উরুগুয়েনরা ম্যাচ জিতবে। কঠিন শপথ নিয়ে উরুগুয়ে বিরতির পর কোণঠাসা করে ফেললো স্পেনকে। স্প্যানিশ ডিফেন্স উরুগুয়ের আক্রমণের সামনে তছনছ হয়ে গেল। ঘিঘিয়া, শিয়াফিনো, পোরেজ এবং অধিনায়ক ভারেলা মাঝমাঠে অসাধারণ খেললেন। বিরতির আগে যে স্পেন ২-১ গোলে এগিয়েছিল সেই তারাই পিছিয়ে গেলো ৩-২ গোলে। অবশ্য অনেকের ধারণায় জোহানসন আহত হয়ে মাঠ ছাড়ায় উরুগুয়ের পক্ষে জয় পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

স্পেনের বিরুদ্ধে উরুগুয়ের জয় তাদের বিশ্বকাপ জয় করার স্বপ্নকে জাগিয়ে তুললো অনেকখানি।

রিওতে ব্রাজিল স্পেনের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ খেলায় জয় পেল ৬-১ গোলে। উরুগুয়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্লান্ত স্প্যানিশ দল ব্রাজিলের বিরুদ্ধে কোনরকম সুবিধে করতে পারলো না। এই ম্যাচে স্পেনের গোলরক্ষার দায়িত্ব নিতে দেখা গেল আইজাগুরেকে। বিরতির আগে স্প্যানিশ রক্ষণভাগকে ছিন্নভিন্ন করে ব্রাজিল এগিয়ে

গেল ৩-০ গোলে। বিরতির পর গোল হলো আরও তিনটি। মন্দের ভালো স্পেনের ইগোয়া একটি মাত্র গোল শোধ করতে পারলেন। এই ম্যাচে চিকো ও জেয়ার দিলেন দুটি করে গোল। একটি গোল দিলেন জিজিনো। শেষ গোল এলো পারার আত্মঘাতী গোল থেকে। একমাত্র ব্যর্থ হলেন আদেমীর—তিনি হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও গোল পেলেন না।

সালপাওলোয় সুইডেন শেষ খেলায় স্পেনকে হারালো ৩-১ গোলে। এই ম্যাচে সুইডেন আত্মনির্ভরতার পরিচয় দিলো। অনবদ্য ভূমিকা গ্রহণ করলেন পামার। তার পাস থেকে দর্শনীয় গোল দিলেন জোহানসন। পরে আরো দুটো গোল এলো পামার ও মেলবার্জের তৎপরতায়। তবে প্রতিটি গোলের পিছনে ছিল রেনের অনবদ্য ভূমিকা।

ফাইনাল পুলের সমস্ত সাফল্য নির্ভর করলো শেষ ম্যাচটির ওপর। খেলার ফলাফলে এমন অবস্থা ছিল, এই ম্যাচে যে দল জয়ী হবে তারাই পাবে সোনার পরী। ব্রাজিলের বুক ভরা স্বপ্ন—তারা বুকে সাহস, মনে আশা, চোখে স্বপ্ন নিয়ে মাঠে নামলো। কোচ ফ্লেভিও কস্টা এই ম্যাচ সম্পর্কে ছিলেন অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসী। তিনি প্রকাশ্যে বললেন, 'আমাদের খেলোয়াড়েরা জার্সিতে চ্যাম্পিয়ানশিপ শীল্ড সেলাই করে নিয়েছে। কেবল মাত্র নিয়ম বাঁচাতে আমাদের মাঠে নামতে হবে।'

এই ম্যাচ সম্পর্কে ব্রাজিল যতটা আত্মবিশ্বাসী ছিল ঠিক ততোটাই আত্মসচেতন ছিলেন উরুগুয়ে দলের কোচ কর্নেল ভোলপো। তিনি বললেন, 'ব্রাজিলকে হারানো আমাদের কাছে খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়। এই বছরে আমরা ব্রাজিলকে ইতিমধ্যে হারিয়েছি।'

ইতালির ব্যক্তিত্বময় পুরুষ ভিক্টোর পোজো এবার ব্রাজিলে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক হিসাবে। মনে পড়ে ১৯৩৪-৩৮ সালের কথা। ইতালিকে এই মানুষটি বিশ্ব বিজয়ীর আসনে বসিয়েছিলেন—

সেই তার দেশ আজ পিছিয়ে গেছে বিশ্ব ফুটবলে। তবু দেশের জন্য শোক প্রকাশ না করে পোজো বললেন, 'বারো বছর আগে মার্সাই বিমান থেকে প্যারিসে যে দলটি গিয়েছিল আমি তাদের আকাঙ্ক্ষার কথা জানি। আশাকরি এই প্রতিযোগিতায় আমি তাদের বিজয়ী দল হিসাবে দেখতে পাব।'

ব্রাজিল মাঠে নামলো। সাদা শার্ট ও সাদা শর্টস পরে। তাদের সামনে উরুগুয়েনদের কুঁকড়ে থাকা ভীতু জন্তু বলে মনে হচ্ছিল। বেশ বোঝা যাচ্ছিল উরুগুয়ের ছেলেরা খেলার আগেই মানসিক দিক থেকে হেরে বসে আছে।

কিক-অফের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাজিল চললো আক্রমণে। জেয়ার, চিকো। চিকো থেকে আমেদীর—জিজিনো। কোনরকমে আক্রমণ ঠেকালেন ভারেলা। কিন্তু ভারেলা কতবার আক্রমণের চাপ সামলাবেন। ত্রয়ী ব্রাজিলিয়ান—জিজিনো, আমেদীর, জেয়ার একের পর এক আক্রমণের ঝড় তৈরী করে চলেছেন। তাদের এক-টানা ঝড়ো আক্রমণের সামনে রক্ষণ প্রাচীর টিকিয়ে রাখা দায় হয়ে উঠলো ভারেলার। প্রথম গোল এলো দ্বিতীয়ার্ধের আঠারো মিনিটে। চিকো, জিজিনো, জেয়ার হয়ে ফ্রিয়াকা। মাসপোলি পারলেন না সেই দুরন্ত শটকে ধরতে। এই ব্যবধান বেশীক্ষণ বজায় থাকলো না, শিয়াফিনো গোল শোধ করলেন। খেলায় সমতা ফিরে আসতেই উরুগুয়ে মরিয়া হয়ে উঠলো, মাঝ মাঠে ভারেলা তখন অনবদ্য ভূমিকা নিয়েছেন। চিকোর ফ্রিকিক মাঝপথে ধরে নিলেন ভারেলা। তার সামনে কেউ নেই। ঝড়ের গতিতে এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। তারপর চকিতে ক্রশপাস দিলেন পেরেজকে। পেরেজ চলতি বলে টোকা দিয়ে পাঠালেন ঘিঘিয়ার কাছে। সামনে ব্রাজিলের আগুয়ান ব্যাক। ঘিঘিয়া মোচড় মেরে তাকে আক্রমণ করেই নিলেন জোরালো শট। বল বাতাসে বাঁক নিয়ে জালে জড়িয়ে গেল। এই গোলেই মীমাংসা হয়ে গেল পঞ্চাশের বিশ্বকাপ। শেষ মুহূর্তে ব্রাজিল আক্রমণ

চালিয়েও গোল পেলো না, মসপোলি অবধারিত গোল বাঁচালেন। ২-১ গোলে ম্যাচ হারলো ব্রাজিল।

জয় পেলো উরুগুয়ে। অনবদ্য বীর ভারেলা হাতে তুলে নিলেন 'সোনার পরী'। দীর্ঘ কুড়ি বছর পর আবার জুলেরিমে গেল মন্টি ভি-ডিও শহরে।

শোনা যায় এই উত্তেজনাময় ম্যাচে ধারাবিবরণী শুনতে শুনতে তিনজন মারা যায়। একজন উরুগুয়ে সমর্থক জয়ের আনন্দে নিজেকে গুলি করে দেশকে সম্মান জানালেন। এছাড়াও ইতস্তত ঘটলো আরও কিছু বিক্ষপ্ত ঘটনা।

ফাইনাল লীগে চূড়ান্ত পর্যায়ে অবস্থা দাঁড়ালো ঃ

উরুগুয়ে—৩—২—১—০— ৭—৫—৫

ব্রাজিল—৩—২—০—১—১৪—৪—৪

সুইডেন—৩—১—০—২—৬—১১—২

স্পেন— ৩—০—১—২—৪—১১—১

বলা বাহুল্য উরুগুয়ে ব্রাজিলের শেষ খেলায় মারকানায় দর্শক সংখ্যা ছিল ১,৯৯,৮৫০ জন। এই উপস্থিতি বিশ্ব ফুটবলের একটি রেকর্ড হয়ে আছে। ১৯৫০ সালের আসরে ব্রাজিল যে কেবল সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান পেয়েছিল তাই নয় সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত গোল-দাতা হিসাবেও সেবার সেরা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন ব্রাজিলের আদেমীর। তার দেওয়া গোলের সংখ্যা ছিল সাতটি। উরুগুয়ের অধিনায়ক ভারেলা ছিলেন বিশ্বকাপ আসরে বয়স্ক অধিনায়ক। এই কাপ প্রতিযোগিতার সময় তার বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ—পরে ১৯৫৮ সালেও তিনি ৩৯ বছর বয়সেও প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

১৯৫০ সালের আসর শেষ হলো। এই আসর শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বফুটবল কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করলেন আগামী চুয়ান্নর আসর বসবে—সুইজারল্যাণ্ডে—চল সুইজারল্যাণ্ড।

হাঙ্গেরীর আবির্ভাবঃ (১৯৫৪)

সুইজারল্যাণ্ড আসর বিশ্বকাপের ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় এবং বিস্ময়কর নজির। গতানুগতিক ধারাকে সম্পূর্ণ বদল করে আন্তর্জাতিক ফুটবলে এক নয়া টেকনিক নিয়ে এলো হাঙ্গেরী। ৪-২-৪ পদ্ধতির ফুটবল প্রবর্তক হাঙ্গেরী পঞ্চাশ দশকে যেমন বিস্ময় গড়ে তুললো নয়া পদ্ধতির তেমনি তাদের অপ্রতিরোধ্য জয়ধারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করলো প্রত্যেকের মনে।

লৌহ যবনিকার অন্তরাল থেকে আত্মপ্রকাশ করে হাঙ্গেরী বিশ্বের মানুষকে দেখিয়ে দিলো কেমন করে ফুটবল খেলতে হয়। স্কিল, সুটিং এবং টেকনিকে পারদর্শী হাঙ্গেরী ফুটবলের নেতৃত্ব দিলেন ফেরাঙ্ক পুসকাস।

ইউরোপের মানুষ প্রথম চমক উঠেছিল হাঙ্গেরীর রাজসিক অভ্যুত্থানে। পঞ্চাশের গোড়াতেই হাঙ্গেরী জয় করলো হেলসিঙ্কি ওলিম্পিকে স্বর্ণপদক। ইউরোপের সেরা দলগুলি পদানত হতে বাধ্য হলো। যে ইংল্যাণ্ড এতকাল আত্মগরিমায় মগ্ন ছিল, সেই তারাই নাস্তানাবুদ হলো হাঙ্গেরীর হাতে। মাত্র ছ'মাসের মধ্যে দুটি খেলায় হাঙ্গেরী দিলো তেরোটি গোল। ওয়েমব্লিতে ইংল্যাণ্ড হারলো ৬-৩ গোলে, বুদাপেস্টে ৭-১ গোলে।

বিশ্বকাপ শুরুর মুখেই হাঙ্গেরী দলকে নিয়ে শুরু হয়ে গেল বিস্তর জল্পনা-কল্পনা। হাঙ্গেরী যে সোনার পরী জয় করবে এই বিষয়ে কারো মনে কোন সন্দেহ ছিল না। কাজেই বিশ্বকাপের পূর্বাভাষে বিশেষজ্ঞের দল হাঙ্গেরীকেই চ্যাম্পিয়ান বলে ঘোষণা করলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালই হলো ফুটবলে হাঙ্গেরীর স্বর্ণ যুগ। এই যুগ সৃষ্টির মূলে ছিলেন গুস্তাফ সেবেস। সেবেস ছিলেন হাঙ্গেরী ফুটবলের একজন সাংগঠনিক কর্তা। তিনি গোটা পদ্ধতিকে নতুন

করে ঢেলে সাজালেন। গুস্তাভ সেবেসের সমস্ত পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার ভূমিকা নিলেন ফেরেঙ্ক পুসকাস। অসাধারণ ফুটবলার এই পুসকাস, যিনি কেবলমাত্র একটি পায়ের ওপর নির্ভর করে গোটা বিশ্বকে চমকে দিলেন। বিশ্বকাপ পর্যায়ে হাঙ্গেরীর প্রথম লড়াই করার কথা ছিল পোল্যাণ্ডের সঙ্গে। কিন্তু পোল্যাণ্ড স্ক্রাচড হওয়ায় হাঙ্গেরীকে ওয়াক-ওভার দিয়ে ম্যাচ জয়ের সুযোগ দেওয়া হলো না। তাদের খেলানো হলো পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে।

বিশ্বকাপ কমিটি এই আসরে বেশ কিছু হাস্যকর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এমনভাবে ছাঁটাই পর্বের খেলা শুরু হয়েছিল যে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কেউ কোন কারণ খুঁজে পেলেন না। প্রতিটি গ্রুপে বারোটি করে দল থাকলেও, সেই গ্রুপের চারটি দলকে আলাদা করে রাখা হলো। প্রতি গ্রুপে রাখা হলো দুটি বাছাই দল। ওরাই বাকি দুটি দলের সঙ্গে খেলবেন। অর্থাৎ প্রতি গ্রুপে দুটি করে খেলা। এর ফলে দুটি দলের মধ্যে একই পয়েন্ট পাওয়ার সম্ভাবনা থেকে গেল ষোলো আনা। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করে কমিটি সিদ্ধান্ত নিলেন, নির্দিষ্ট সময়ে যদি খেলা অমীমাংসিত হয়ে থাকে তাহলে সেই খেলাকে অতিরিক্ত সময়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এছাড়া গ্রুপের খেলা শেষ হলে যদি দেখা যায় দুটি দল সমান পয়েন্ট পেয়েছে, তাহলে দুই দলের মধ্যে হবে প্লে-অফ-ম্যাচ।

পুল লীগের দুটি খেলায় হাঙ্গেরী অতি সহজে জয় পেল। প্রথম ম্যাচে হাঙ্গেরী বিধ্বস্ত করলো কোরিয়াকে ৯-০ গোলে। জীবর ও হিদিকুটি দিলেন তিনটি করে গোল। বাকি গোল এলো পুসকাস, ল্যাণ্টোস ও পালোটাসের পা থেকে। পরের ম্যাচে জার্মানী বিধ্বস্ত হলো ৮-৩ গোলে। এই ম্যাচে কোজিস দিলেন চারটি গোল, হিদিকুটি দুটি এবং একটি করে গোল এলো পুসকাস ও টথের পা থেকে। ফলে হাঙ্গেরী বাছাই দল হিসাবে ২টি খেলায় ১৭টি গোল দিয়ে পেলো চার পয়েন্ট। দ্বিতীয় হলো পশ্চিম জার্মানী।

'ক' বিভাগ থেকে ব্রাজিল ভাল খেলে সেরা দল নির্বাচিত হলো। বলা বাহুল্য ১৯৫৪ সালের বিশ্বকাপে ব্রাজিল দলে দেখা গেল না জিজিনো, আদেমীর ও জেয়ারকে। এই আসরে ব্রাজিলের চমক আনলেন ডিডি, যার ফ্রিকিক ছিল অনবদ্য। ফুলব্যাকে দেখা গেল দুই স্যান্টোসকে, সঙ্গে বাউয়ের ও পিনহিরোর মতো প্রতিভা।

এই গ্রুপে আর যে দল ছিল তাদের মধ্যে একমাত্র যুগোশ্লাভকেই কিছুটা শক্তিশালী বলে মনে হয়েছিল। তাদের নব আবিষ্কৃত গোলরক্ষক বিয়ারা সকলের নজর কেড়ে নিলেন। ব্রাজিল প্রথম ম্যাচে মেকসিকোকে বিধ্বস্ত করলো ৫-০ গোলে। যুগোশ্লাভ জয় পেল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। এই গ্রুপের সেরা খেলা ছিল ব্রাজিল বনাম যুগোশ্লাভের মধ্যে। ব্রাজিল প্রাণপণ চেষ্টা করেও একাধিক গোল করতে পারলো না। ম্যাচ শেষ হলো ১-১ গোলে।

তিন নম্বর পুলে অস্ট্রিয়া, স্কটল্যাণ্ড, উরুগুয়ে ও চেক দলের মধ্যে উরুগুয়ে ছিল সেরা দল। তারা মূলত উইং দিয়ে খেলার চেষ্টা করলো। এর কারণে উরুগুয়ে দলে দেখা গিয়েছিল নতুন দুই উইংগারকে। গতবারের উইংগার ঘিঘিয়ার জায়গায় এলেন আবাদী, এবং জুলিও পেরেজের জায়গার জেভিয়ার অ্যামব্রয়। তবে পুরনোদের মধ্যে মাসপোলি, আন্দ্রাদে, শিয়োফিনো সবাই হাজির ছিলেন যথাযথ জায়গায়।

উরুগুয়ে চেক দলের বিরুদ্ধে প্রথম জয় পেল ২-০ গোলে। গোল দিলেন সেই শিয়াফিনো এবং মির্গুয়েজ, পরের ম্যাচে স্কট দলের সঙ্গে যেন ছেলেখেলা করলেন উরুগুয়েনরা। সাত গোল দেওয়ার পর আর তারা ব্যবধান বাড়াতে চেষ্টা করলেন না।

চার নম্বর পুলে প্রাধান্য বজায় রাখলো ইংল্যাণ্ড এবং ইতালি। প্রথম ম্যাচে অবশ্য ইংল্যাণ্ড সুবিধে করতে পারলো না। বরং বলা যায় সবাইকে অবাক করে এই ম্যাচে ভাগ্য জোরে ইংল্যাণ্ড কোনরকমে পরাজয় এড়ালো। ম্যাচ শেষ হলো ৪-৪ গোলে।

পরের ম্যাচে সুইজারল্যাণ্ড হারলো ইংল্যাণ্ডের কাছে ২-০ গোলে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ফলাফল হলো ইতালি ও সুইজারল্যাণ্ডের খেলায়। এই ম্যাচে সুইজারল্যাণ্ড ২-১ গোলে হারিয়ে দিলো ইতালিকে। ফলে পুল খ ও পুল ঘ বিভাগে দুটি প্লে-অফ-ম্যাচ খেলা হলো। খ বিভাগে প্লে-অফ ম্যাচ হলো পশ্চিম জার্মানী ও তুরস্কের মধ্যে এবং ঘ বিভাগে ইতালি বনাম সুইজারল্যাণ্ড। এই দুই ম্যাচের মধ্যে একটিতে জার্মান জয় পেল ৭-২ গোলে। অন্যটায় সুইজারল্যাণ্ড বিজয়ী হলো ৪-১ গোলে। ফলে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে এলো মোট আটটি দল। এই আটটি দল হলো যথাক্রমে ; হাঙ্গেরী, পশ্চিম-জার্মানী, উরুগুয়ে, ব্রাজিল, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড এবং যুগোশ্লাভ। পয়েণ্ট বিচারে সাফল্য ছিল যথাক্রমে ;

পুল এক : ব্রাজিল : ২—১—১—০— ৬—১—৩
যুগোশ্লাভ : ২— ১—১—০— ২—১—৩

পুল দুই : হাঙ্গেরী : ২—২—০—০—১৭—৩—৪
পঃ জার্মানী : ২—১— ০—১— ৭—৯—২
তুরস্ক : ২— ১—০—১— ৮—৪—২

(প্লে-অফ ম্যাচে জার্মানীর হাতে তুরস্ক পরাজিত হয় ৭-২ গোলে।)

পুল তিন : উরুগুয়ে : ২—২—০—০—৯—০—৪
অস্ট্রিয়া : ২—২—০—০—৬—০—৪

পুল চার : ইংল্যাণ্ড : ২—১—১—০—৬—৪—৩
ইতালি : ২—১—০—:—[illegible]—৩—২
সুইজারল্যাণ্ড : ২—১—০—১—২—৩—২

(প্লে-অফ গেমে সুইজারল্যাণ্ড ইতালিকে হারায় ৪-১ গোলে।)

প্রাথমিক লীগের পর আটটি দল নিয়ে শুরু হলো কোয়ার্টার ফাইনালের খেলা। এই পর্যায়ে চারটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

বারন'এর রক্তাক্ত ফুটবল :

বারনে মিলিত হলো হাঙ্গেরী ও ব্রাজিল। এই দুই দলের খেলা দেখে মাঠের দর্শকেরা শিউরে উঠলেন। আশ্চর্য! এর নাম কি ফুটবল? বল ছেড়ে খেলোয়াড়েরা পরস্পরকে লাথি মারলেন। পরে শুরু হলো ধস্তাধস্তি, হাতাহাতি, তবে মাঠে খেলার সুস্থ পরিবেশকে নষ্ট করার জন্য সমালোচকেরা অধিকাংশে দায়ী করলেন ব্রাজিলিয়ানদের। তারা পরিষ্কার ভাষায় বললেন, বারন'এ নৃশংস ফুটবলের জন্য ব্রাজিল ষোলো আনা দায়ী। তারা ভীষণভাবে মারধোর করেছে। এই ম্যাচে পুসকাস আহত থাকায় তার জায়গায় হাঙ্গেরী দলে আনা হয় জীবরকে।

প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে খেলা শুরু হয়। উভয় দলই এমনভাবে খেলা শুরু করে দেখে মনে হয় এটাই যেন বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচ হচ্ছে।

পুসকাসহীন হাঙ্গেরীর খেলার মধ্যে যেমন ছিল প্রচণ্ড গতি তেমনি ছিল অনুপম কলাশৈলী। ছন্দ, তাল বজায় রেখে একের পর এক আক্রমণ চালাতে লাগলেন হাঙ্গেরীর ফরোয়ার্ডেরা। জীবর, হিদিকুটি, টথ কোজিসের খেলা অসাধারণত্বের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। মাঝ মাঠে বোজসিক অনবদ্য। প্রথম সাত মিনিটের মধ্যে অসামান্য বোঝাপড়ায় খেলে হাঙ্গেরী অতি সহজে এগিয়ে গেলো ২-০ গোলে।

হাঙ্গেরী তখন যে ভাবে খেলছে তাতে ব্যবধান বেড়ে যে কত গুণ দাঁড়াবে তা অনুমান করা অসম্ভব হয়ে উঠলো দর্শকদের কাছে। দশ মিনিটের মাথায় তৃতীয় গোল করার সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারলেন না হিদিকুটি। তার প্যাণ্টের ইলাস্টিক ছিঁড়ে যাওয়ায় তিনি টথের থ্রু ধরতে পারলেন না।

দুগোলে পিছিয়ে পড়া ব্রাজিল লড়াইয়ের জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। ডিডি, ইণ্ডিয়ো প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন খেলায়

ব্রাজিলের প্রাধান্য ফিরিয়ে আনার জন্য। সাতেরো মিনিটের মাথায় ডিডি একক চেষ্টায় দ্রুত এগিয়ে গেলেন হাঙ্গেরীর সীমানায়। ডিডির পাশে ইণ্ডিয়ো। নিরুপায় বুজানস্কি উপায়ন্তর না পেয়ে পিছন থেকে পা বাড়িয়ে ফেলে দিলেন ইণ্ডিয়োকে। ইণ্ডিয়ো ভূ-পতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাঁশি বাজালেন রেফারি। পেনালটি থেকে প্রথম গোল করলেন ডালমা স্যাণ্টোস।

বিরতির পর খেলার চাতুর্য পরিলক্ষিত হলো না। ব্রাজিল শুরু করলো পাওয়ার ফুটবল খেলতে। জীবর ও কোজিসকে ধরতে না পেরে তাদের সপাটে লাথি চালানো হলো। একবার তো কোজিসের মুখে লাগছিল ডালমা স্যাণ্টোসের বেয়াড়া পায়ের জোরালো লাথি। ফাউল আর ফাউল। ঘন ঘন বাঁশি বাজাতে লাগলেন রেফারি। এরপর গোল সীমানার মধ্যে কোজিস পিনহিরোকে টপকে যেতেই তিনি হাত দিয়ে বল ধরে ফেললেন। ফলে পেনালটি পেলো হাঙ্গেরী। এই পেনালটির ফলে ল্যাণ্টোসের জোরালো শট ব্যবধান বাড়িয়ে দিল হাঙ্গেরীর।

মাঝ মাঠে ডিডি খেলা ধরলেন। তিনি বল বাড়ালেন লম্বা করে জুলিনোর কাছে। নিখুঁত পাস। তিরিশ গজ দূর থেকে চমৎকার শট নিলেন জুলিনো। এই শট বাতাসে বাঁক নিয়ে গোলে ঢোকার মুখে অভাবনীয় ভাবে রক্ষা করলেন গ্রসিকস।

কিন্তু তিন মিনিট যেতে না যেতেই গোল হলো। সেই জুলিনোর শটেই দ্বিতীয় গোল পেল ব্রাজিল। খেলার ফলাফল ৩-২ দাঁড়াতেই, উত্তেজনা বেড়ে গেল। উভয় দলই স্নায়বিক চাপে ভুগছিল। যে করেই হোক গোলের প্রয়োজন ছিল হাঙ্গেরীর। বোজসিক বল নিয়ে মাঝ মাঠ ধরে এগিয়ে যেতেই তার দিকে ছুটে এলেন স্যাণ্টোস। কঠিন ট্যাকলিং—ভারসাম্য বজায় রাখতে না পেরে বোজসিক পড়ে গেলেন মাটিতে। মাটি থেকে উঠেই তিনি ঘুষি মারলেন স্যাণ্টোসকে। পালটা হাত চালালেন স্যাণ্টোস।

মাঠের মধ্যে তখন দুজনে যেন বল ছেড়ে কুস্তি করছেন। রেফারি দ্রুত ছুটে গেলেন। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য মাঠের বাইরে বার করে দিলেন দুই খেলোয়াড়কে। আবার খেলা শুরু হলো। ডিডি তখন অসাধারণ খেলছেন।

ডিডির একটা দুরন্ত শট বারপোস্টে লেগে ফিরে গেল। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন ডিডি। এবার বল এলো জুলিনোর পায়ে —দুর্ভাগ্য জুলিনোর, অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেন। ব্রাজিল তখন গোল শোধের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। একমাত্র জিটোকে পিছনে ফেলে উঠে এসেছে গোটা দল। চুয়াল্লিশ মিনিটের মাথায় হঠাৎ একটা বল এসে গেল জীবরের পায়ে। বল পায়ে নিয়ে জীবর দৌড় শুরু করলেন। বেচারা এতক্ষণ মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে ঘাস গুণছিলেন। জীবরের লম্বা দৌড়ে ব্রাজিল খেলোয়াড়েরা হতচকিত হয়ে পড়লেন। কি করবেন ভেবে পেলেন না। রক্ষণভাগের খেলোয়াড়েরা জায়গা নেওয়ার আগেই জীবরের সেণ্টারে মাথা ছুঁয়ে হাঙ্গেরীকে ৪-২ গোলের ব্যবধানে এগিয়ে দিলেন কোজিস।

তখনও খেলা শেষ হতে কিছু সময় বাকি। ব্রাজিলের তরুণ খেলোয়াড় টোজি লোরাণ্টকে লাথি মারার জন্য রেফারি তাকে মাঠ থেকে বহিষ্কার করলেন। বেচারা টোজি মাঠের মধ্যে হাঁটু ভেঙে বসে রেফারির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা চেয়েও কোন লাভ হলো না। শিশুর মতো অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে তিনি মাঠের বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

এতো গেল মাঠের ভিতরকার অবস্থা। খেলার শেষে ঘটলো আরও জঘন্য কাণ্ড। ড্রেসিং রুমে ফেরার পথে হাঙ্গেরীর ম্যানেজার গুস্তাব সেবস মাথায় আঘাত পেলেন। মাথা ফেটে রক্ত বেরুলো। অন্যদিকে ব্রাজিলের পিনহিরোর মুখে এসে পড়লো বিয়ারের বোতল। জার্সি ছিঁড়ে ধস্তাধস্তি করলেন অনেকে। ব্রাজিলের গোলরক্ষক ক্যাস্টিলো গোলমাল থামাতে গিয়ে আহত হলেন। ফুটবল ঘিরে বিশ্বকাপে এমন নৃশংস রক্তারক্তির ঘটনা এই প্রথম ঘটলো।

অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে জেনিভায় পশ্চিম জার্মানী ভাগ্য জোরে জয় পেলো যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে। যুগোশ্লাভ এই ম্যাচে সুবিধে করতে পারলো না। ২-০ গোলে তারা হেরে গেল।

লুসানে অস্ট্রিয়া ও সুইজারল্যাণ্ডের খেলায় গোলের ছড়াছড়ি হলো। গোল পেলো উভয় দলই। একজন গোল দেয় তো অন্যজন শোধ করে। শেষে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর সুইজারল্যাণ্ড ম্যাচ হারলো ৭-৫ গোলের ব্যবধানে।

ব্র্যাসেলে উরুগুয়ে-ইংল্যাণ্ডের খেলায় প্রাণ ছিল। সেদিন যথেষ্ট গরম ছিল। ওই গরমের মধ্যেই ইংলিশ ফুটবলারেরা সমান তালে লড়াই চালালেন উরুগুয়ের সঙ্গে। দল হিসাবে উরুগুয়ে যথেষ্ট শক্তিশালী। তবু এই শক্তিশালী দলকে একাই তছনছ করলেন বর্ষীয়ান্ স্ট্যানলী ম্যাথিযুজ। উনচল্লিশ বছর বয়স নিয়েও ওই গরমের মধ্যে তেতেপুড়ে তিনি আক্রমণ শানাতে লাগলেন।

খেলা শুরু হওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চমৎকার গোল দিয়ে উরুগুয়ে এগিয়ে গেল। শিয়াফিনো একাই জনা দুই ডিফেনডারকে কাটিয়ে চমৎকারভাবে বল বাড়ালেন গোলের কাছে, যা থেকে বার-জেসের পক্ষে গোল দেওয়া ছাড়া বলটিকে বাইরে মারার কোন উপায় ছিল না। মেরিক কাঠের পুতুলের মতো কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন বলটা কিভাবে তাকে অতিক্রম করে গোলের মধ্যে প্রবেশ করলো। এই গোলের পর উরুগুয়ে আবার একটি সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারলো না। এগারো মিনিটের মাথায় ম্যাথিযুজ উইং ধরে আক্রমণ শুরু করে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। সামনে আগুয়ান ভারেলা। চমৎকার পায়ের টানে ম্যাথিয়ুজ ভারেলাকে অতিক্রম করে সুন্দর সেণ্টার করলেন উইলশকে। উইলশ বল ধরেই ঠেলে দিলেন লফটহাউসকে। লফটহাউস কাল বিলম্ব না করে খেলায় সমতা আনলেন। এই গোলের পর ইংল্যাণ্ড যেন প্রতিযোগিতায় ফিরে এলো। পাক্কা ২০ মিনিট একা ম্যাথিয়ুজ ছিন্নভিন্ন করে দিলেন

উরুগুয়ের রক্ষণভাগ। চাপের মুখে অতিষ্ঠ উরুগুয়ের সাত-আটজন খেলোয়াড় একেবারে নেমে এলেন গোল লাইনে। এই সময় দু-দুটো অব্যর্থ গোলের সম্ভাবনাকে ব্যর্থ করে দিলেন অভিজ্ঞ মাসপোলি। একবার তো লফটহাউসের দুরন্ত শট থেকে গোল হয় আর কি। শেষ মুহূর্তে বলের ওপর ঝাঁপিয়ে মাসপোলি গোল বাঁচালেন। উইলশের শট বাতাসে বাঁক নিয়ে পোস্টে লেগে ফিরে গেল।

খেলা যখন একতরফা ইংল্যাণ্ডের অনুকূলে, ঠিক তখনই চকিতে একটা পাল্টা আক্রমণ করলো উরুগুয়ে। ভারেলার পেনালটি বক্সের বাইরে থেকে আচমকা একটি শট নিতেই মেরিক হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। কোনরকম বাধা না পেয়ে বলটি মেরিকের পাশ দিয়ে জালে জড়িয়ে গেল। এই গোলের পর ভারেলাও মনে হয় লজ্জিত হয়েছিলেন। তিনি নিজেও আশা করেন নি, বিশ্বকাপের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ আসরে এত সহজে তিনি গোল করতে পারবেন।

বিরতির সময় উরুগুয়ে এগিয়ে।

পেশীতে টান ধরেছে ভারেলা, আবাদি, আন্দ্রাদের—তবু তারা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে খেলতে লাগলেন। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে শিয়াফিনোকে আনা হলো ভারেলার জায়গায়। নতুন জায়গায় শিয়াফিনো ভালই খেললেন। উরুগুয়ের তৃতীয় গোল এলো অভাবনীয় ভাবে। হঠাৎ দেখা গেল ভারেলা ফ্রি-কিকের জন্য বল বসালেন। কিন্তু কিসের ফ্রি-কিক? ব্যাপারটা বোঝার আগেই ভারেলার শট চলে এলো শিয়াফিনোর কাছে। চলতি বলে তিনি ছুটে গিয়ে পা ছুঁয়ে দিলেন—তিন এক গোলে পিছিয়ে গেল ইংল্যাণ্ড।

বিরতির পর ইংল্যাণ্ড আবার একতরফা আক্রমণে চেপে ধরলো। ম্যাথিযুজের জোরালো শট পোস্টে লেগে ফিরে এলো। এরপরই টমফিনির উঁচু শট মাসপোলির হাতে লেগে প্রবেশ করলো গোলে। ফলাফল ৩-২। এই অবস্থায় মেরিকের ভুলে চতুর্থ গোল পেলো উরুগুয়ে। ফলে ইংল্যাণ্ডকে বিদায় নিতে হলো। আশ্চর্য ইংলিশ

গোলরক্ষক মেরিক—তিনি এত অভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও ভুল করলেন কি করে। তাকে দেখে এইদিন অসম্ভব নড়বড়ে বলে মনে হয়েছে। অনেকের ধারণা যদি এই ম্যাচে মেরিক একটু সাহসী হতে পারতেন, তাহলে হয়ত উরুগুয়ের পক্ষে চারটি গোল করা সম্ভব হতো না।

ইংল্যাণ্ড বিদায় নিলো, ফলে সেমিফাইনালে উরুগুয়েকে লড়তে হলো হাঙ্গেরীর সঙ্গে। অন্যদিকে অস্ট্রিয়ার মুখোমুখি হলো পশ্চিম জার্মানী।

সেরা ম্যাচ বা গ্রেট গেমস ঃ

লুসানে বিশ্বকাপের সেরা খেলা হলো উরুগুয়ে বনাম হাঙ্গেরীর। গত ম্যাচের সমস্ত কালিমাকে জলাঞ্জলি দিয়ে হাঙ্গেরী উরুগুয়ের বিরুদ্ধে নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হলো। খেলার আগে সবাই হাঙ্গেরী সম্পর্কে যতটা নিশ্চিন্ত ছিলেন, ঠিক ততোটা অনিশ্চিন্ত হয়ে পড়লেন ম্যাচ শুরুর পর। ইংল্যাণ্ডকে হারিয়ে বিগত বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ান উরুগুয়ে যেন অন্য মেজাজে খেলা শুরু করলো। দুই প্রান্তের দুই চ্যাম্পিয়ান দল—একটি ইউরোপের সেরা, অন্যটি দক্ষিণ মার্কিন মণ্ডলের। এই ম্যাচে কে জিতবে সে বিষয়ে মন্তব্য করা কঠিন হয়ে উঠলো। পুসকাস এইদিনও মাঠে নামলেন না। শোনা গেল তার পায়ের আঘাত অত্যন্ত গুরুতর। এই ম্যাচে দুই দলই তার উইংগার বদল করলেন। আবাদির জায়গায় এলেন সাত্তো, হাঙ্গেরীর পক্ষে টথের জায়গায় আনা হলো বুদাইকে। এই পরিবর্তনে জীবর চলে এলেন লেফট-উইং পজিসানে। উরুগুয়ে বদল করলো মিগুয়েজের জায়গায় হোবার্জকে—শিয়াফিনেকে খেলানো হলো স্বস্থানে।

বৃষ্টির মধ্যে খেলা শুরু হলো। ঝমঝম বৃষ্টিতে ফুটবল চললো দ্রুতগতিতে। কোনভাবেই এই খেলার গতি যেমন নষ্ট হলো না,

তেমনি নষ্ট হলো না ফুটবলের টেকনিক্যাল রীতিনীতিগুলি। বরং সব মিলিয়ে খেলা অসাধারণত্বের মাত্রায় পৌঁছালো।

উরুগুয়ে দ্রুতলয়ে খেলা শুরু করা সত্ত্বেও সূচনায় পিছিয়ে গেলো জীবরের দেওয়া গোলে। চমৎকার বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে এই গোলটি হলো। হিদিকুটি পাস দিলেন জীবরকে। জীবর বল তুলে দিলেন কোজিসকে। কোজিস হেড দিয়ে সেই বল জীবরকে ফেরৎ পাঠালেন। চলতি বলে ড্রপকিক করে জীবর এগিয়ে দিলেন হাঙ্গেরীকে। বিরতি পর্যন্ত আর গোল এলো না। দ্বিতীয় গোল এলো হিদিকুটির হেড থেকে। এই গোলের জন্য পুরোপুরি দায়ী করা যেতে পারে বোজসিককে।

দু' গোলে পিছনো উরুগুয়ে এবার যেন তেতে উঠলো। আক্রমণের নেতৃত্ব নিলেন শিয়াফিনো। তিনি আপ্রাণ লড়তে লাগলেন। ষাট মিনিটের মাথায় শিয়াফিনোর চমৎকার পাস থেকে গোল দিলেন হোবার্জ। খেলা তখনও হাঙ্গেরীর স্বপক্ষে। আর মাত্র মিনিট তিনেক বাকি—শিয়াফিনো ও হোবার্জ অসামান্য বোঝাপড়ায় এগিয়ে গেলেন। সামনে বোজসিক। হোবার্জ তাকে কাটিয়ে নিজেই গোলে শট নিলেন। গ্রসিকস বাঁচাতে পারলেন না সেই শট। ফলাফল দাঁড়ালো ২-২।

প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ের খেলা শেষ হলো। শুরু হলো অতিরিক্ত সময়ের খেলা। উরুগুয়ে তখন মন প্রাণ উজাড় করে দিয়েছে জয়ের জন্য। মাঝ মাঠে হঠাৎ কঠিন ট্যাকল করতে গিয়ে আহত হলেন আন্দ্রাদে। তাকে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো চিকিৎসার জন্য। এই সুযোগে বুদাইয়ের সুন্দর সেণ্টারে মাথা ছুঁয়ে কোজিস হাঙ্গেরীর পক্ষে তৃতীয় গোল দিলেন। সমাপ্তির সাত মিনিট আগে কোজিস আর একটি হেড দিয়ে দর্শনীয় গোল করায় উরুগুয়ে পিছিয়ে গেলো ৪-২ গোলের ব্যবধানে। ফলে উরুগুয়ের ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন মুছে গেল। ফলে নিশ্চিন্ত হাঙ্গেরীকে অপেক্ষা করতে

হলো ফাইনালের জন্য, কতক্ষণে তারা লিখিতভাবে জয় করবে সোনার পরী।

অন্য আর একটি সেমিফাইনালে পশ্চিম জার্মানী সহজে জয় পেল অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে। ফলে ফাইনালে মুখোমুখি হলো পশ্চিম জার্মানী ও হাঙ্গেরী।

বিশ্বকাপের বিস্ময় পশ্চিম জার্মানী ঃ

৪ঠা জুলাই, বারনে অনুষ্ঠিত হলো ফাইনাল আসর। এই ম্যাচ ঘিরে প্রথম দিকে কোন উত্তেজনা ছিল না। সবাই ধারণা করে নিয়েছিল দুর্ধর্ষ হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে এঁটে ওঠা জার্মানদের পক্ষে কোনমতেই সম্ভব হবে না। পুল লীগে এই হাঙ্গেরী তাদের শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ করে ছিল। মনে হয় আট গোলের কথা এখনও জার্মান খেলোয়াড়সহ কোচ কেউই বিস্মৃত হননি। কাজেই জুলেরিমে যে হাঙ্গেরী দেশে যাবেই এই বিশ্বাস দেশ-ভেদে প্রতিটি মানুষের মনেই ছিল। কেবলমাত্র তারা অপেক্ষা করছিল নিয়ম রক্ষায় ম্যাচটির জন্য।

ফাইনালে যেমন উত্তেজনা ছিল না, তেমনি চড়া হার ছিল না বাজির দরে। হাঙ্গেরীর পক্ষ সমর্থনে বিশ্বের সাংবাদিকেরা প্রায় নিশ্চিন্ত ছিলেন। কেউ কেউ বললেন, এই ম্যাচে শেপহারবারজারের এক-মাত্র কাজ হবে এমন স্টাটিজি ঠিক করা, যাতে হাঙ্গেরী পুল লীগের গোল সংখ্যার অঙ্ক বাড়াতে না পারে।

আচ্ছা, এই ম্যাচে কি পুসকাস খেলছেন ?

অসম্ভব ! পুসকাসের পক্ষে ফাইনাল খেলা সম্ভব নয়। ভদ্রলোক পুল লীগে জার্মানদের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে সেই যে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠের বাইরে বেরিয়ে গেলেন, তারপর থেকে তার আর টিকিটি পর্যন্ত মিললো না গোটা টুর্নামেণ্টে। বুদাইকে খেলানো

হয়েছে তার জায়গায়। যদিও সবাই জানতেন বুদাই পুসকাস নয়, তার জায়গা পূরণ করার মতো প্রতিভা বুদাইয়ের নেই, তবু এটা বোঝা গিয়েছিল বুদাই পরিশ্রমী, তিনি পুসকাস না হয়েও দলকে জয় এনে দেবার জন্য খাটতে পারেন।

সর্বশেষ খবরে যা জানা গেলো তাতে বলা যায়, পুসকাসের মাঠে নামবার কোন সম্ভাবনা নেই। তার পায়ের চোট এখনও সেরে ওঠেনি। কোন কোন পত্রিকায় আবার লেখা হলো, জার্মানরা সংগঠিত হয়েছে। তাদের মধ্যে আগের পরাজয়ের কোন গ্লানি নেই। বরং শেপহারবারজার বলেছেন, তার দলের ছেলেরা স্ট্যামিনা এবং শারীরিক দক্ষতায় অনেকখানি চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। হাঙ্গেরীয়ানদের তারা কোনরকম মুভমেন্ট তৈরী করতে দেবেন না।

কথাটা একেবারে অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেওয়া গেল না। বরং অনেকে জার্মানদের স্ট্যামিনার প্রশংসা করে বললেন, অস্ট্রিয়াকে তারা যেভাবে হারিয়েছে তাতে একেবারে তাদের বেমানান ভাবা ঠিক হবে না। পুসকাসকে না খেলালে হাঙ্গেরী বিপদে পড়বে।

কিন্তু পুসকাস খেলবেন কি করে তিনি তো অসুস্থ! ফাইনালের চব্বিশ ঘণ্টা আগেও ম্যাচের ফলাফল অপেক্ষা পুসকাসের মাঠে নামা নিয়ে বাজির দড় চড়া হলো!

শেপহারবারজার সাংবাদিকদের বললেন, 'ফাইনালে আমাদের গোলের মালা পরানো হাঙ্গেরীর পক্ষে সম্ভব হবে না। আমরা পাল্টা আঘাত হানবো। হয়তো ফলাফল উল্টো হতে পারে।' হাঙ্গেরী কিন্তু আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ। গুস্তাভ সেবেস পরিষ্কার বললেন, 'সোনার পরী' তো আমরা মানসিকভাবে জয় করে বসে আছি। এখন অপেক্ষা করছি কতক্ষণে তা হাতে পাব।'

সকাল থেকে হাজার হাজার মানুষ এসে ভিড় করলো বারন-এ। দুদিন আগে জুরিখে তৃতীয় স্থান দখল নিয়ে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। এই মহাসমরে জয় পেয়েছে অস্ট্রিয়া। উরুগুয়ে ৩-১ গোলে হেরে গেছে।

রেফারি মাঠে নামলেন। পিছনে জার্মান খেলোয়াড়েরা। চ্যাম্পিয়ান হাঙ্গেরী নামলো কয়েক মিনিট ব্যবধানে। একে একে সবাই নামলেন। সবশেষে যাকে দেখা গেল, তাকে দেখে গোটা মাঠ প্রথমে বিস্মিত হলেও সবাই উল্লাসে ফেটে পড়লেন। দেখা গেল প্যাণ্টে জার্সি গুঁজতে গুঁজতে সবার শেষে মাঠে নামছেন পুসকাস।

এই ম্যাচে পুসকাস মাঠে নেমে কি ভুল করেছিলেন? প্রশ্নটা জটিল। বিশ্বকাপ নিয়ে যে কটি প্রশ্ন আজও প্রত্যেকের মনে ঘুরে বেড়ায় তার মধ্যে পুসকাসের মাঠে নামার প্রশ্নটি হলো একটি। দ্বিতীয় প্রশ্ন, শেষ মুহূর্তে পুসকাসের দেওয়া গোলটি কি সত্যি অফসাইড ছিল?

জানি না। এর উত্তর বিশ্বের তাবৎ সাংবাদিকেরাও দিতে পারেন নি। তবে অনেকের ধারণায় এমন একটা গোল বাতিল করা কেন যে হয়েছিল জানা নেই—তবে অফসাইডে পুসকাস ছিলেন না। এটা অবশ্য পুসকাসের নিজেরও ধারণা।

থাক এই প্রসঙ্গ—মাঠের কথায় আসি।

আকাশ জুড়ে কালো মেঘ। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির সঙ্গে বাতাসও বইতে লাগলো এলোমেলো।

মাত্র ছ'মিনিটেই হাঙ্গেরী এগিয়ে গেল দুই গোলে। গোটা হাঙ্গেরী দল যেন লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে। বুদাইয়ের জায়গায় পুসকাস খেলায় আক্রমণ যেন আরও জোরদার হয়েছে। তবে এই আক্রমণের মূলে ছিলেন হিদিকুটি। পুসকাস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলছেন। তিনি যে এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নন তা বোঝা গেল যখন কোজিসের থ্রু পুসকাসের নাগাল টপকে গেল। স্টপারে লাইব্রিশ পুসকাসকে আগলে রেখেছেন। গত পুল লীগে তার সঙ্গে ট্যাকলের সময় তিনি আহত হয়েছিলেন।

দু'গোলে পিছনো জার্মান খেলোয়াড়েরা যেন গুটিয়ে গেল। তারা কিছুতেই তাল পাচ্ছিল না। হাঙ্গেরীর চাপের সামনে জার্মানরা পিছু হটে গেছে।

হঠাৎ একটা অঘটন ঘটালেন শেফার। চকিত আক্রমণ শানালেন। তিনি ক্রশপাশ দিলেন রানকে। রান হয়ে বল এলো আবার শেফারের কাছে। সামনে বাধা দিতে এগিয়ে এলেন বোজসিক। তিনি যে ভুল করবেন বোঝা যায়নি। রানকে আলগা রেখেই জায়গা ছাড়লেন। শেফার বল দিলেন অরক্ষিত রানকে। রান নিজে শট না করে ব্যাক পাস করলেন উঠে আসা মারলককে। মারলক চকিত শটে গোলে বল ঠেলে দিলেন। তিন মিনিটের মধ্যে আবার গোল। এবার গোল দিলেন রান।

খেলা অমীমাংসিত।

পুসকাস খোঁড়াচ্ছেন। খাটছেন বোজসিক, হিদিকুটি, টথ, কোজিস। পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন মিনিটের মধ্যে হিদিকুটির শট বারে লাগলো। কোজিসের হেড বাঁচালেন তুরেক। এরপর পুসকাসের শট তুরেক কোনরকমে হাতে লাগলেন। টথের ভলি গোল লাইন থেকে ফিরিয়ে দিলেন কোহলমেয়ের।

ঝড়ের গতিতে তখন খেলা চলেছে। চোখের পলকে বল ছুটে যাচ্ছে এক গোল থেকে অন্য গোলে। হঠাৎ বোজসিকের পিছন থেকে বল ছোঁ মেরে তুলে নিলেন শেফার। তারপরই বল বাড়ালেন ক্রশপাসে গোলের কাছে। সামনে তিনজন খেলোয়াড়। মস্ত জটলা। মনে হয় ওয়াল্টারের মাথায় লাগার পর বলটা ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল মরলকের কাছে। তিনি রানকে বল ঠেলে দিতেই—গোল।

অভাবনীয় গোল।

জার্মান এগিয়ে গেল ৩-২ গোলে। গোল খেয়ে আহত সিংহের মতো ফুঁসে উঠলো হাঙ্গেরী। নতুন চালে তারা শুরু করল আক্রমণ। জার্মান খেলোয়াড়েরা নিজেদের সীমানার মধ্যে নেমে এলেন। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যাচ্ছে। আর মাত্র কয়েক মিনিট।

ডান দিক থেকে টথ বল ধরে এগিয়ে গেলেন। সামনে পসিপল।

তাকে অতিক্রম করলেন টথ। তারপরই বল বাড়ালেন পুসকাসকে লক্ষ্য করে। অভাবনীয় পুসকাস। বল ধরেই চোখের পলকে নিলেন তুরন্ত শট। বল বাতাসে বাঁক নিয়ে জড়িয়ে গেল জালে।

দর্শকেরা লাফিয়ে উঠলেন।

হিদিকুটি ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন পুসকাসকে। ঠিক সেই মুহূর্তে গগনভেদী বাঁশির শব্দ চমকে দিলো সবাইকে। দেখা গেল ওয়েলেসের লাইন্সম্যান মাথার ওপর পতাকা উঁচু করে ধরেছেন। মারভিনের কাণ্ড দেখে সবাই অবাক! কি ব্যাপার!

লাইন্সম্যানের নির্দেশে অফসাইড—গোল বাতিল।

পুসকাসের এই গোল নিয়ে বিতর্কের এখনও কোন উপযুক্ত সিদ্ধান্ত কেউ দিতে পারেন নি।

পুসকাস কি সত্যি অফসাইডে ছিলেন?

পুসকাস নিজে বলেছেন, 'আমি পৃথিবীর ফুটবলে যে কটি নিখুঁত গোল করেছি এই গোলটি হলো তারই অন্যতম।'

ওই এক অফসাইডের সিদ্ধান্ত বদলে দিলো বিশ্বকাপের চিত্র।

এরপর খেলা হয়েছিল মাত্র মিনিট দেড়েক।

হাঙ্গেরী দলের মনোবল ভেঙে গেল। আশাহত হলো তারা এই নিয়ে দ্বিতীয়বার।

যে হাঙ্গেরী বিশ্বকাপ জয় সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল, সেই তাদের হারিয়ে বিশ্বফুটবলে এক বিস্ময়ের সেরা নজির গড়লো পশ্চিম জার্মানী। তারা প্রমাণ করলো ফুটবলের সত্যিকার স্ট্যামিনা বলতে কি বোঝায়।

সুইডেনে পেলের আবির্ভাব ঃ

১৯৫৮।

সুইডেনে অনুষ্ঠিত হলো ষষ্ঠ বিশ্বকাপ আসর। এই আসর গতবারের তুলনায় উত্তেজনায় ছিল পরিপূর্ণ। মোট ষাটটি দেশকে নিয়ে শুরু হয়েছিল বিশ্বকাপ পর্যায়ের খেলা। চূড়ান্ত পর্যায়ে এলো মাত্র চোদ্দটি দেশের সঙ্গে গতবারের বিজয়ী পশ্চিম জর্মানী সহ আয়োজনকারী দেশ সুইডেন। অর্থাৎ ষোলোটি দেশ নিয়ে গড়ে তোলা হলো চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রাথমিক লীগ আসর। এই আসরে প্রথমে লীগ ভিত্তিক ও পরে নক-আউট পদ্ধতিতে খেলায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এবারের আসরে নতুন দেশ হিসাবে দেখা গেল রাশিয়া, ওয়েলস্ এবং আয়ারল্যাণ্ডকে। অন্য তেরোটি পরিচিত দেশ হলো সুইডেন, হাঙ্গেরী, পশ্চিম জার্মানী, চেকোশ্লাভিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, প্যারাগুয়ে, মেকসিকো, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, স্কটল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ড।

ষোলটি দেশকে ভাগ করা হলো চারটি করে দলে নিয়ে চারটি পুলে। প্রথম স্থান হিসাবে বিবেচিত হলো স্টকহোম। এছাড়া মালমো, হামস্টাড, হেলসিংবার্গ, নরকোপিং, ভ্যাসটেরাস, ওরেব্রো, এসকিলস্টানা, ম্যাণ্ডিকেন বোরাস এবং ঠিক হলো গথেনবার্গেও বেশ কিছু ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

প্রাথমিক লীগ শুরু হতেই বেশ কিছু অঘটন ঘটে গেল। বিশ্বকাপের সম্ভাবনাময় আসর থেকে অবিশ্বাস্যভাবে ছিটকে গেল আর্জেন্টিনা। এর আগে মূল প্রতিযোগিতা থেকে সরে গেছে উরুগুয়ে ও ইতালী। প্যারাগুয়ের হাতে বিস্ময়কর ভাবে শোচনীয় ব্যর্থতায় বিধ্বস্ত হয়েছে উরুগুয়ে। প্যারাগুয়ে ৫-০ গোলে হারিয়ে দর্পচূর্ণ করেছে বিগত বিশ্বকাপ জয়ী উরুগুয়ের আভিজাত্যকে। অন্যদিকে আয়ারল্যাণ্ডের কাছে ২-১ গোলে হার স্বীকারে বাধ্য হয়েছে

ইতালি। যে ষোলটি দেশ নিয়ে ষষ্ঠ বিশ্বকাপের মূল পর্যায়ের খেলা শুরু হয় তার মধ্যে ব্রাজিল সম্পর্কে সকলের ছিল বিশেষ ধারণা। গতবারের দল থেকে অনেকেই বাদ পড়লেন, একমাত্র দেখা গেল নিলটন, স্যান্টোসসহ ভাভাকে। নতুন প্রতিভাবান যারা সুইডেনে আত্মপ্রকাশ করলেন তাদের মধ্যে ছিলেন ব্রাজিলের একটি সতেজ সতেরো বছরের তেজী যুবক—নাম পেলে। শুধু পেলে একা নয় এই আসরে প্রায় একই সঙ্গে দেখা গেল গ্যারিঞ্চাকে। নতুন দল নিয়ে গড়া ব্রাজিলের সম্ভাবনা সম্পর্কে কোচ ফিওলার আত্মবিশ্বাস ছিল কঠিন।

৮ই জুন তারিখে ষষ্ঠ বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বের উদ্বোধনী ম্যাচের খেলা শুরু হলো। এই ম্যাচে সুইডেন নিজের দেশের মাঠে অনুকূল পরিবেশে বিপুল জনসমর্থনে মেকসিকোকে হারালো ৩-০ গোলে।

ওই পুলে পরের খেলায় নবাগত ওয়েলস্ বিস্ময় সৃষ্টি করলো। গতবারের সেরা দল বা পঞ্চাশের শ্রেষ্ঠ চ্যাম্পিয়ান দল হাঙ্গেরীকে তারা রুখে দিল ১-১ গোলে। প্রথম গোল দিয়েও হাঙ্গেরী জয় ধরে রাখতে পারলো না। অথচ এই ম্যাচ সম্পর্কে সমস্ত সমর্থকদের ধারণা ছিল, হাঙ্গেরীর পক্ষে এই ম্যাচে জয় পাওয়া খুবই সহজ হবে, কার্যত তা হলো না। বরং বিশ্বকাপের বিস্ময় হিসাবে হাঙ্গেরীকে আবার থমকে দাঁড়াতে হলো, যেমন তারা গতবারের ফাইনালে নিশ্চিত জয় গবেষণাকে ভুল প্রমাণ করে হারতে বাধ্য হয়েছিল পশ্চিম জার্মানীর হাতে।

গতবারের তুলনায় এবারের আসরে হাঙ্গেরী খুব একটা শক্তিশালী ছিল না। এবার দলে দেখা গেল না পুসকাস, কোজিস, এবং জীবরকে। রাজনৈতিক কারণে শেষ মুহূর্তে তারা দলের সঙ্গে আসতে পারলেন না। তবে গতবারের দলে যারা ছিলেন, তাদের মধ্যে ষষ্ঠ বিশ্বকাপ আসরে খেলতে এলেন বোজসিক, বুদাই হিদিকুটি, গ্রসিকস। তবে এদের মধ্যে বুদাই ও বোজসিক ভাল ফর্মে ছিলেন

না। হিদিকুটির মধ্যেও দেখা গেল না আগের সেই গতি।

প্রথম ম্যাচে হেরে যাওয়ায় হাঙ্গেরীয়ানরা মানসিক দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তারা এই স্নায়ুবিক দুর্বলতা কাটাতে না পারার জন্য তাদের হার স্বীকার করতে হলো ২-১ গোলে সুইডেনের বিরুদ্ধে। লীগে তারা একটি মাত্র খেলায় জয় পেল মেকসিকোর বিরুদ্ধে। বলাবাহুল্য 'গ-বিভাগ' থেকে চ্যাম্পিয়ান হলো সুইডেন। তারা তিনটি খেলায় পাঁচ পয়েন্ট লাভ করে হলো প্রথম এবং দ্বিতীয় হলো হাঙ্গেরী।

একনম্বর পুলে জার্মানীর শুরু খুব ভালই হলো। প্রথম ম্যাচে তারা হারালো আর্জেন্টিনাকে। এই ম্যাচে জার্মান চাতুর্যের সামনে আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়েরা দাঁড়াতে পারলেন না। ম্যাচ হারলো ৩-১ গোলে। গোল দিলেন গত বিশ্বকাপের সাড়া জাগানো তারকা হেলমাথ রান। গতবারের বিশ্বকাপে জার্মানীর পক্ষে যারা লড়েছিলেন তাদের মধ্যে এই রান হলেন অন্যতম। ফাইনালে তার দেওয়া গোলেই হাঙ্গেরী বিধ্বস্ত হয়েছিল, এবারও রান তার পায়ের চাতুর্যে মুগ্ধ করলেন সকলকে। শুধু রান একা ছিলেন না, সঙ্গে ছিলেন একেল, ওয়ানটার, শেফার—এবং ষষ্ঠ আসরে এদের পাশে যুক্ত হলেন তরুণ ফরোয়ার্ড উয়ে জিলার।

এই পুলের অন্য খেলায় আবার বিস্ময় আনলো নরদার্ন আয়ারল্যাণ্ড। :তারা অপ্রত্যাশিত ভাবে জয় পেলো চেকদলের বিরুদ্ধে। আয়ারল্যাণ্ডের পক্ষে একটি মাত্র গোল দিলো কুশ। পরের ম্যাচে আবার চেকদল রুখে দিলো জার্মানীকে। কঠিন লড়াই করার পর ম্যাচ শেষ হলো ২-২ গোলে। এই ম্যাচে চেকেরা যে ভাবে খেলছিল তাতে বলা যায় জার্মানরা কেবল মাত্র সৌভাগ্য ক্রমে ম্যাচ বেঁচে যায়। কোনক্রমে দুটি গোল শোধ করলেন অভিজ্ঞ রান।

জার্মানরা চেকদলের বিরুদ্ধে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করায় ক-বিভাগের পুলের উত্তেজনা বেড়ে গেল। বিশেষ করে উত্তেজনা

বাড়ালো আর্জেন্টিনার কাছ আয়ারল্যাণ্ডের পরাজয়ে। এই ম্যাচ জয়ের ফলে আর্জেন্টিনার মনোবল বেড়ে গেল। কিন্তু পরের ম্যাচে চেকদের হাতে ৬-১ গোলে আর্জেন্টিনা বিধ্বস্ত হওয়ায়, আর্জেন্টিনার স্বপ্ন একবারে ধুয়ে মুছে গেল।

জার্মানরা প্রথম ম্যাচের মতো দ্বিতীয় ম্যাচেও জয় পেলো না। তাদের বিরুদ্ধে নর্দান আয়ারল্যাণ্ড দারুণ লড়াই করে ম্যাচ শেষ করলো ২-২ গোলে।

'ক' বিভাগের পুলে তিনটি ম্যাচ জার্মান পাঁচ পয়েণ্ট পেয়ে হলো চাম্পিয়ান। দ্বিতীয় হলো একই পয়েণ্ট পেয়ে আয়ারল্যাণ্ড ও চেকোশ্লাভিয়া। ফলে আয়ারল্যাণ্ড ও চেক দলকে খেলতে হলো প্লে-অফ ম্যাচ। এই ম্যাচে চেকদের ২-১ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলো আয়ারল্যাণ্ড।

'খ' বিভাগের পুলের প্রথম খেলায় ফ্রান্স হারালো প্যারাগুয়েকে ৭-৩ গোলে। তিনটি গোল দিলেন ফনটাইন। ষষ্ঠ বিশ্বকাপে ফনটাইন সকলের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলেন।

এই পুলে অপ্রত্যাশিতভাবে প্যারাগুয়ের কাছে হার হলো যুগোশ্লাভ দলের। ফ্রান্স প্রথম ম্যাচে বড়সড় ব্যবধানে জয় পেলেও দ্বিতীয় খেলায় হেরে বসলো ৩-২ গোলে যুগোশ্লাভের সঙ্গে। ফনটানই ছিলেন এই ম্যাচ আক্রমণের একমাত্র নায়ক। তার শট থেকেই দুটি গোল এলো। শেষ খেলায় ফ্রান্স ২-১ গোলে জয় পেল স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। ফলে 'খ' বিভাগে ফ্রান্স উঠলো কোয়ার্টার ফাইনালে। যুগোশ্লাভ ও প্যারাগুয়ের সঙ্গে খেলা ৩-৩ গোলে শেষ হওয়ার সুবাদে যুগোশ্লাভ উঠলো কোয়ার্টার ফাইনালে।

উত্তেজনায় পরিপূর্ণ ছিল 'ঘ' বিভাগের খেলা। এই বিভাগে নবাগত সোভিয়েত দল ২-২ গোলে ম্যাচ রুখে দিল ইংল্যাণ্ডকে। ব্রাজিল অতি সহজে ৩-০ গোলে ম্যাচ জিতলো অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে। এই পুলের সেরা খেলা হলো ইংল্যাণ্ড বনাম ব্রাজিলের। এই ম্যাচে

ছুটি দলই আপ্রাণ লড়াই করলো। ডিডি, ভাভা, ম্যাজোলা অসাধারণ খেললেন। ইংল্যাণ্ডের রক্ষণভাগ চমৎকার খেলায় ব্রাজিল ফরোয়ার্ডেরা কেউই গোল দিতে পারলেন না। ফলে গোল শূন্যভাবে খেলা শেষ হলো। রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাতজন খেলোয়াড় পরিবর্তন করেও শোচনীয়ভাবে হারতে হলো অস্ট্রিয়াকে। রাশিয়ার পক্ষে ছুটি গোল দিলেন ইলিন ও ইভানভ।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্রাজিল তার দলের কিছু পরিবর্তন করলো। কোচ ফিওলা শেষ মুহূর্তে ছুইজন নতুন ফুটবলারকে দলে আনলেন। একজন পেলে অন্যজন গ্যারিঞ্চা। ছুই তারকার শুভ পদক্ষেপ ঘটলো বিশ্বফুটবলে। এই ম্যাচে পেলে বা গ্যারিঞ্চা গোল না পেলেও দৃষ্টি কেড়ে নিলেন সকলের। রাশিয়ার বিরুদ্ধে ছুটি গোল দিলেন ভাভা। শেষ খেলায় তীব্র উত্তেজনার মধ্যে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রিয়ার খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হলো। ফলে 'ঘ' বিভাগে থেকে ব্রাজিল কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেও, বাছাই খেলায় অবতীর্ণ হলো রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ড। এই ম্যাচে রাশিয়া ছুর্ধর্ষ ফুটবল খেলে ১-০ গোলে হারালো ইংল্যাণ্ডকে। গোল দিলেন ইলিন।

প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের খেলা শেষ হলো। ফলাফল বিচারে দেখা গেল ঃ

ক বিভাগ ঃ জার্মানী —৩—১—২—০— ৭—৫—৪
চেকোশ্লাভিয়া —৩—১—১—১— ৮—৪—৩
খ বিভাগ ঃ ফ্রান্স —৩—২—০—১—১১—৭—৪
যুগোশ্লাভ —৩—১—২—০— ৭—৬—৪
গ বিভাগ ঃ সুইডেন —৩—২—১—০— ৫—১—৫
হাঙ্গেরী —৩—১—১—১— ৬—৩—৩
ওয়েলস্ —৩—০—৩—০— ২—২—৩

(প্লে-অফ ম্যাচে হাঙ্গেরী ওয়েলস্‌কে ২-১ গোলে হারিয়ে দেয়।)

ঘ বিভাগ ঃ ব্রাজিল —৩—২—১—০—৫—০—৫
ইংল্যাণ্ড—৩—২—৩—১—৪—৪—৫
রাশিয়া —২—১—১—১—৪—৪—৩

(প্লেঅফ ম্যাচে রাশিয়া ১-০ গোলে ইংল্যাণ্ডকে হারিয়ে দেয়।)

প্রাথমিক লীগের উপরোক্ত ফলাফল থেকে মোট আটটি দেশ উঠে এলো কোয়ার্টার ফাইনালে। এই আটটি দেশ যথাক্রমে ; ওয়েলস্, ব্রাজিল, সুইডেন, রাশিয়া, পশ্চিম-জার্মানী, যুগোশ্লাভ, আয়ারল্যাণ্ড ও ফ্রান্স।

কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্সের মুখোমুখি হলো আয়ারল্যাণ্ড। এই ম্যাচে আয়ারল্যাণ্ড প্রাথমিক লীগের মতো সংগ্রামী মেজাজ বজায় রাখতে পারলো না। ফ্রান্সের ফরোয়ার্ডেরা তাদের শোচনীয়ভাবে বিধ্বস্ত করলো। এই ম্যাচে আয়ারল্যাণ্ড হারলো ৪-০ গোলে। চারটি গোলের মধ্যে দুটি গোল দিলেন জনপ্রিয় ফরাসী তারকা ফনটেন।

ওয়েলসের সঙ্গে ব্রাজিলকে গায়ের ঘাম ঝরাতে হলো। পাক্কা সাতষট্টি মিনিট পার করেও ব্রাজিল কোন গোল পেল না। শেষে পেলে মাঠে নামার পর প্রথম গোল পেলো ব্রাজিল। পেলের দেওয়া এই দর্শনীয় গোলে ব্রাজিল উঠলো সেমিফাইনালে।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে সুইডেনকে বেশ কষ্ট করে জিততে হলো। স্বদেশের সমর্থন নিয়েও গোলের জন্য সুইডেন মাথা খুঁড়লো ভয়ানকভাবে। ইয়াসিন অসাধারণ। তাকে ভেদ করতে কালঘাম ছুটে গেল সুইডেনের। রাশিয়া ২-০ গোলে ম্যাচ হারলো।

উপভোগ্য লড়াই হলো জার্মান বনাম যুগোশ্লাভের খেলাটি। উভয় দলই গোলের জন্য কঠিন লড়াই করেছিল। শেষ মুহূর্তে রানের দেওয়া গোলে যুগোশ্লাভ ম্যাচ হারলো ১-০ গোলে।

সুইডেন ফাইনালে উঠলো ঃ

গেটেবার্গে খেলা পড়লো সুইডেনের সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীর। নিজেদের পরিচিত মাঠ ও পরিবেশে সুইডেনের ছেলেরা দারুণ ফুটবল খেললেন, সঙ্গে মাঠ ভর্তি নিজস্ব সমর্থক। এই ম্যাচে সুইডিশ সমর্থকেরা জাতীয়তাবাদের চরম পরিচয় দিলেন। মাঠে যারা খেলা দেখতে এলেন, তাদের শতকরা নব্বুই জনের হাতে সুইডিশ জাতীয় পতাকা। মুখে-মুখে জাতীয় সংগীত। উগ্র জাতীয়তাবাদের সামনে পশ্চিম জার্মানীর খেলোয়াড়েরা কোন থই পেলেন না। গ্যালারীতে জার্মান সমর্থকদের জায়গা দিতে অস্বীকার করায় জার্মান কর্তৃপক্ষ প্রতিবাদ করলেন। জার্মান ফুটবল এসোশিয়েসনের সভাপতি ডাঃ পেকস জাওয়েন্‌স পরিষ্কার বললেন, সুইডিশ কর্তারা যদি এইরকম বৈষম্যমূলক আচরণ করেন তাহলে জার্মান কর্তৃপক্ষ মাঠ থেকে খেলোয়াড়দের তুলে নিতে বাধ্য হবেন। বেশ কিছুক্ষণ দুই দেশের কর্তা-ব্যক্তিদের মধ্যে উষ্ণ গলায় কথা কাটাকাটি হলো। শেষ পর্যন্ত ফুটবলের কল্যাণে সুইডিশ কর্তারা হার মানতে বাধ্য হলেন।

খেলা আরম্ভ হতেই আর এক বিপত্তি। উভয় দলই মেজাজ হারিয়ে চড়া ধাতে খেলা শুরু করলো। ঘনঘন বাঁশি বাজাতে লাগলেন রেফারি। এই ম্যাচে সুইডিশ রক্ষণভাগ বিশেষ নজর রাখলেন রান, ওয়াল্টার ও জিলারের ওপর।

খেলার আগে বৃষ্টি হওয়ায় মাঠ বেশ পিচ্ছিল হয়েছিল, ফলে খেলার গতি ব্যাহত হচ্ছিল খেলোয়াড়েরা মাটিতে আছড়ে পড়ে যাওয়ার জন্য।

সুইডেন প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেওয়ায় জার্মানরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। আসলে তারা অতিমাত্রায় রক্ষণাত্মক নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তাদের এই স্ট্র্যাটিজি যে ঠিক নয়—তা

বুঝতে পেরেই তারা খেলাকে আক্রমণের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করলেন। আক্রমণের ভূমিকায় জিলার জার্মানদের প্রেরণা যোগাতে লাগলেন। তিনি নিখুঁত পায়ের কাজে বল নিয়ে ঘনঘন প্রান্ত বদল করে খেলতে লাগলেন। রানকে এই ম্যাচে সুইডিশরা সক্রিয় হতে দিলেন না। তবু এই অবস্থার মধ্যে প্রথম গোল পেয়ে গেল জার্মানরা। জিলার মাঝ মাঠ থেকে বল ধরে উপরে উঠে এলেন, তারপর করলেন নিখুঁত সেণ্টার। হান্স ওই সেণ্টার মাথায় নেওয়ার বদলে বুক দিয়ে ধরে পঁচিশ গজ দূর থেকে জোরালো শটে পরাস্ত করলেন সুইডিশ গোলরক্ষক স্বেনসনকে।

জার্মান দল গোল পাওয়ায় থমকে গেল সুইডিশ সমর্থকেরা। তারা যেন এমনটি আশা করেন নি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাদের প্রত্যাশা মেটালেন স্কোগ্লাণ্ড। লিডহোম ও গ্রেন বল দেওয়া নেওয়া করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এক সময় উঁচু বল লিডহোম দ্রুত হাত দিয়ে নামিয়ে নিলেন। সবাই ভাবলেন হ্যাণ্ডবল; কিন্তু কোন সংকেত দিলেন না রেফারি। বরং তিনি হাতের ইশারায় খেলা চালাতে বললেন। লিডহোম এবার বল ঠেললেন স্কোগ্লাণ্ডকে। কোণাকুণি শটে পরাস্ত করলেন হারকেনরাথকে। বলটা হারকেনরাথের ধরা উচিত ছিল কিনা জানি না, তবে তার খেলা দেখে এবং সারাক্ষণ বল ধরার নমুনা দেখে মনে হচ্ছিল প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে গোলকিপিং করার মতো উপযুক্ত তিনি হয়ে উঠেন নি।

দ্বিতীয়ার্ধে হারকেনরাথের ব্যর্থতা আরও কয়েককবার প্রমাণ মিললো। সেই সঙ্গে ভীষণ বেমানান খেলছিলেন স্টোলেনবার্গ জিমানিয়াক। সুইডেন তখন গোলের জন্য মরিয়া। বহুক্ষণ এক নাগাড়ে খেলা চললো জার্মান সীমানার মধ্যে। রান, শেফার কাউকেই মাঠে আছেন বলে মনে হচ্ছিল না। খেলা প্রায় শেষ হয়ে আসছে—আর মাত্র ষোলো মিনিট বাকি। ওয়াল্টারকে বুকের ওপর পা তুলে মারাত্মক ফাউল করলেন পারলিং। ফলে রেফারি

পারলিংকে মাঠের বাইরে বার করে দিলেন। ওয়াল্টারকেও মাঠের বাইরে শুশ্রূষার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো। খানিক আগে হ্যামরিনের লাথি খেয়ে অজ্ঞান অবস্থায় মাঠ ত্যাগ করেছেন জাসকোয়াইক।

খেলা শেষ হতে আর মাত্র আট মিনিট বাকি—এই অবস্থায় দর্শনীয় গোল দিলেন গ্রেন। হ্যামরিনের শট হারকেনরাথ ঠিকমতো ধরতে না পারায় তার হাত থেকে বল বেরিয়ে এলো। ওই অবস্থায় শূন্যের বল বাঁ পায়ে নিয়ে জোরালো শটে গোল দিলেন গ্রেন। এই গোলে সুইডেন এগিয়ে গেল ২-১ গোলে।

এরপর দু'মিনিট সময়ও পার হলো না। হ্যামরিনের একক প্রচেষ্টায় সুইডেন ম্যাচ শেষ করলো ৩-১ গোলে। হ্যামরিন প্রথমে টাচ লাইন ধরে ছুটে গেলেন। তারপর ভিতরে ঢুকে জনা চারেক ডিফেনডারকে কাটিয়ে হারকেনরাথকে অতি সহজে পরাস্ত করলেন। সুইডেন উঠলো ফাইনালে।

স্টকহোমে ফ্রান্স বিধ্বস্ত ঃ

স্টকহোমে ব্রাজিল ঝড়ের মতো ফুটবল খেলে পদানত করলো ইউরোপের অন্যতম সেরা শক্তি ফ্রান্সকে। ফ্রান্স সে বছর দারুণ খেলছে। পুল লীগে তাদের খেলা দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিল সকলের। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে সেই ফ্রান্স চাতুর্য বজায় রাখতে পারলো না। শুরুর দু'মিনিটের মাথায় দর্শনীয় গোল দিলেন ভাভা। মাঝ মাঠে মুক্ত ঝরালেন পেলে। ক্রীড়াশৈলীর শ্রেষ্ঠ নজির তৈরী হলো পেলে—গ্যারিঞ্চার দ্বৈত প্রয়াসে। প্রথম গোল দিয়েও ব্রাজিল ব্যবধান ধরে রাখতে পারলো না। ন'মিনিটের মাথায় ফনটাইন গোল শোধ করলেন। সুযোগ সন্ধানী ফনটাইন সে বছর বিশ্বকাপ আসরে শ্রেষ্ঠ তারকা হিসাবে চিহ্নিত। যেমন তার বলের ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা

তেমনি গোল করার অভাবনীয় দক্ষতা। কোপা ও পিয়ানটনি ফনটাইনকে গোল যোগাবার চেষ্টা করলেন। বিশেষ করে কোপার ড্রিবল তছনছ করে দিচ্ছিল ব্রাজিলের রক্ষণভাগ। তিরিশ মিনিটের সময় ফ্রান্সের সেণ্টার হাফ-জঁকোয়েট কঠিন স্ট্যাকলিং করতে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত হলেন। তাকে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাজিল খেলার ধারা বদলে নিলো। উনচল্লিশ মিনিটে ডিডি, ভাভা, পেলে ও গ্যারিঞ্চার সমবেত চেষ্টায় গোল হলো। পেলের ব্যাকপাস এলো গ্যারিঞ্চার কাছে। গ্যারিঞ্চা থেকে ডিডি—তার দুরন্ত শটে ২-১ গোলে এগিয়ে গেল ব্রাজিল। এরপর পেলে ও গ্যারিঞ্চা অসাধারণ খেললেন। চার জন ফ্রান্স খেলোয়াড়কে ফাঁকি দিয়ে পেলে ৬৪ মিনিটে তৃতীয় গোল করলেন। এরপর দশ মিনিট সময়ও পার হলো না। কালোমানিক পেলে আরও দুটি গোল দিয়ে বিশ্বকাপ আসরে হ্যাটট্রিক করলেন। শেষ মুহূর্তে ফ্রান্স একটি গোল শোধ করলো। গোল দিলেন পিয়ানটনি। উত্তেজনাহীনভাবে ম্যাচ শেষ হলো ৫-২ গোলে। এই জয়ের সুবাদে ব্রাজিল ফাইনালে মিলিত হলো সুইডেনের সংগে।

পেলের চোখ ধাঁধানো গোল ঃ

স্টকহোমে অনুষ্ঠিত হলো বিশ্বকাপের ফাইনাল আসর। ২৯শে জুন দুই পক্ষ সুসজ্জিত হয়ে মাঠে নামলো। এই ম্যাচ দেখতে উপস্থিত ছিলেন প্রায় পঞ্চাশ হাজার দর্শক। কর্তৃপক্ষ এই ম্যাচের দিন কঠিন নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিলেন। স্টেডিয়ামের দুই মাইল দূর থেকে মিলিটারী পাহারা রাখা হলো। প্রতিটি প্রবেশ পথে পরীক্ষা করা হলো দর্শকদের।

ফাইনালের দিন সকাল থেকেই বৃষ্টি। দুদিন আগে গোটেবার্গে

ফ্রান্স দুর্বল জার্মানদের নিয়ে সারা মাঠে নাচিয়ে ছেড়েছে। ৬-৩ গোলে জিতে বিশ্বকাপ আসরে তৃতীয় স্থান পেয়েছে ফ্রান্স।

স্টকহোমের ফাইনাল সম্পর্কে সুইডিশ সমর্থকদের যথেষ্ট আশা ছিল। তবু ব্রাজিলের শক্তিকে তারা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। গত ম্যাচে ডিডি, ভাভা, পেলে ও গ্যারিঞ্চাকে তারা যেভাবে যোগসূত্র তৈরী করে বল নিয়ে খেলতে দেখেছেন, তাতে তাদের সম্পর্কে কোন রকম ছোট ধারণা করা সম্ভব নয়। তবে এটা ঠিক ব্রাজিল যে সহজে এতবড় সুযোগ হাতছাড়া করবে না, তারা যে লড়াই করবে এই বিষয়ে সন্দেহ ছিল না কারো।

সুইডেনের আক্রমণে ভাগের কথা চিন্তা করেই ফিওলা শেষ মুহূর্তে দলের একটা পরিবর্তন করলেন। রাইট ব্যাকে তরুণ সোরডিকে তুলে নিয়ে তার জায়গায় আনলেন অভিজ্ঞ জালমা স্যাণ্টোসকে। জালমা স্ট্যাণ্টোস দলে আসায় বেশ একটু ফাঁপরে পড়ে গেলেন সুইডেনের গ্রেন ও লিডহোম। তারা মাঝ মাঠে খেললেও দুই উইং হ্যামরিন ও স্কোগ্লাণ্ডকে স্ট্যাচুর মতো দাঁড় করিয়ে রাখলেন দুই স্যাণ্টোস।

প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে খেলা শুরু হলো। শুরুতেই সুইডেন চার মিনিটের মাথায় প্রথম গোল দিয়ে এগিয়ে গেল। গ্রেন-লিডহোম চমৎকার বোঝাপড়ার মধ্যে এগিয়ে গেলেন ব্রাজিল সীমানার মধ্যে। তারপর লিডহোম গ্রেনকে ক্রশপাস দিলে গ্রেন সামনে দাঁড়ানো জিটোকে টপকে আবার বল ঠেলে দিলেন লিডহোমকে। লিডহোম ঠাণ্ডা মাথায় গোলরক্ষক জিলমারকে অতিক্রম করে ফাঁকায় বল ঠেলে দিলেন গোলে।

গোল খেয়ে ব্রাজিল তেতে উঠলো। প্লেসকিকের সঙ্গে সঙ্গে তারা শুরু করার চেষ্টা করলেন পালটা আক্রমণ। দু মিনিট বল নিয়ে দুই পক্ষ টানা-হেঁচড়া করার পর জিটো একটা মুভমেণ্ট গড়তে সাহায্য করলেন গ্যারিঞ্চাকে। গ্যারিঞ্চা পাখির মতো উড়ে গিয়ে একেবারে

সীমানার মধ্যে সেন্টার করলেন। তার বাতাস বাঁকা শট ভাভার কাছে পৌঁছানোমাত্র গোল হলো।

খেলায় সমতা ফিরে এলো। মাঠময় তখন চরম উত্তেজনা। এই অবস্থায় গ্যারিঞ্চার পাস থেকে বল পাওয়া পেলের জোরালো শট বারে লেগে ফিরে গেল। এরপর সুইডেনের একটি অব্যর্থ গোলের সুযোগ নষ্ট করলেন জাগালো। হারমানা জিলমারকে টপকে বল গোলে ঢোকার সময় জাগালো ছুটে গিয়ে হেড করে বল বার করে দিলেন। উত্তেজনা তখন তুঙ্গে। পেলে, গ্যারিঞ্চা, ভাবা যেমন একদিকে ত্রাসের সৃষ্টি করেছেন, অন্য দিকে ব্রাজিলের মনে সংশয় গড়ে তুলেছেন লিডহোম ও গ্রেন।

বত্রিশ মিনিটের মাথায় ব্রাজিল আবার গোল পেল। পেলের হিলকরা বলে দুরন্ত ভলি মেরে ভাভা এগিয়ে দিলেন ব্রাজিলকে।

সুইডেন পিছিয়ে গেলেও তাদের মধ্যে কোনরকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। বোঝা যাচ্ছিল গোল যে কোন সময় শোধ হতে পারে। বিরতির পর ব্রাজিল আবার গোল দিলো। এবার গোল দিলেন পেলে। বিশ্বকাপ আসরে এমন নয়নাভিরাম গোল বড় একটা দেখা যায় নি। স্যান্টোসের লম্বা ফ্রিকিক, পেলে প্রথমে হাঁটু দিয়ে ধরে তুলে ব্যাক হেড নিলেন। তারপর চকিতে ডানপায়ে ভর রেখে শরীর ঘুরিয়ে বাঁ পায়ে নিলেন প্রচণ্ড ভলি। পঁচিশ গজ দূর থেকে সতেরো বছর বয়সের তেজী পেলের শট গোলরক্ষক ধরার কোন সুযোগ পেলেন না। চতুর্থ গোল দিলেন জাগালো। সুইডেন চার চারটি গোল খাওয়ার পর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো। তারা পরিষ্কার বুঝতে পারলো এই ম্যাচে তাদের পক্ষে আর জয় পাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই তারা জয়ের প্রত্যাশা ছেড়ে আত্মরক্ষায় মন দিলেন। গ্যারিঞ্চার পাস থেকে শেষ মুহূর্তে কালোরাজা পেলে আবার দিলেন গোল। পাঁচ এক গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর ব্রাজিলের ছেলেরা আর গা ঘামানোর চেষ্টা করলেন না। শেষ মুহূর্তে সুইডেন আর একটি গোল দিল বটে

তবে গোলটি ছিল পরিষ্কার অফসাইড। তবু ব্রাজিল খেলোয়াড়েরা কোন প্রতিবদাদ করলেন না। ৫-২ গোলে ব্রাজিল শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জিতে ষষ্ঠ আসরে জয় করলো বহু প্রত্যাশিত জুলেরিমে। এই জয়ের মধ্যে ব্রাজিল শুধু নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিলো না, সেই সঙ্গে তারা ইঙ্গিত দিলো আগামী দিনের সম্ভাবনাময় ফুটবলের।

পেলে ও গ্যারিঞ্চা প্রথম আবির্ভাবেই বিশ্ব আসরে চিহ্নিত হলেন শ্রেষ্ঠ তারকা হিসাবে। খুশী ব্রাজিল– খুশী ফিওলা।

বলা বাহুল্য সুইডেনের বিশ্বকাপে মোট গোল হয়েছিল ১২৬টি। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী গোল ছিল ফ্রান্সের ২৩টি, এবং চ্যাম্পিয়ান ব্রাজিলের ১৬টি।

সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসাবে এই আসরে শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেন ফ্রান্সের কনটেন। তিনি সর্বসাকুল্যে গোল দিয়েছিলেন ১৩টি—এই গোল জুলেরিমে আসরের একটি সেরা ব্যক্তিগত গোল রেকর্ড।

সুইডেনের বিশ্বকাপ শেষ হলো।

প্রস্তুতি শুরু হলো পরবর্তী আসরের—এই আসর বসেছিল চিলিতে।

চিলিতে বিশ্বকাপ (১৯৬২) :

১৯৬২ সালে চিলিতে অনুষ্ঠিত হলো সপ্তম বিশ্বকাপ আসর। এই আসর সম্পর্কে যখন স্থান নির্বাচন করা হয় তখন চিলি ভয়াবহ ভূমিকম্পের কবলে পড়ে সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও বিধ্বস্ত। এই অবস্থায় চিলির হাতে বিশ্বকাপের আয়োজনের সুযোগ দেওয়ায় অনেকেই মুখ কালো করলেন। কিন্তু চিলির আন্তরিক আবেদনকে অস্বীকার করার মতো মানসিকতা আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনের ছিল না। চিলির ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কার্লস ডিটবর্ন ধরে বসলেন ফিফা

কর্তৃপক্ষকে। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বললেন, ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত চিলির অর্থনীতি বলতে কিছু নেই। এই অবস্থায় দেশের মনে নতুন করে বাঁচার আগ্রহ জাগিয়ে তোলার জন্য চিলির বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া কোন উপায় নেই। এই দায়িত্ব নেওয়া চিলির প্রয়োজন, কেবলমাত্র আত্মনির্ভরতা ফিরিয়ে আনার জন্য।

চিলির আবেদনকে তাই অস্বীকার করতে না পেরে, তাদের ওপর ফিফা কর্তারা অর্পণ করলেন বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার দায়দায়িত্ব।

আয়তনে বড় হলেও চিলি তখন সম্পূর্ণ নিঃস্ব। চারদিকে চলেছে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ। দেশের অর্থনীতি বলতে কিছু নেই। তবু তার মধ্যে চিলিবাসীরা আন্তরিকতার প্রমাণ দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তারা তৈরী করলেন বিশ্বকাপ উপযোগী শৈল শহর স্যান্টিগোয়ায় অতি আধুনিক পদ্ধতির এক বিশাল স্টেডিয়াম।

বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার আগে পর্যবেক্ষকের দল এলেন চিলিতে। তারা ঘুরে ঘুরে দেখলেন গোটা শহর। পরীক্ষা করলেন সমস্ত ব্যবস্থার খুঁটিনাটি।

ধন্যবাদ চিলিবাসীকে—তারা অল্পদিনের চেষ্টায় গোটা শহরকে যে ভাবে সাজালেন এবং নিরাপত্তার যে ব্যবস্থা করেছিলেন তা ছিল সত্যি প্রশংসনীয়। তবু তার মধ্যে কোন কোন দেশ চিলির আবহাওয়া ও নোংরা বস্তি অঞ্চলের নিন্দা করলেন। বিশেষ করে ইতালির পত্রপত্রিকায় চিলির কুৎসা প্রচার করা হলো। এর ফলে প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার আগেই ইতালির সঙ্গে চিলিবাসীদের শুরু হলো প্রচ্ছন্ন বিরোধ।

চিলির আসরে মূল প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল ষোলটি দেশ। এই ষোলটি দেশকে পূর্ব নিয়মানুসারে চারটি পুলে ভাগ করা হয়। পরে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে শুরু করা হয় নক আউট পদ্ধতির খেলা।

চিলির আসরে উত্তেজনা ছিল খুবই তীব্র। তবু এই আসরে

গোলের সংখ্যা খুব একটা দেখা গেল না। কোন দলই গোল দেওয়ার ব্যাপারে পারলেন না বড়সড় ব্যবধান তৈরী করতে। এত কম গোলের খেলা এর আগে বিশ্বকাপ আসরে দেখা যায় নি।

এই বিশ্বকাপ আসরে চিলি নিজেকে ভীষণভাবে তৈরী করেছিল। তাদের ফুটবলের নয়া ধরন চমক তুলেছিল বিশ্বে। ব্রাজিল প্রায় আগের নিয়মেই কঠিন দল নিয়ে প্রতিযোগিতায় হাজির হলো। এই আসরে ব্রাজিলের গ্যারিঞ্চা ও জাগালো অসাধারণ ফুটবলের পরিচয় দিলেন। পেলের দুর্ভাগ্য তিনি এই আসরের শুরুতেই পেশীতে টান থাকায় খেলতে পারলেন না। তার শূন্যস্থান পূরণ করা হলো আমারিণ্ডোকে দিয়ে। পুরনোদের মধ্যে দেখা গেল দুই স্যাণ্টোস সহ ডিডি, ভাভা ও গোলকিপার হিসাবে জিলমারকে। সুইডেনের আসর অপেক্ষা চিলির আসরে ব্রাজিল ছিল নয়া ফুটবল রীতিতে অনেক বেশী সুসংযত। এই আসরে তারা ফুটবলে প্রবর্তন করলেন ৪-৩-৩ পদ্ধতি। অথচ ভাবতে অবাক লাগে চিলির আসর শুরু হওয়ার আগে ব্রাজিলের নানা কারণে ঐক্যবদ্ধতা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। ব্রাজিল থেকে ৫৮ সালে বিশ্বকাপ জয় করার পর অনেকেই অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। ফলে অনেকের ধারণা ছিল ব্রাজিল হয়ত চিলির আসরে আগের মতো সংঘবদ্ধ হতে পারবে না। যে ভাভা সুইডেনে ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন সেই তিনি ব্রাজিল ছেড়ে চলে যান অ্যাণ্টালোণ্টিকো মাদ্রিদে। ডিডি গেলেন রিয়ালমাদ্রিদে। কিন্তু ওরা কেউ বেশী দিন বিদেশে টিকে থাকতে পারলেন না। ফলে তারা প্রত্যাবর্তন করলেন স্বদেশে। নতুন করে ব্রাজিল প্রস্তুত হলো।

বেঁটে গ্যারিঞ্চা তখন অসাধারণ। ধনুকের মতো একজোড়া বাঁকা পা দিয়ে যে কোন মানুষ ফুটবলে যাদু খেলা দেখাতে পারেন, তা গ্যারিঞ্চাকে না দেখলে বিশ্বাস করা যেতো না। অথচ একদিন তার এই বাঁকা ধনুকের মতো পা জোড়ার দিকে তাকিয়ে ফুটবল কোচ বলেছিলেন, তোমার দ্বারা ফুটবল হবে না।

আহত হলেও হতাশ হন নি গ্যারিঞ্চা। কেবল নিজস্ব মনোবলকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বে তিনি চমক তুললেন। চিলির আসরে গ্যারিঞ্চাকে চেনা গেল নতুন করে। পেলে নেই, অথচ সে অভাব গ্যারিঞ্চা তার দলকে বুঝতেই দিলেন না। ব্রাজিলের সমস্ত আক্রমণের প্রাণ-শক্তি হিসাবে গোটা দলকে তিনি একাই কাঁধে করে বয়ে নিয়ে বেড়ালেন। চিলির আসরে তাই তার খেলা দেখে বিদগ্ধজনেরা বলতে বাধ্য হলেন—চিলির বিশ্বকাপ 'গ্যারিঞ্চার বিশ্বকাপ'।

শুধু গ্যারিঞ্চা একা নয়—এই আসরে ব্রাজিলকে নেতৃত্ব দেওয়ার মূলে ছিলেন আর একটি মানুষ—তিনি হলেন জাগালো। লেফট উইং হিসাবে তিনি যেন নয়া আদর্শের ঝড় তুললেন। যেমন দম তেমনি গতিবেগ। সব মিলিয়ে জাগালোর টেকনিক ছিল যেমন নিখুঁত তেমনি অভিনব। বলকে আয়ত্তে রাখার ক্ষমতা শুধু ছিল না, সেই সঙ্গে ছিল নিখুঁত পজিসন জ্ঞান ও গোলে শট নেওয়ার ক্ষমতা। তবে নিজে গোল দেওয়া অপেক্ষা গোল দেয়ানোর ব্যাপারে জাগালোর ওস্তাদী ছিল ষোল আনা। তার খেলায় বাহ্য চমক বা আতিশয্যের বাড়াবাড়ি ছিল না। তিনি পরিশ্রমের মাধ্যমে বলকে নিজের কাছে রেখে সতীর্থকে ফাঁকায় বল জোগাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তুজাগালোর দুর্ভাগ্য চমক না থাকায় তিনি পেলে বা গ্যারিঞ্চার সমকক্ষ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন নি। ব্রাজিলের ফুটবল চিলির আসরকে সরগরম করে রেখেছিল প্রথম থেকেই। গতবারের সম্মান বজায় রাখতে তারা যে কসুর করবেন না এই বিশ্বাস সকলের মনেই ছিল।

ইংল্যাণ্ডে ভাল খেলোয়াড় দলে এলেও, চিলিতে সুবিধা করতে পারে নি। যেমন মনে দাগ টানতে পারে নি স্পেন বা ইতালি দল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইতালি যেন আত্মবিশ্বাস খুঁজে পাচ্ছিলো না। চিলির আসরে তারা কোন রকম জনসমর্থন পেলো না। ইতালীয় পত্র-পত্রিকায় চিলির নিন্দা প্রকাশ হওয়ায় গোটা দলকে তার ফলভোগ করতে হলো।

চেকোশ্লোভাকিয়া, জার্মানী, হাঙ্গেরী চিলিতে এসেছিল লড়াই করার মেজাজ নিয়ে। গত বিশ্বকাপের তুলনায় চিলির আসরে রাশিয়াকে অনেকখানি সক্রিয় মনে হলো। শেষ মুহূর্তে ইয়াসিন ফর্ম না হারালে হয়ত রাশিয়ার ভাগ্য পরিবর্তন হতে পারতো।

উদ্বোধনী ম্যাচ শুরু হলো চিলি বনাম সুইজারল্যাণ্ডের খেলা দিয়ে। এই ম্যাচে রাজসিক বর্ণাঢ্য পরিবেশে চিলি জয় পেল ৩-১ গোলে। চিলির ফুটবলারেরা অভাবনীয় ক্রীড়াধারার পরিচয় দিলেন। দুটি গোল দিলেন সানচেজ ও একটি বামিরেজ। সুইস দলের হয়ে গোল করলেন বিরতির আগে উটরিচ।

প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে ইতালি বনাম পশ্চিম জার্মানীর খেলা শেষ হলো গোলশূন্য ভাবে। সন্টিগোয়ায় পশ্চিম জার্মানীর ক্লান্তিকর ম্যাচ শেষ হলো সুইজারল্যাণ্ডকে ২-০ গোলে হারিয়ে। এই ম্যাচে কোন সৌন্দর্য ছিল না। ছিল না ফুটবলের তাল বা ছন্দ।

ফুটবলের মাঠ রণাঙ্গনে পরিণত হলো ইতালি বনাম চিলির খেলাকে ঘিরে। চিলির মানুষ ইতালির পত্রপত্রিকার বিরূপ সমালোচনায় যথেষ্ট ক্ষুব্ধ ছিল। তাদের এই মানসিক ক্ষোভের চরম রূপ প্রকাশ পেল খেলার মাঠে। গোটা স্টেডিয়াম জুড়ে চলেছিল ইতালি বিরোধী শ্লোগান। প্রথমত প্রতিকূল পরিবেশ এবং পরিস্থিতি ইতালিয়ানদের যেমন দমিয়ে দিয়েছিল, তেমনি দলীয় বিরোধ নষ্ট করেছিল টিম স্পিরিড। খেলা শুরু হওয়ার আগে থেকেই দুই দলের মধ্যে শুরু হয় হিংসাত্মক কার্যক্রম। বল ছাড়াই পরস্পরের উদ্দেশ্যে লাথি চালাতে, ঘুষোঘুষি করতে দেখা গেল। অবস্থা শেষ পর্যন্ত এমন এক জায়গায় পৌঁছেছিল যে ইংলিশ রেফারি অস্টিনের পক্ষে সম্ভব হলো না মাঠকে নিজের আয়ত্তে রাখা। রেফারির সামনেই লাওনেজ সানচেজ ঘুষি মারলেন ম্যাসিওকে। এরপর ফেরিনি প্রকাশ্যে লাথি মারলেন লাণ্ডাকে। রেফারি বা লাইনস্‌ম্যান সেই

দৃশ্য দেখেও কোন ব্যবস্থা নিলেন না। পরে ডেভিড বিশ্রীভাবে সানচেজের মাথার ওপর পা চালালেন। এই ঘটনাকে রেফারি অস্বীকার করতে পারলেন না। মাঠ থেকে বার করে দিলেন ফেরিনি ও ডেভিডকে। ফলে ইতালিকে ন'জনে খেলতে হলো। সমাপ্তির পনেরো মিনিট আগে উভয় দলই মারধোর ছেড়ে গোল দেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করলেন। সেই সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা উঠেছিল চরমে। প্রথম গোল পেলো চিলি। সানচেজের ফ্রিকিকে রামিরেজ মাথা দিয়ে প্রথম গোল দিলেন। গোল খাওয়া ইতালির পক্ষে তখন আর প্রতিযোগিতায় ফিরে আসা সম্ভব হলো না। তারা শেষ মুহূর্তে রক্ষণাত্মক নীতি নেওয়ায় চিলি টেরো অন্তিমলগ্নে চিলির জয়কে নিশ্চিত করলো। এই ম্যাচ শেষ হতে রেফারি আক্রান্ত হলেন। উভয় দলই মেতে গেলেন খণ্ডযুদ্ধে। ফলে মাঠে পুলিশ ডাকতে বাধ্য হলেন বৃটেনের রেফারি অস্টিন। চিলির বিশ্বকাপে এই ম্যাচটিকে ফুটবলের অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

পরপর দুটো খেলায় জেতার পর চিলিকে হারতে হলো পশ্চিম জার্মানীর কাছে। যে পশ্চিম জার্মানী ইতালির বিরুদ্ধে জয় পায় নি সেই তারাই চিলিকে হারালো ২-০ গোলের ব্যবধানে। গোল দিলেন উয়েজিলার ও জিমানিয়াক।

পরপর দুটো ম্যাচে ব্যর্থতার পর ইতালি প্রথম জয় দেখতে পেল সুইজারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচে ইতালি যেন তাদের পুরনো ঐতিহ্য ফিরে পেল। ৩-০ গোলে ম্যাচ জেতা সত্ত্বেও তারা কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার সুযোগ পেল না। খ-বিভাগ থেকে বা ২নং গ্রুপ থেকে উঠলো পাঁচ পয়েণ্ট পেয়ে পশ্চিম জার্মানী এবং চার পয়েণ্ট পেয়ে চিলি।

এক নম্বর গ্রুপের খেলা পড়লো আরিকায়। এখানে হাজির ছিল উরুগুয়ে, কলম্বিয়া, রাশিয়া এবং চেকোশ্লোভিয়া। এই আসরে বেশ কিছু অঘটন ঘটলো। দক্ষিণ মার্কিন মণ্ডলের সেরা দল উরুগুয়ে

আরিকা গ্রুপে সফল হলো না। প্রথম ম্যাচে তারা কলম্বিয়ার সঙ্গে হারতে হারতেও শেষ পর্যন্ত কোনরকমে ইজ্জত বাঁচালো ২-১ গোলে। চিলিতে উরুগুয়ে মোটেই ভালো দল নিয়ে আসেনি। তাদের খেলার মধ্যে প্রাণ ছিল না। ছিল না বিগত দিনের ছিঁটেফোঁটা জলুস।

রাশিয়া গতবারের তুলনায় চিলিতে অনেক ভাল ফুটবল দেখালো। দলে ছিল সুইডেন বিশ্বকাপে অভিজ্ঞ একাধিক খেলোয়াড়। ইয়াসিন, ভারোনিন, ইভানভ, নেটো মেলকির মতো প্রতিভাবানেরা। যুগো-শ্লোভের বিরুদ্ধে দুরন্ত লড়াই করে রাশিয়া ২-০ গোলে জয় পেল। অসাধারণ গোল কিপিং করলেন ইয়াসিন। তিনি প্রকাশ করলেন, বয়স বাড়লেও জাতীয় দলে তিনি এখনও অপরিহার্য। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচে ইয়াসিন তার অসাধারণত্ব বজায় রাখতে পারলেন না। তিনি রুশ গোলপোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা সত্বেও কলম্বিয়ার মতো একটা অনামী দেশ চার চারটি গোল দিলো অবিশ্বাস্যভাবে। কলম্বিয়ার ইনসাইড ক্লিঞ্জার পায়ের যাদুতে মুগ্ধ করলেন উপস্থিত দর্শকদের। এইদিন সোভিয়েতের রক্ষণভাগ ভয়ানকভাবে ভেঙে পড়েছিল। প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়ে ইয়াসিনের মতো দুর্ভেদ্য গোলরক্ষক বেসামাল হতে বাধ্য হয়েছিলেন। ভাগ্য ভাল থাকায় রাশিয়া ম্যাচ বাঁচালো ৪-৪ গোলে। রুশ দলের হয়ে দুটি গোল দিলেন গত বিশ্বকাপের তারকা ইভানভ ও একটি করে পোনেডেলনিক ও চিসলেঙ্কো। কলম্বিয়ার হয়ে গোল দিলেন ক্লিঞ্জার, রাডা, কল ও একেরস।

পরের ম্যাচে দারুণ লড়াই করার পর রুশ দল জয় পেল উরুগুয়ের বিরুদ্ধে। ৪-২-৪ পদ্ধতিতে নব্বুই মিনিট খেলার পর রুশীরা জয় পেল ২-১ গোলে। গোল দিলেন মামিকিন ও ইভানভ। এই ম্যাচে গলকালভেস গোল না পেলেও মাঝ মাঠে খেলা ধরে রাখলেন অনবদ্য স্কিলের চাতুর্যে, তার ফুটবল বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অরিকায় গুরুত্বপূর্ণ খেলায় যুগোশ্লোভিয়া উরুগুয়েকে ৩-১ গোলে

হারাবার পর মনের জোর ফিরে পায়। কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পথে তারা শেষ খেলায় শোচনীয়ভাবে বিধ্বস্ত করলো কলম্বিয়াকে। এই ম্যাচে সেকুলারাক ছিলেন যুগোশ্লেভের একমাত্র মূলধন। তার সাহায্য পেয়ে কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে তিনটি গোল দিলেন জারকভিক এবং একটি করে গোল এলো গলিক এবং মেলিকের শট থেকে। এক নম্বর গ্রুপে রাশিয়া হলো পাঁচ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম। দ্বিতীয় স্থান চার পয়েন্ট পেয়ে প্রথম হলো যুগোশ্লাভিয়া।

ভিনা ডেলমারে ব্রাজিল খুব একটা সাড়া জাগাতে পারলো না। সুইডেন আসরে ব্রাজিল দলের মধ্যে যে ঐক্যবদ্ধতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল তার সিকিভাগও চিলিতে খুঁজে পাওয়া গেল না। প্রথম ম্যাচে তারা মেকসিকোকে জৌলুসহীন ফুটবল খেলে হারালেন। গোল দিলেন জাগালো একটি এবং দুটি পেলে। কিন্তু পরের ম্যাচে ব্রাজিলকে রুখে দিলো চেকোশ্লোভিয়া। পপলুহারের নেতৃত্বে চেকেরা অনবদ্য ফুটবলের পরিচয় দিলো। রক্ষণভাগ ছিল দুর্ভেদ্য। বারবার গোলের কাছে বল নিয়ে এসেও ব্রাজিলিয়ানরা ব্যর্থ হলো। দ্বিতীয়ার্ধে মাঠ ছাড়লেন পেলে। পেশীর যন্ত্রণায় কাতর পেলেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। জানা গেল পেলের পক্ষে আর প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ফলে পেলের জায়গায় পরের ম্যাচগুলিতে খেলতে হলো অ্যামারিলডোকে। পেলের ঘাটতি বুঝতে দিলেন না অ্যামারিলডো। সমস্ত প্রাণশক্তি উজাড় করে তিনি দলের সঙ্গে সহযোগিতা করার চেষ্টা করলেন, সেই সঙ্গে পেলের অভাবকে বুঝতে দিলেন না গ্যারিঞ্চা। প্রাণপণ চেষ্টা করেও চেক দলকে হারানো গেল না। জাগালো, গ্যারিঞ্চার শট পোস্টে লেগে ফিরে এলো। চেকের সঙ্গে জয় না পাওয়ায় ব্রাজিলকে কালঘাম ঝরিয়ে লড়াই করতে হলো স্পেনের বিরুদ্ধে। স্পেন দলে খেলছেন পঞ্চাশের তারকা পুসকাস। হাঙ্গেরীর পুসকাস স্পেনে যাওয়ায় অনেকেই উৎসাহী হয়েছিলেন। জয়ী স্পেন এই আসরে ভাল ফল দেখাতে পারতো যদি স্টিফানোকে

তারা দলে পেতেন। স্পেনের পেশাদার ফুটবল জগতের শ্রেষ্ঠ মূল্যবান তারকা স্টিফানোর সঙ্গে কর্মকর্তাদের মনোমালিন্য হওয়ায় স্টিফানো দলের সঙ্গে চিলিতে এলেন না। অথচ তাকে চিলির ভি. আই. পি বক্সে বসে আরামে চুরুট টানতে দেখা গেল সাংবাদিক হিসাবে। স্পেনের দিন ব্রাজিল দলে এলেন অ্যামারিলডো। এই ম্যাচে ফুট-বল নিয়ে ভেল্কি দেখালেন গ্যারিঞ্চা। তার অনবদ্য আক্রমণ ভূমিকায় ব্রাজিল পেলো দুটি গোল। এই গোল দুটি এলো গ্যারিঞ্চার পাস থেকে নবাগত অ্যামারিলডোর শটে। ম্যাচ শেষে গ্যারিঞ্চার সুখ্যাতিতে গ্যালারী মুখর হয়ে উঠলো। যেমন স্পিড, তেমনি অভাবনীয় স্কিল সহ ফুটবল ব্রেন। পাখীর মতো উড়ে যাওয়া গ্যারিঞ্চাকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব ছিলো স্পেন ডিফেনডারদের। এই জয়ের ফলে ব্রাজিল পেল কোয়ার্টার ফাইনালে উঠার সুযোগ। এই পুল থেকে কোয়ার্টার ফাইনলে উঠলো ব্রাজিলের সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়া। শেষ দুটি ম্যাচে চেকদল জয় পেল মেকসিকো ও স্পেনের বিরুদ্ধে। মেকসিকো হারলো ৩-১ গোলে ও শেষ ম্যাচে প্রচণ্ড লড়াই সত্ত্বেও ১-০ গোলে ম্যাচ হারতে বাধ্য হলো স্পেন।

র‍্যান্‌কাগুয়াতে শেষ পুলের খেলায় আর্জেন্টিনা ১-০ গোলে হারালো বুলগেরিয়াকে। ইংল্যাণ্ড ভালো দল নিয়ে আসা সত্ত্বেও ২-১ গোলে হার স্বীকার করলো হাঙ্গেরীর সঙ্গে। এই আসরে ইংল্যাণ্ড দলের হয়ে প্রথম মাঠে নামলেন ববি মুর, ববি চার্লটনের মতো প্রতিভা-ধরেরা। পরের ম্যাচে হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড জয় পেলো ২-১ গোলে। আর্জেন্টিনার সঙ্গে শেষ ম্যাচে ইংল্যাণ্ড দুর্ধর্ষ রণনৈপুণ্যের পরিচয় দিলো। চার্লটনের খেলা দেখে খুশী হলেন সকলে। এই পুলে উত্তেজনা চরমে উঠলো। হাঙ্গেরী ৬-১ গোলে বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে জয় পেলেও, গোল পেল না আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে। ইংল্যাণ্ড বনাম বুলগেরিয়ার ফলাফল একই হলো। ফলে ইংল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরী উঠে এলো কোয়ার্টার ফাইনালে।

মোট চারটি গ্রুপ থেকে প্রথম দুটি দলকে নিয়ে আট দলের মধ্যে শুরু হলো কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের খেলা। প্রাথমিক লীগ শেষে যে ফলাফল দাঁড়িয়েছিল, তাহলো যথাক্রমে—

গ্রুপ এক ঃ

রাশিয়া—	৩-২-১-০-৮-৫-৫
যুগোশ্লাভ—	৩-২-০-১-৮-৩-৪

গ্রুপ দুই ঃ

পঃ জার্মানী—	৩-২-১-০-৪-১-৫
চিলি—	৩-২-০-১-৫-৩-৪

গ্রুপ তিন ঃ

ব্রাজিল—	৩-২-১-০-৪-১-৫
চেকোশ্লাভ—	৩-১-১-১-২-৩-৩

গ্রুপ চার ঃ

হাঙ্গেরী—	৩-২-১-০-৮-২-৩
ইংল্যাণ্ড—	৩-১-১-১-৪-৩-৩

উপরোক্ত ফলাফলে আটটি দেশ মিলিত হলো কোয়ার্টার ফাইনালে। এই পর্যায়ের খেলায় রান্‌কাগুয়ায় হাঙ্গেরী একটানা আক্রমণ চালিয়েও কোন গোল পেল না। টিশি, আলবার্ট, ফেলিভেসি কেউই পারলেন না লক্ষ্যভেদ করতে। ভাগ্যের প্রসাদে চেকদলের গোলপোস্ট এমনভাবে মায়াজাল বিস্তার করেছিল, যার ফলে হাঙ্গেরীয়ানদের অধিকাংশ শট পোস্টে লেগে ফিরে গেল। দুটি ক্ষেত্রে চেক গোল রক্ষক অভাবনীয় কপাল জোরে গোল বাঁচালেন। একতরফা আক্রমণে গোল না পাওয়ায় হাঙ্গেরিয়ানরা মানসিক দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে ওঠামাত্র সামান্যতম সহজ সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন শেয়ার। চমৎকারভাবে তিনি হাঙ্গেরীর স্টপার এবং পরে দুজন ব্যাককে কাটিয়ে নিয়ে যে শট করলেন, যা গ্রসিকসের মতো গেলেরক্ষকের নাগাল টপকে যায়। অথচ ভাবতে অবাক লাগে চেকেদের এই আক্রমণ এত দুর্বল

ছিল যে এই আক্রমণ থেকে যে কোন গোল হতে পারে এমন বিশ্বাস গোলদাতা শেয়ার বা কোন চেকসমর্থকদের ছিল না। গোল খাওয়া হাঙ্গেরীদল শেষ মুহূর্তে গোলটি শোধ করা সত্ত্বেও রেফারি লাটিশেভ টিশির বিরুদ্ধে অফসাইডের সংকেতে গোলটি বাতিল করে দিয়েছিলেন। ফলে শেয়ারের গোলের বিনিময়ে চেকদল উঠলো সেমিফাইনালে।

সান্টিয়াগোয় যুগোশ্লাভ কঠিন লড়াই করে হারালো পশ্চিম জার্মানীকে। লম্বা পাসে খেলে জার্মানরা প্রথমদিকে যথেষ্ট প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। জিলারের দুর্ভাগ্য তার একটি নিশ্চিত গোল হওয়ার মতো শট পোস্টে লেগে ফিরে যায়। যুগোশ্লাভ দ্বিতীয়ার্ধে ভাল কিছু মুভ করেও সফল হতে পারলো না। বল কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে আহত হলেন যুগোশ্লাভের সেরা খেলোয়াড় রাডাকোভিক। মাঝমাঠে তিনি জিলারকে কঠিন পাহারায় রেখেছিলেন। ছিয়াশি মিনিটের শ্বাসরুদ্ধ খেলাটির নিষ্পত্তি ঘটলো মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রাডাকোভিকের দেওয়া গোলে। ওভারল্যাপ করে উপরে ওঠে আসা রাডাকোভিক গালিকের নিখুত ব্যাক পাস রিসিভ করেই নিলেন জোরালো শট। পনেরো গজ দূর থেকে নেওয়া এই পোস্ট ঘেঁষা শট জার্মান গোলরক্ষক ফারিয়ানকে তাজ্জব বানিয়ে সোজা জড়িয়ে গেল জালে।

যুগোশ্লাভ ও পশ্চিম জার্মানীর খেলা দেখতে দেখতে বহুলোককে দেখা গেল এইদিন পকেট ট্রানজিসটারে আরিকার খেলার বিবরণ শুনতে।

আরিকায় চিলি অঘটন ঘটিয়ে ২-১ গোলে ম্যাচ জিতে গেল রাশিয়ার বিরুদ্ধে। চিলি এই ম্যাচে ৪-৩-৩ পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল। টোরোকে তারা ডিফেন্সে নিয়ে আসেন। তার কাজ হলো পিছন থেকে বল নিয়ে সামনের দিকে যোগানো। হলোও তাই—টোরোর দেওয়া বল এলো রামিরেজের কাছে। তার কাছ থেকে বল পেলেন সানচেজ। পঁচিশ গজ দূর থেকে বল ধরেই তিনি চকিতে বাঁ পায়ে

শট নিলেন। লাট্টুর মতো বল বাতাসে ঘুরতে ঘুরতে গোলে ঢুকলো। ইয়াসিনের মতো একজন শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক বলটি ধরার কোন চেষ্টা করলেন না। অনেকের মতে গোলটির জন্য সানচেজের কৃতিত্ব যত না বেশী তার চেয়ে ইয়াসিনের ত্রুটি হল অমার্জনীয়। তার মতো একজন গোলরক্ষকের পক্ষে এই ধরনের শটে শিক্ষানবীশের মতো গোল খাওয়া উচিত হয় নি। চিলি এগিয়ে গেলেও রাশিয়া কিন্তু সহজে তাদের ছেড়ে দিল না। মাঠ ভর্তি চিলি সমর্থকদের তিরস্কার সহ্য করেও ছমিনিটের মধ্যে খেলায় সমতা আনলেন চিসলেঙ্কো। এরপর খেলা হয়েছিল প্রচণ্ড গতিতে। আঠারো মিনিট পরে চিলির পক্ষে জয় সূচক গোলটি দিলেন রোজাস। এই গোলটিও এমন কিছু আহামরি ছিল না। ইয়াসিন চেষ্টা করলে ধরতে পারতেন। সবাইকে অবাক করে ইয়াসিন সেদিন আশ্চর্যভাবে ফর্ম হারলেন। শুধু একা তার দোষ নয়, এই ম্যাচে রুশ রক্ষণভাগের টোকিলি, অস্ট্রোভস্কি বা মাস-লেনকিন কেউই সুবিধা করতে পারেন নি। ফলে চিলি সৌভাগ্যবশত রাশিয়াকে হারিয়ে পৌঁছে গেল সেমিফাইনালে।

গ্যারিঞ্চা একাই একশ

ভিনায় গ্যারিঞ্চা অনবদ্য ফুটবল খেললেন। পেলেহীন ব্রাজিল এক গ্যারিঞ্চার জোরেই পৌঁছে গেল সেমিফাইনালে। গোটা ইংল্যাণ্ডকে বিধ্বস্ত হতে হলো এক গ্যারিঞ্চার অনবদ্য ভূমিকায়। বল নিয়ে তিনি যেমন বাজপাখির মতো ধেয়ে গেলেন ইংল্যাণ্ড সীমানায়, তেমনি দেখালেন কিভাবে জোরালো শটে বাতাসভর্তি বলকে অস্বাভাবিক ভাবে বাঁক খাওয়ানো যায়। গ্যারিঞ্চাকে বাধা দেওয়ার মতো সাধ্য ছিল না উইলসন, মুর, নরম্যান বা আর্মফিল্ডের। গ্যারিঞ্চা গোটা বৃটিশ রক্ষণভাগকে ইচ্ছেমতো তছনছ করলেন। তার সঙ্গে ট্যাকল

করতে গিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়েছেন উইলসন। বেঁটেখাটো মানুষটির দু পায়ে ছিল যেমন অসম্ভব জোরালো শট, তেমনি ছিল কলজেতে অফুরন্ত দম। প্রথম গোলটি দিলেন গ্যারিঞ্চার মতো একজন খাটো চেহারার মানুষ, প্রায় সাড়ে ছয় ফিট শূন্যে লাফিয়ে। ভাভার কর্ণার ধরতে স্প্রিংগেট লাফিয়েছিলেন ছ ফিট শূন্যে, গ্যারিঞ্চা লাফালেন স্প্রিংগেটের চেয়ে আরও কিছুটা বেশী, যার ফলে স্প্রিংগেটের পক্ষে সম্ভব হয় নি গ্যারিঞ্চার মাথা থেকে বলকে নামিয়ে আনতে। বিরতির আগে ইংল্যাণ্ড গোল শোধ করলেন। গ্রিভসের শট পোস্টে লেগে ফিরে আসতেই সেই ফিরতি বলে শট নিয়ে খেলায় সমতা আনলেন হিচেন্স।

দ্বিতীয়ার্ধে গ্যারিঞ্চা দলকে জয় দেখালেন। চুয়ান্ন মিনিটের মাথায় তার দুরন্ত শট স্প্রিংগেটের বুকে লেগে ফিরে আসতেই ভাভা সহজভাবে দ্বিতীয় গোল করলেন। তৃতীয় গোল করলেন গ্যারিঞ্চা। মাঝমাঠ থেকে একা বল টেনে নিয়ে এসে কুড়ি গজ দূর থেকে করলেন সোয়াভিং শট। স্প্রিংগেট বলের গতি বোঝার আগেই বলটি অসম্ভব জোরালো বেগে, তার নাগাল টপকে ডানদিকের পোস্ট ঘেঁষে প্রবেশ করলো গোলে।

অবিশ্বাস্য ছিল এই গোল। কারো পায়ের শট যে এইভাবে বাতাসে ধনুকের মতো এতখানি বাঁক নিতে পারে তা চোখে দেখার পরও অনেকে বিশ্বাস করতে পারেন নি।

ব্রাজিল জয় পেল। বিধ্বস্ত ইংল্যাণ্ড সমালোচকেরা গ্যারিঞ্চার অনবদ্য ভূমিকাকে প্রশংসা করে বললেন, "এই ম্যাচে ব্রাজিল জেতেনি, জিতেছে গ্যারিঞ্চা। একজন খেলোয়াড় যে একক প্রচেষ্টায় একটা বড় ম্যাচ জিতিয়ে দিতে পারে গ্যারিঞ্চার সেদিনের খেলাই ছিল তার একটি মস্ত নজির।"

সেমিফাইনালে ব্রাজিলকে মিলিত হতে হলো চিলির সঙ্গে।

অনবদ্য গ্যারিঞ্চা

১৯৬২ সালের বিশ্বকাপ যে ব্রাজিল এক গ্যারিঞ্চার জোরে পেয়েছিল এবং সেইসঙ্গে যে চিলির বিশ্বকাপকে গ্যারিঞ্চার বিশ্বকাপ বলা হয়—তা একেবারে অমূলক নয়। সত্যি, গ্যারিঞ্চা ছিলেন অনবদ্য। তাকে রোখার মতো ক্ষমতা বা শক্তি চিলির ছিল না। সান্টিয়াগোর ম্যাচে গ্যারিঞ্চাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না কারো। তিনি মাঠের মধ্যে বাতাস ভর্তি চামড়ার গোলকটিকে নিয়ে যা খুশী তাই করলেন। গোটা চিলি সেদিন গ্যারিঞ্চার সামনে প্রাচীর সৃষ্টি করেও পথ রোধ করতে পারে নি। অগ্নিগর্ভ গ্যারিঞ্চা অবিশ্বাস্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বত্রিশ মিনিটের মধ্যেই এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলায় দু'গোলে পিছিয়ে দিলেন চিলিকে।

নিজের দেশে ব্যাপক জনসমর্থক পেয়েও চিলির খেলোয়াড়েরা বেঁটে গ্যারিঞ্চাকে আগলে রাখতে পারলেন না। তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মতো চিলির রক্ষণভাগকে ফুটবলের বিজ্ঞান ভিত্তিক অভিনব চাতুর্যে ফালাফালা করে গ্যারিঞ্চা একাই দিলেন দু-দু'টো গোল। লেফট-ইন পজিশন থেকে বল পেয়ে তিনি ঘণ্টায় তিন শ' মাইল বেগে ছুটে গিয়ে যে দুরন্ত শটটি করলেন, তা ধরার মতো ক্ষমতা হলো না চিলির গোলরক্ষক এসকুইটির পক্ষে। তিনি কাঠের পুতুলের মতো স্থিরভাবে একজায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে পেলেন জোরালো শটের বলটি তার নাগাল টপকে জালে জড়িয়ে গেছে। দ্বিতীয় গোলটিও ছিল দর্শনীয়। বত্রিশ মিনিটে জাগালোর কর্ণারে বিরাট এক হাইজাম্প দিয়ে ২-০ গোলে গ্যারিঞ্চা এগিয়ে দিলেন ব্রাজিলকে।

অপ্রতিরোধ্য গ্যারিঞ্চার রণমূর্তি চিলি সমর্থকদের থমকে দিয়েছিল। তবু তারা দেশকে প্রেরণা দিতে চেষ্টার ত্রুটি রাখলেন না।

বিরাট একটা ঝাঁকুনি খেয়ে চিলির খেলোয়াড়েরা যেন নড়ে বসলেন। দ্বিতীয় গোলের কিছু পরেই চিলির ডান প্রান্ত থেকে টোরোর ফ্রিকিক গোল এনে দিল। ব্যবধান কমে যেতেই উত্তেজনা ফিরে এলো। গ্যারিঞ্চা তখন সারা মাঠ জুড়ে খেলছেন। ভাভা, ডিডি, জিটো প্রত্যেকের পাসেই বল দেওয়া নেওয়া করে মুভমেণ্ট তৈরি করার চেষ্টা করে খেলেছেন গ্যারিঞ্চা। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হতে না হতেই সানচেজ কঠিন ট্যাকল করে ব্রাজিলের আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে কর্ণার করলেন। গ্যারিঞ্চা ছুটে গেলেন কর্ণার করতে। বল বসিয়ে নিয়ে করলেন একটি নিখুঁত শট। বাতাসে বাঁক নেওয়া বল সকলের মাথা টপকে বল এসে পড়লো ভাভার মাথায়। ভাভা ওই বলে মাথা ছুঁতেই গোল।

এই গোলের পর চিলি কিছুটা চেপে ধরলো। এজাগুয়ের একা লড়াই করছেন তখন। আক্রমণ ভাগের ব্যর্থতা দেখে তিনি নিজে এবার বল নিয়ে ওপরে উঠে এলেন। চমৎকার বোঝাপড়ায় চিলি একটা পজিটিভ মুভমেণ্ট তৈরি করলো। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে শেষ চেষ্টা করলেন জোজিমো। তিনি হাত দিয়ে বল ধরে ফেললেন বক্সের মধ্যে। ফলে পেনালটি থেকে সানচেজ দ্বিতীয় গোল করলো চিলির হয়ে। শেষ মুহূর্তে উত্তেজনা উঠলো চরমে। জাগালো লেফট-উইং ধরে তীব্র গতিতে ছুটে বল নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। সামনে দুইজন ডিফেনডার। সবাই আশা করেছিলেন জাগালো হয়ত ইন-কাটিং করে বলটি নিজেই গোলে মারবেন। কিন্তু বুদ্ধিমান জাগালো নিজে সে দায়িত্ব নিলেন না। বরং সেণ্টার করে বল পাঠালেন ভাভার মাথায়। এসকুইটি কিছু বোঝার আগেই ভাভার হেডে বল জড়িয়ে গেল জালে।

পরাজয় নিশ্চিত দেখে চিলির খেলোয়াড়েরা উত্তেজনায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন। ফলে মুহূর্তে বদলে গেল মাঠের চিত্র। গ্যালারীর উত্তেজনা প্রকাশ্যে প্রতিফলিত হলো মাঠের খেলায়।

গ্যারিঞ্চার গতিতে পরাজিত রোজাস, নিরুপায় হয়ে পিছন থেকে লাথি মারলেন গ্যারিঞ্চাকে। লাথি খাওয়া গ্যারিঞ্চা মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পালটা লাথি মারলেন রোজাসকে। ছুটে এলেন রেফারি। ততোক্ষণে শুরু হয়ে গেছে দুজনের মধ্যে হাতাহাতি। গ্যারিঞ্চা মারতেই তাকে মাঠ থেকে বার করে দেওয়া হলো। আত্মভিমানী গ্যারিঞ্চা মাঠ ছাড়বার আগে বিশ্রী ভাবে অঙ্গভঙ্গি করলেন, ফলে চিলির সমর্থকেরা রাগে ফেটে পড়লেন। তারা গ্যারিঞ্চার উদ্দেশ্যে গাল পাড়তে লাগলেন। ড্রেসিং রুমে ঢোকার মুখে বোতল ছোঁড়ায় আহত হলেন তিনি। খেলা তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কাজেই ব্রাজিলের আত্মবিশ্বাস নষ্ট হলো না। জয় নিশ্চিত জেনে তারা বল ধরে রেখে খেলে শেষ কটা মিনিট কোন রকমে উতরে দিলেন। ব্রাজিল ৪-২ গোলে সান্টিয়াগোয় ম্যাচ জিতে উঠলো ফাইনালে।

অন্য আর একটি সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত হলো ভিনাডেল মারেতে। এই ম্যাচে চেকোশ্লাভ অত্যন্ত সহজভাবে ম্যাচ জিতলো যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে।

ফাইনালে মুখোমুখি হলো ব্রাজিল ও চেকোশ্লাভিয়া। সান্টিয়াগোয় ১৭ই জুন অনুষ্ঠিত হলো ফাইনাল ম্যাচ। এই ম্যাচে ব্রাজিলের জয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিলেন সকলে। ফাইনালে অপেক্ষা গোটা শহর উত্তেজনায় পরিপূর্ণ ছিল তৃতীয় স্থান নির্বাচনের খেলা নিয়ে। চিলির সমর্থকদের কাছে এই ম্যাচ ছিল ফাইনালের সামিল। তৃতীয় স্থান যাতে হাতছাড়া না হয় তার জন্য সমগ্র চিলিবাসী হাজির ছিলেন মাঠে। প্রচণ্ড লড়াই করার পর শেষপর্যন্ত কপাল জোরে চিলির রোজাস গোল পেলেন। তার দুর্বল শটটি সাসকিকের ধরা উচিত ছিল। তিনি যে ওই বল কি ভাবে ফসকালেন তা বলা শক্ত।

এদিকে ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার চব্বিশ ঘণ্টা আগেও ব্রাজিল খেলোয়াড়দের মনে সুখ ছিল না। গত ম্যাচে গ্যারিঞ্চাকে

নিয়ে অপ্রতিকর ঘটনায় বোঝা যাচ্ছিল না ফাইনালে তিনি প্রকৃতপক্ষে খেলার অনুমতি পাবেন কি না। বিশ্বকাপ শৃঙ্খলা কমিটি গ্যারিঞ্চার কার্যকলাপ নিয়ে ঘন ঘন বৈঠকে বসলেন। কমিটির সিদ্ধান্ত চব্বিশ ঘণ্টা আগেও সঠিক ভাবে কিছু জানা না যাওয়ায় বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন ব্রাজিল কর্তারা। সাংবাদিকেরা ঘন ঘন ছুটলেন খবর আদায় করতে। শেষে ফিফা সভাপতি স্যার স্ট্যানলী রাউস টেলিফোনে জানালেন—'গ্যারিঞ্চাকে সতর্ক করা হয়েছে, সাসপেণ্ড করা হয়েছে চিলির লাণ্ডাকে।'

ব্যাস—এইটুকুই যা জানার। হৈ হৈ করে উঠলেন ব্রাজিল সমর্থকেরা। হাসি ফুটলো ব্রাজিলের কর্মকর্তাদের মুখে। বুক থেকে যেন দুঃস্বপ্নের বোঝা নেমে গেল।

প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে খেলা শুরু হলো। দলে পেলে নেই। মানসিক চাপে গ্যারিঞ্চাও অনেকখানি সংকুচিত। এই অবস্থায় চেকোশ্লাভিয়া শুরুতেই গোল দিয়ে এগিয়ে গেল। অসাধারণ ফুটবলে মাসোপাস্ট ও পপলাহার তছনছ করে দিতে লাগলেন ব্রাজিলের রক্ষণভাগ। ঘন ঘন চাপের মুখে পড়ে ভীষণ অসহায় বোধ করতে লাগলেন জিলমার। বুড়ো স্যাণ্টোসের আগের মতো দম নেই। বারবার তাকে অতিক্রম করে যাচ্ছেন শেয়ার, মাসেপোস্ট। বেশ কিছুক্ষণ কোণঠাসা অবস্থায় কাটাবার পর ব্রাজিলের যেন সংবিৎ ফিরে এলো। ভাভার কাছ থেকে বল পেয়ে প্রথম গোল দিলেন আমারিল্ডো। বিরতি পর্যন্ত ফলাফল থাকলো ১-১।

দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাজিল ছক বদল করে নিলো আক্রমণের ভূমিকা। তারা একের পর এক বল নিয়ে ধেয়ে এলো। কিন্তু শেষ রক্ষা সম্ভব ছিল না। গোল এলো উনসত্তর মিনিটে। গ্যাঞ্চিয়ার থ্রু ধরে আমারিল্ডো বাঁ প্রান্তে এগিয়ে গেলেন। তারপর চকিতে পায়ের টানে দুজনকে কাটিয়ে চমৎকার সেণ্টার করলেন ডান পায়ে। সামনেই ফাঁকায় দাঁড়িয়ে ছিলেন জিটো। তার পক্ষে দ্বিতীয় গোল

করায় কোন অসুবিধে হলো না। তৃতীয় গোল এলো একেবারে অন্তিমলগ্নে। স্যাণ্টোসের উঁচু সট ধরে স্রইফ মাটিতে বল নাচাচ্ছিলেন। হঠাৎ কোন কিছু নেই, অপ্রত্যাশিত ভাবে সেই বলে ভাভা ছুটে গিয়ে পা ছুঁয়ে দিলেন। অপ্রতিভ স্রইফ কিছু বোঝার আগেই গোল।

এই গোলের ফলে ব্রাজিল দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জয় করলো ৩-১ গোলে। পেলের অনুপস্থিতিতে ব্রাজিলিয়ানদের মনে যে সংশয় ছিল তা দূর হলো। বরং নবাগত আমারিল্ডো প্রমাণ দিলেন বুদ্ধি ও প্রতিভায় তিনিও কম নয়। পেলের বদলী হিসাবে জাতীয় দলে খেলার যোগ্যতা তারও আছে।

প্রবীণ খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া ব্রাজিল বিশ্বকাপ জয়ের সেরা শিরোপা মাথায় পরে প্রমাণ করলো বিশ্ব ফুটবলে তারাই শ্রেষ্ঠ। আগামী দিনের ইতিহাস তাই অপেক্ষা করে থাকলো জুলেরিমে কার গলায় জয়মাল্য দেবে—ব্রাজিল না ইতালির ?

এই জটিল প্রশ্নের উত্তর মিলেছিল ১৯৭০ সালে। এর মাঝখানে হয়ে গেছে আর একটি বিশ্বকাপের আসর। সেই আসর বসেছিল ১৯৬৬ সালে ইংল্যাণ্ডে।

চিলির বিশ্বকাপের লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই আসরে খুব একটা গোলের আধিক্য দেখা যায় নি। মাত্র চারটি গোল দিয়ে সাতজন ফুটবলার সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান লাভ করলেন। এই সাতজনের মধ্যে ব্রাজিলের ছিলেন দুজন—গ্যারিঞ্চা ও ভাভা।

বিতর্কিত বিশ্বকাপ : (১৯৬৬)

১৯৬৬ সালে বিশ্বকাপের আয়োজন করেছিল ইংল্যাণ্ড। এই আসর নানান কারণে বিশ্ববাসীর কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। দীর্ঘ বত্রিশ বছর পর ইংল্যাণ্ড স্বদেশে বিশ্বকাপ জয় করে ইতালি ও উরুগুয়ের সঙ্গে নিজের নামকে যুক্ত করেছিল। ১৯৩৪ সালে ইতালি

সর্বশেষ একটি দেশ যারা স্বদেশের মাঠে বিশ্বকাপ আসরের আয়োজন করে লাভ করেছিল সুদৃশ্য 'জুলেরিমে'।

ইংল্যাণ্ডের অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ নিয়ে গোড়াগুড়ি অনেকের মধ্যেই চাপা অসন্তোষ ছিল। প্রথমত বলা যায় বিশ্বকাপ আসরে ইংল্যাণ্ডের মস্ত কোন ভূমিকা নেই। তারা চিরটা কাল ঐতিহ্যের বড়াই করে এসেছেন কেবলমাত্র শ্বেতবর্ণটির জন্য।

বিশ্বকাপ আসর পরিচালনার দায়িত্ব হাতে পাওয়ার পর ইলিংশ স্পোর্টসম্যানেরা যে মানসিক হীনমন্যতার পরিচয় দিলেন, তা কোন দেশই মেনে নিতে পারে নি। সেই কারণে আসর শেষে তীব্র প্রতিবাদ ও ধিক্কার ধ্বনি শোনা গেল। প্রকাশ্যে ইংল্যাণ্ড কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করলেন পশ্চিম জার্মানী সহ দক্ষিণ-মার্কিন মণ্ডলের ব্রাজিল, উরুগুয়ে, চিলি। তাদের অভিযোগ ইংল্যাণ্ড কর্তৃপক্ষ কোন অবস্থায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেন নি। ইংল্যাণ্ড যেখানে অস্বস্তি বোধ করেছে, জয়ের প্রশ্ন নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, সেখানেই তারা করেছেন স্বার্থসিদ্ধির গোপন কারচুপি। সেমিফাইনালের আগে পর্যন্ত এমন একটি ম্যাচ নেই ইংল্যাণ্ড ভয়শূন্য ভাবে মাঠে নামতে ভরসা পায় নি। প্রতিটি খেলায় তাদের লড়তে হয়েছে। আর এই লড়াইয়ের পিছনে মদত যুগিয়েছে লক্ষ লক্ষ ইলিংশম্যান সহ পেটোয়া রেফরিং। অথচ ভাবতে অবাক লাগে, যে দল ক্ষমতায় অন্তঃসারশূন্য, সেই দলের একজন পেশাদার ম্যানেজার কি ভাবে টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার আগেই বলে বেড়াতে লাগলেন, 'ছেষট্টির বিশ্বকাপ ইংল্যাণ্ড পাচ্ছে। ফাইনালে তারা কি ভাবে খেলবে তার বর্ণনাও নাকি লেখা হয়ে গেছে।'

রামসে এতবড় একটা কথা বললেন কি করে—তিনি কি জানতেন ফলাফল কি ঘটবে? যদি সহজ উপায়ে ম্যাচের আগের ফলাফল জানা বা বলা সম্ভব না হয়, তাহলে বুঝে নিতে হবে উদ্দেশ্য আগেই ঠিক হয়েছিল। কেবল প্রয়োজন ছিল ব্যবহারিক নিয়মে প্রয়োগ

করা। এতবড় কথা ইতালির পোজো পর্যন্ত বলতে সাহস পাননি। তাকেও সময় বিশেষে নির্ভর করতে হয়েছে ভাল খেলা দেখিয়ে জয়ের জন্য। কিন্তু রামসে বিশ্বকাপের ফলাফল কি হবে, সেই বিষয়ে এতই বিশ্বাসী ছিলেন যে তিনি দলের ভাল খেলা না দেখেও দলের জয়ের কথা প্রকাশ্যে প্রচার করে বেড়াচ্ছিলেন। হয়ত তারই ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা গেল ব্রাজিলের পরাজয়, পশ্চিম জার্মানীর ব্যর্থতা। প্রকাশ্য দিবালোকে পেলেকে প্রহার করা সত্ত্বেও ইলিংশ রেফারি নীরবতা পালন করলেন।

ইংল্যাণ্ডের মাটিতে অনুষ্ঠিত অষ্টম বিশ্বকাপ আসরে প্রাথমিক পর্বের খেলার মধ্যে দিয়ে বেছে নেওয়া হলো মোট ষোলটি দলকে। এই আসরে দেখা গেল দুটি নতুন নাম—পর্তুগাল ও উত্তর কোরিয়া। গতবারের রার্নাস চেকোশ্লাভিয়া অত্যন্ত দুঃখজনক ভাবে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিল প্রাথমিক পর্বের খেলায়। ঠিক হলো এই প্রতিযোগিতার মূল আসর বসবে ওয়েম্বলিতে।

ইংল্যাণ্ডে এবার প্রায় প্রতিটি দলই নিজেদের শক্তি সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী ছিল। ইংল্যাণ্ডের রামসের মতো তারা আত্মশক্তি প্রচারে সোচ্চার হতে পারেন নি বটে, তবে তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ভাল ফল দেখাবার আত্মপ্রত্যয় বর্তমান ছিল। যে নবাগত দল দুটিকে ইংল্যাণ্ডের আসরে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল, তারাই সর্বাগ্রে বিশ্বজনের মনে চরম বিশ্বাস সৃষ্টি করলো। পর্তুগালের দুর্ধর্ষ ফরোয়ার্ড ইউসোবিও সর্বাগ্রে দৃষ্টি কেড়ে নিলেন সকলের। তার খেলা সম্পর্কে ইংল্যাণ্ডের প্রচারপত্রগুলি অত্যন্ত মুখর হয়ে উঠেছিল। বিজ্ঞাপিত ইউসোবিওকে বৃটিশ প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে বলা হলো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফুটবলার। আসলে এই প্রচারের উদ্দেশ্যই ছিল, ব্রাজিলের পেলেকে ছোট করা এবং তার মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করা।

ইংল্যাণ্ডে ব্রাজিল তৃতীয়বার বিশ্বকাপ জয়ের মানসিকতা নিয়েই এসেছিল। দলের ম্যানেজার হিসাবে এলেন ফিওলা। দলে দেখা গেল বেশ কিছু পুরনো খেলোয়াড়। অর্থাৎ ১৯৬২তে দলে যারা ছিলেন তারা প্রত্যেকেই তো ছিলেনই, সেই সঙ্গে নতুন করে দলে ডাকা হলো ৫৮ সালের ছুই ব্যাক বেলিনি ও অরল্যাণ্ডোকে।

ব্রাজিলের ছুর্ভাগ্য গ্যারিঞ্চা দলকে আগের মতো শক্তি যোগাতে পারলেন না। মোটর ছুর্ঘটনায় তার ক্ষমতা অনেকখানি হ্রাস পায়। তবু তিনি মাঝে মাঝে খেলে দলকে সাহায্য করার চেষ্টা করলেন।

ব্রাজিল দলের প্রাণশক্তি পেলের সম্পর্কে কারো কোন মন্তব্য ছিল না। সবাই জানতেন, যে কোন শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে মাঠে নেমে পেলে খেলার ছক বদলে দিতে পারেন। ব্রাজিল দল যতই খারাপ খেলুক সেই দলে পেলে থাকতে তাদের হারানো খুবই কঠিন। কিন্তু সেই পেলে ইংলণ্ডে খেলতে নেমে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হলেন। প্রকাশ্য দিবালোকে রেফারির চোখের ওপর তাকে নগ্ন আক্রমণে অকেজো করা হলো।

১১ই জুলাই ওয়েম্বলিতে শুরু হলো অষ্টম বিশ্বকাপ আসর। উদ্বোধনী আসরকে রাজসিক রূপসজ্জায় সুসজ্জিত করা হলো। রাণী এলিজাবেথ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন পর্ব শেষ করার পর ইংল্যাণ্ড মাঠে নামলো উরুগুয়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে। এই ম্যাচে রামসের আত্মঅহংকার কার্যকরী হলো না। ইংল্যাণ্ড আশানুরূপ ফল দেখাতে না পারায় সমর্থকেরা হতাশ হলেন। রক্ষণাত্মক ফুটবলের চরম নিদর্শন রেখে বিরক্তিকর ম্যাচটি শেষ হলো—গোলশূন্যভাবে। পরের ছুটি ম্যাচে অবশ্য ইংল্যাণ্ড কোন ক্রমে জয় পেলো যথাক্রমে মেকসিকো ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। এই জয়ে ইংল্যাণ্ড সমর্থকেরা খুশী হলেও তাদের মন ভরলো না। ফরোয়ার্ড লাইনে হার্স্ট লক্ষণীয় হয়ে উঠলেন। ববি মুর নিসন্দেহে প্রমাণ করলেন, তিনি বিশ্বের একজন সেরা ফুটবলার। এই গ্রুপে দ্বিতীয় স্থান পেলো উরুগুয়ে। গ্রুপ লীগে সবচেয়ে বেশী

হতাশ করলো ফ্রান্স। ভাল দল নিয়েও তারা সফল হলো না। তিনটি খেলার মধ্যে দুটি ম্যাচে তারা হার স্বীকার করতে বাধ্য হলো।

শেফিল্ডে দুই নম্বর গ্রুপে পশ্চিম জার্মানী স্মরণীয় ফুটবল খেললো সুইজারল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে। ঝড়ো আক্রমণ চালিয়ে জার্মান সৈন্যরা অতি সহজে বিধ্বস্ত করলো সুইস দলকে। হলার এবং বেকেনবাউয়ার এই ম্যাচে অসাধারণ ভূমিকা নিলেন। বিশেষ করে মিডফিল্ডে বেকেনবাউয়ার দৃষ্টি কেড়ে নিলেন সকলের।

প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে স্পেন ও আর্জেন্টিনার খেলা আক্রমণাত্মক রণ-কৌশলে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল। উভয় দলই ঘনঘন আক্রমণে খেলাটির উত্তেজনা বাড়িয়ে তুললেন।

শেষ পর্যন্ত আর্জেন্টিনা লুই আরটাইমের দেওয়া গোলে জয় পেল স্পেনের বিরুদ্ধে। খেলার ফলাফল হলো ২-১। তিনটি গোলই হলো দ্বিতীয়ার্ধে। পরের ম্যাচে স্পেন সুইজারল্যাণ্ডকে ২-১ গোলে হারালো। এই দিন সুইজারল্যাণ্ড দলে কমপক্ষে বদল করা হয়েছিল সাতজন খেলোয়াড়।

এই গ্রুপে সেরা খেলা হবে বলে সবাই আশা করেছিল পশ্চিম জার্মানী বনাম আর্জেন্টিনার মধ্যে। কিন্তু সে আশা কোন পক্ষই পূরণ করতে পারলেন না। বিশেষ করে আর্জেন্টিনা নিলো আত্ম-রক্ষার নীতি। ফলে খেলাটি মোটেই চিত্তাকর্ষক হলো না। বরং ঘন ঘন ফাউলে উভয় দলই মেজাজ হারালো। বিশ্রীভাবে ফাউল করার জন্য মাঠ থেকে বহিষ্কার করা হলো আর্জেন্টিনার আল-ব্রেখটকে। পরের ম্যাচে সুইসদের হারাতে আর্জেন্টিনার যেমন কোন কষ্ট হয় নি, তেমনি স্পেনের বিরুদ্ধে জয় পেতে অসুবিধে হলো না পশ্চিম জার্মানীর।

এভার্টনে ব্রাজিল দুরন্ত ফুটবলের পরিচয় দিলো। বুলগেরিয়া সারাক্ষণ প্রহার করেও ব্রাজিলকে দাবিয়ে রাখতে পারলো না। তারা গোটা খেলায় নজর রেখেছিল পেলের ওপর। অথচ কড়া

পাহারায় থাকা সত্ত্বেও পেলে বিরতির আগেই দুরন্ত ফ্রিকিক শটে ২-০ গোলে পিছিয়ে দিলো বুলগেরিয়াকে। বিরতির পর ব্রাজিলের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি দিলেন গ্যারিঞ্চা। পেলে মাঝমাঠে অসাধারণ ভূমিকা গ্রহণ করলেন। তাকে ধরে রাখা মুশকিল হয়ে উঠেছিল। শেষে নিরুপায় হয়ে জেকেভ মাথা গরম করে ফেললেন। সটাং লাথি চালালেন পেলেকে। ঘটনাটা রেফারির চোখের ওপর ঘটা সত্ত্বেও কোনরকম শাস্তি পেলেন না জেকেভ। মার খাওয়া সত্ত্বেও পেলে ঠাণ্ডা মাথায় খেলতে লাগলেন। বুলগেরিয়া ম্যাচ হারলো ২-০ গোলে। ইংলিশ রেফারি জিম ফিনিকে কঠিনভাবে সমালোচনা করা হলো।

ওল্ডট্রাফোর্ডে হাঙ্গেরীর সঙ্গে পর্তুগালের খেলাটি হলো দেখার মতো। যেমন ছিল উত্তেজনা তেমনি ছিল সৌন্দর্যদীপ্ত। খেলা শুরু হতে না হতেই হাঙ্গেরীর গোলরক্ষক জেনৎমিহালি আহত হলেন। এরপর প্রথম কর্ণার থেকে গোল পেলো অগাস্টো। এই গোলের জন্য জেনেৎমিহালি অনেকখানি দায়ী ছিলেন। তিনি সময়মতো শূন্যে বল লক্ষ্য করে লাফ দিতে না পারায় অগাস্টো গোল দিয়ে দিলেন। হাঙ্গেরী এবার ঝাঁপিয়ে পড়লো আহত ব্যাঘ্রের মতো। দু'দুবার তাদের শট ক্রশবারে লেগে ফিরে যাওয়ার পর বেনে বাষট্টি মিনিটের মাথায় খেলার সমতা ফিরিয়ে আনলেন।

কিন্তু এই সমতা হাঙ্গেরী রক্ষা করতে পারলো না। আট মিনিট সময় পার হতে না হতেই জেনেৎমিহালির ভুলে আবার একটি গোল পেয়ে গেলেন টোরেস। এই ম্যাচে দুটি গোল দিলেন টোরেস। অসম্ভব একটা এঙ্গেল থেকে অবিশ্বাস্যভাবে বল বাতাসে ঘুরিয়ে বিস্ময়কর গোল দিলেন টোরেস। এই জাতীয় গোলের জন্য যে কোন জায়গায় পায়ে হেঁটে যাওয়া যায়।

প্রথম ম্যাচে পর্তুগালের কাছে হারার পর হাঙ্গেরী যেন জ্বলে উঠেছিল। কোয়ার্টার ফাইনালে উঠার জন্য তারা তখন মরিয়া।

তারা জানতেন এই অসাধ্যসাধন সম্ভব হবে যদি তারা ব্রাজিলকে হারাতে পারেন। কিন্তু তা এক রকম প্রায় অসম্ভব। ব্রাজিল টুর্নামেন্টে ফেবারিট। এই ম্যাচে ব্রাজিল দলের বেশ কিছু পরিবর্তন করা হলো। ডেনিলসনের জায়গায় আনা হলো হাফব্যাকে গ্যারসনকে। এই ম্যাচে গ্যারিঞ্চা খেলতে পারলেন না। তার পায়ের ব্যথা বাড়ায় তাকে দলে রাখা হলো না, যেমন দলে এলেন না জালমা স্যান্টোস। পরিবর্তন শুধু ব্রাজিল দলে হলো না, হাঙ্গেরী দলেও দেখা গেল। এই ম্যাচে গোলরক্ষক জেনেৎমিহালির বদলে এলেন গেলি।

প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে শুরু হলো এই ম্যাচ। হাঙ্গেরীর আক্রমণকারীরা ব্রাজিলিয়ানদের প্রতি মুহূর্তে ব্যস্ত করে তুললেন। বিশেষ করে হাঙ্গেরীর আলবার্ট একাই বিধ্বস্ত করলেন ব্রাজিলের রক্ষণভাগ। প্রথমার্ধে খেলা শুরুর মুখেই অসাধারণ গোল দিয়ে বেনে এগিয়ে দিলেন হাঙ্গেরীকে। এই গোল পেয়ে হাঙ্গেরীর মনোবল বেড়ে গেল। তারা আক্রমণের চাপে ব্রাজিলকে এমন বিপন্ন করে তুললো যে তাদের পক্ষে পালটা আক্রমণ রচনার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হলো না। পঞ্চাশ মিনিট উভয় দলই মাঝমাঠে খেলাকে ধরে রাখলেন। এরপর লিমার ফ্রিকিক থেকে বল পেয়ে পেলের বদলি টোস্টাও হাঙ্গেরীর রক্ষণভাগ ভেদ করলেন। বিরতি পর্যন্ত ফলাফল থাকলো ১-১।

দ্বিতীয় গোল এলো আলবার্টের আক্রমণ ভূমিকায়। তিনি বল নিয়ে লম্বা দৌড় দিলেন। তার গতির কাছে পিছিয়ে পড়লেন ব্রাজিলের তিন-তিনজন ডিফেনডার। এরপর তিনি চমৎকার পাস দিলেন বেনেকে। বেনে দ্রুত পায়ে বল টেনে নিয়ে নিচু পাসে বল পাঠালেন ফারকাসের কাছে। কোন রকম কালবিলম্ব না করে ফারকাস জোরালো শট নিলেন। জিলমারের পক্ষে সেই শটের নাগাল পাওয়া সম্ভব হলো না। শেষ মুহূর্তে হাঙ্গেরী তৃতীয় গোল

পেলো পেনালটি কিক থেকে—গোল দিলেন মেজলি। পেনালটিতে গোলটি না হলেও হাঙ্গেরীর পক্ষে তৃতীয় গোল করা অসম্ভব ছিল না, যদি না বেনে পিছন থেকে মার খেয়ে মাটিতে পড়ে না যেতেন।

পর্তুগাল বুলগেরিয়াকে ৩-০ গোলে ইউসোবিওর দাপটে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পথকে সুগম করে নিলো। সমস্যা এলো হাঙ্গেরী ও ব্রাজিলের পক্ষ থেকে। বিশেষ করে হাঙ্গেরীর হাতে ব্রাজিলের পরাজয় ঘটায়, পর্তুগালের সঙ্গে ব্রাজিলের জয় পাওয়া খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। উত্তেজনাময় এই ম্যাচে ব্রাজিল কিন্তু আশানুরূপ যোগ্যতা দেখাতে পারলো না। আহত পেলে দলের প্রয়োজনে মাঠে নামতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু খেলা শুরু হতেই পর্তুগাল খেলোয়াড়েরা পেলেকে ঘিরে ধরলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে করেই হোক পেলেকে অকেজো করা। মোরেস অত্যন্ত বেয়াড়া ভাবে দু' দুবার আঘাত করলেন পেলেকে। ফলে পেলে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হলেন। আঘাতের যন্ত্রণায় তিনি খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে গেলেন মাঠের বাইরে। এই ম্যাচে ব্রাজিল দলে উপস্থিত ছিলেন না জিলমার, স্যাণ্টোস, জালিমা ও গ্যারিঞ্চা। দলের সবাই অসুস্থ। জিলমারের জায়গায় গোলরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিলেন মাঙ্গা। তিনি চোদ্দ মিনিটে ইউসোবিও-র প্রচণ্ড গোলার মতো শট ঘুষি মেরে উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। ঘুষি খাওয়া বল উড়ে এলো সিমোসের মাথায়। কালক্ষেপ না করে সিমোস হেড দিয়ে এগিয়ে দিলো পর্তুগালকে। পঁচিশ মিনিটে দ্বিতীয় গোল দিলেন ইউসোবিও। ২-০ গোলে এগিয়ে থাকা পর্তুগাল খেলায় তখন প্রাধান্য বজায় রেখেছে ষোলোআনা। ওই অবস্থায় মোরসের নৃশংস প্রহারে পেলে মাঠ ছাড়লেন। ইংলিশ রেফারি জর্জ ম্যাককাব মোরসের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না। বরং তাকে খুব সুখী মানুষ বলে মনে হচ্ছিল সেই সময়। এরপর আহত হলেন ব্রাজিলের নতুন ফরোয়ার্ড সিলভা। দ্বিতীয়ার্ধে

ব্রাজিল আত্মরক্ষায় নিজেদের গুছিয়ে নিলো। যদিও চৌষট্টি মিনিটের মাথায় ব্যবধান কমিয়ে এনেছিলেন অ্যাটাকিং ব্যাক রিল্ডো। কিন্তু গোল দিলে কি হবে—ব্রাজিল যেন পরাজয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিল। তারা আক্রমণে বড় একটা উৎসাহী হলো না। অবশ্য এর জন্য ইউসোবিওর একক ভূমিকাই ছিল দায়ী। তিনি যে ভাবে বারবার বল নিয়ে ধেয়ে আসছিলেন, তাতে তাকে দাবিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। খেলার শেষ মুহূর্তে অনবদ্য পায়ের কাজে ইউসোবিও তৃতীয় গোল দিয়ে পর্তুগালের জয়কে নিশ্চিত করলেন। ফলে তিন নম্বর গ্রুপ থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলো পর্তুগাল ও হাঙ্গেরী। ব্যর্থ ব্রাজিল দু-দুটি পরাজয়ের সুবাদে সবাইকে অবাক করে প্রতিযোগিতার আসর থেকে ছিটকে গেল।

ইংল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত অষ্টম বিশ্বকাপ আসরে প্রতিটি দেশের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলো খুদে কোরিয়ানরা। তারা ইংল্যাণ্ডে আসার পর থেকে অনেকেই তাদের নিয়ে হাসাহাসি শুরু করেছিলেন। কিন্তু মিডলবরোর আয়ারসাম পার্কে খেলতে নামার পর তাদের সম্পর্কে সমস্ত ধারণা বদলে ফেললেন বিশ্বের সেরা সাংবাদিকেরা। শক্ত সমর্থ রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে তারা চমৎকার ফুটবল খেললেন—যদিও তারা এই ম্যাচে ৩-১ গোলে হেরেছিলেন, তবু তাদের প্রশংসা করতে কসুর করলেন না সেরা লিখিয়ের দল।

আত্মাভিমানী ইতালি সাণ্ডারল্যাণ্ডে সাদামাটা ফুটবলে জয় পেলো ২-১ গোলে চিলির বিরুদ্ধে। এই খেলা খুব একটা আকর্ষণীয় হলো না। বিশেষ করে ইতালি সম্পর্কে যারা মনে মনে উচ্চ ধারণা পোষণ করে আকাশ-কুসুম কল্পনায় মজেছিলেন, তারা অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়লেন। এই হতাশা চরমে উঠলো রাশিয়া এবং উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে হারার ফলে। বিশেষ করে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে ইতালির হার বিস্মিত করলো সমগ্র ইউরোপকে। প্রচণ্ড গতিতে খেললো বেঁটে-খাটো কোরিয়ানরা। তারা বুঝিয়ে দিলো 'স্পোর্টসম্যানশিপ' বলতে

কি বোঝায়। বিশ্বকাপ আসরে এই প্রথম দেখা গেল একটি দলকে ফাউল না করে খেলতে। বিয়াল্লিশ মিনিটে অসাধারণ তৎপরতায় অ্যালবেট্রশিকে পরাস্ত করলেন পাক ডু ইক। এই গোলের বিনিময়ে কোরিয়ানরা শুধু জয় পেল না, সমগ্র বিশ্বজনকে অবাক করে ইতালি ও চিলিকে পিছনে ফেলে উঠে এলো কোয়ার্টার ফাইনালে। কোরিয়ার কাছে ইতালির পরাজয়ে বিশ্বকাপ জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো। ইতালির খেলোয়াড়েরা কঠিন ভাবে সমালোচিত হলেন। ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালে দলীয় সমর্থকদের দ্বারা প্রহৃত হওয়ার সম্ভবনায় তারা কাউকে কিছু না জানিয়ে মাঝ-রাতে জেনোয়ায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু তাতেও তারা নিস্তার পেলেন না। মাঝরাতেও দেখা গেল একদল উগ্র সমর্থক তাদের জন্য বিমান বন্দরে অপেক্ষা করছেন। এরা খেলোয়াড়দের লক্ষ্য করে পচা টমাটো ছুঁড়ে মারলেন। শুরু করলেন শ্লোগান। ইতালির ম্যানেজারশিপ পদ থেকে সরে যেতে বাধ্য হলেন ফ্যাবরি।

অন্যদিকে কোরিয়ানদের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে গেল সমর্থকদের। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রশংসা করা হলো পাক ডু ইক, লি ডং য়ুন, ইয়াং সাং কুক, জন সুং হই ও হান বং জিনের। কোয়ার্টার ফাইনালে কোরিয়ানরা মিলিত হলো পর্তুগালের সঙ্গে।

প্রাথমিক লীগ শেষ হওয়ার পর প্রতি পুলের দুটি করে দল নিয়ে (মোট আটটি দল) তৈরি হলো কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের খেলা। এই খেলা শুরু হলো নকআউট পদ্ধতিতে। প্রাথমিক লীগের ফলাফল বিচারে আটটি দলের হিসাব দেওয়া হলো ঃ

গ্রুপ এক

ইংল্যাণ্ড—৩—২—১—০—৪—০—৫

উরুগুয়ে—৩—১—২—০—২—১—৪

গ্রুপ দুই

পশ্চিম জার্মানী—৩—২—১—০—৭—১—৫

আর্জেন্টিনা—৩—২—১—০—৪—১—৫

গ্রুপ তিন

পর্তুগাল—৩—৩—০—০—৯—২—৬

হাঙ্গেরী—৩—২—০—১—৭—৫—৪

গ্রুপ চার

রাশিয়া—৩—৩—০—০—৬—১—৬

উত্তর কোরিয়া—৩—১—১—১—২—৪—৩

উপরোক্ত হিসাবে দেখা যায় প্রাথমিক লীগে সর্বাপেক্ষা বেশি গোল দিয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে পর্তুগাল। এরপর গোল বেশি দিয়েছে পশ্চিম জার্মানী। ইংল্যাণ্ড তিনটি খেলায় মোট চারটি গোল দিলেও, লীগ পর্যায়ের খেলায় কোন বল তাদের গোলে প্রবেশ করেনি।

কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যাণ্ডকে মিলিত হতে হলো আর্জেন্টিনার সঙ্গে। অন্য খেলাগুলি হলো যথাক্রমে পশ্চিম জার্মানী—উরুগুয়ে, রাশিয়া—হাঙ্গেরী এবং পর্তুগাল লড়াই করলো উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে।

বিশ্বকাপের কলঙ্ক

ইংল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ নিয়ে বির্তকের কোন শেষ নাই। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি খেলায় ইংল্যাণ্ড জয় পেয়েছে একমাত্র রেফারির অনুগ্রহে। যদি ইংল্যাণ্ডের পক্ষে রেফারি সদয় না হতেন তাহলে কোন কারণেই ইংল্যাণ্ডের পক্ষে সেমি-ফাইনালে ওঠা সম্ভব ছিল না। বিশ্বকাপে যোগদানকারী দেশগুলির মধ্যে ইলিংশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। ব্রাজিল অসন্তোষ প্রকাশ করলো। প্রকাশ্যে নিন্দা করলো উরুগুয়ে, হাঙ্গেরী, আর্জেটিনা এবং পশ্চিম জার্মানী।

অভিযোগ একবারে ভিত্তিহীন ছিল না। কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ইংলিশ ফুটবলারেরা মোটেই সুবিধা করতে পারেন নি। এই ম্যাচে তাদের জয়ের সম্ভাবনা ছিল না। উরুগুয়ে দল শুরুতেই প্রাধান্য বিস্তার করলো। এই সময় রেফারির আচরণ উরুগুয়ে খেলোয়াড়দের মেজাজকে উস্কে দিলো। ঘনঘন বাঁশি বাজার ফলে খেলার গতি যেমন ব্যহত হলো তেমনি বেড়ে গেল ফাউলের প্রাধান্য। রেফারি হার রুডল্‌ফ ক্রেটলিন এত বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে তর্ক করার অজুহাতে অকারণে মাঠের বাইরে বার করে দিলেন আর্জেন্টিনার সেরা খেলোয়াড় ও অধিনায়ক অ্যানটনিও র‍্যাটিনকে। রেফারির আদেশ উপেক্ষা করে র‍্যাটিন মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলেন। শুরু হলো মাঠের মধ্যে বিতর্ক। পরে উত্তেজনা এত চরমে উঠলো যে রেফারির সঙ্গে হাতাহাতি শুরু করে দিলেন খেলোয়াড়েরা। খেলোয়াড়েরা শেষপর্যন্ত মাঠ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে মাঠে ছুটে এলেন ফিফার কর্মকর্তার দল। তারা বহু বোঝাবার পর খেলোয়াড়দের শান্ত করলেন। পরে পুলিশের সহায়তায় মাঠের অবস্থা আয়ত্তে আনা হলো। র‍্যাটিন মাঠ ত্যাগ করার পর আবার খেলা শুরু হলো। দশজনে খেলতে লাগলো উরুগুয়ে দল। ইংল্যাণ্ড ফুটবলারেরা এত করেও কিন্তু আর্জেন্টিনার চাপকে দমিয়ে রাখতে পারলো না। ভাগ্য ভাল থাকায় ইংল্যাণ্ড — পেল জিওফ হার্স্টের দেওয়া একটি মাত্র গোলে। এই গোলের সুবাদে ইংল্যাণ্ড উঠে এলো সেমিফাইনালে। অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে হাঙ্গেরীর রক্ষণভাগের দুর্বলতায় এবং বিশেষ করে গোলরক্ষকের ভুলে রাশিয়া ম্যাচ জিতলো ২-১ গোলে।

আর্জেন্টিনার সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীর খেলা মোটেই প্রতিযোগিতামূলক হলো না। একতরফা ম্যাচ খেললো পশ্চিম জার্মানী। অতি সহজে তারা ম্যাচ হারলো ৪-০ গোলে।

কোয়ার্টার ফাইলালে সেরা খেলা হলো পর্তুগাল বনাম উত্তর কোরিয়ার মধ্যে। এই ম্যাচে এশিয়াগত কোরিয়ানরা ফুটবলের জাদু

খেলা দেখালেন। দ্রুত গতির খেলায় বিস্ময় সৃষ্টি করে কোরিয়ানরা পর্তুগালকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল। বিশ্বকাপ আসরে কোরিয়ানরা যোগ দেওয়ার পর থেকেই পশ্চিমী দেশগুলি তাদের নিয়ে বিস্তর গুজব ছড়াতে লাগলেন। আসলে তারা কেউ ধারণা করতে পারেন নি, এশিয়ার এই দলটি ফুটবলের কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমান তালে লড়াই করতে পারবে। তারা অনেকেই ভেবেছিলেন কোরিয়ানরা চূড়ান্ত পর্যায়ের লীগের পরেই হটে যাবে মূল প্রতিযোগিতার আসর থেকে। কার্যতঃ তা হয় নি। লীগ আসরে এই কোরিয়ানদের হাতে ইতালির পরাজয় ফুটবল পণ্ডিতদের সমস্ত ধ্যানধারণা বদলে দিয়েছিল। এই কোরিয়ানদের সার্বিক চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো পর্তুগালের বিরুদ্ধে। অসাধারণ গতিবেগে খেলা শুরু করে মাত্র ছাব্বিশ মিনিটের মধ্যেই ৩-০ গোলে এগিয়ে গেল কোরিয়ানরা। কেবলমাত্র বড় আসরে খেলার অভিজ্ঞতা না থাকার জন্য প্রচণ্ড লড়াই সত্ত্বেও জয় হলো না তাদের। দুর্ধর্ষ ইউসোবিও'র একক প্রচেষ্টায় খেলার পটভূমি বদলে গেল। তিনি একাই দিলেন চারটি গোল। শেষ গোলটি করলেন অগস্টো। ম্যাচ শেষে জয়ীর সম্মান পেলেন কোরিয়ান খেলোয়াড়েরা। প্রত্যক্ষদর্শীর দল বলতে বাধ্য হলেন, "এশিয়ার বিস্ময় কোরিয়ানরা পর্তুগালের কাছে হার স্বীকার করেছেন বটে, তবে তারা খেলেছেন সত্যি একটি বিজয়ী দলের মতো।" অনেকের ধারণায় সেদিন কোরিয়ানদের সামনে যদি পর্তুগালের মতো দল বাধা হয়ে না দাঁড়িয়ে অন্য কোন দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতো, তাহলে হয়ত এই খেলার ফলাফল নিসন্দেহে হতো অন্যরকম। কোরিয়ানদের এই পরাজয়ের জন্য তাদের দায়ী করা যায় না। আসলে পেশাদার ফুটবলের অভিজ্ঞতা তাদের নেই। তারা প্রকৃতপক্ষে মর্ডান ফুটবল শুরু করে মাত্র কুড়ি বছর। এই কুড়ি বছরের নিঃসঙ্গ সাধনায় তারা ছেষট্টির আসরে যে চমক গড়তে পেরেছে, তার জন্যই তাদের ধন্যবাদ প্রাপ্য। পশ্চিমী দেশগুলিতে এশীয় ফুটবলের বিষয়ে সর্বপ্রথম যে

বাস্তব ধারণা তৈরি হয়েছিল তার মূলে ছিলেন কোরিয়ান ফুটবলের বিন্যস্ত রূপটি—যা প্রত্যক্ষ করে বিশ্বজন বিস্মিত হতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এই প্রথম বিশ্বকাপ ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন দেখলো রাশিয়া। সামনে তাদের ইউরোপের এক সেরা শক্তি—পশ্চিম জার্মানী। অভিজ্ঞ জার্মানদের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই করেও সফল হলো না রুশীরা। মিড-ফিলডার বেকেনবাউয়ারের অনবদ্য ভূমিকায় জার্মানী জয় পেল ২-১, গোলে। সোভিয়েতের স্বপ্ন মুছে গেল। জার্মান আক্রমণকে আটকাতে না পেরে সাবো বার বার ফাউল করতে থাকেন, তার লক্ষ্য ছিল বেকেনবাউয়ারের ওপর। কঠিন চাপের মুখে পড়ে সোভিয়েতের সমস্ত প্রচেষ্টা ভেস্তে গেল। বিরতির এক মিনিট আগে বেকেনবাউয়ারের কাছ থেকে বল পেয়ে স্নেলিঞ্জার চমৎকার থ্রু বাড়াল জিলারকে। ওলিম্পিকের রেকর্ড সৃষ্টিকারী দৌড়বীরদের মতো তীব্রগতিতে ছুটে গিয়ে জিলার চমৎকার শটে গোল করে জার্মানীকে এগিয়ে দিলেন। বিরতির পরেও রাশিয়ানরা খেলার মধ্যে প্রাধান্য সৃষ্টি করতে না পারায় মেজাজ হারিয়ে ফাউলের মাত্রা বাড়িয়ে দিলো। ফলে প্রথম মাঠ থেকে লাথি মারার জন্য বহিষ্কৃত হন সাবো। পরে হেল্ডকে অবৈধভাবে পিছন থেকে লাথি মারার জন্য বহিষ্কৃত হলেন চিসলেঙ্কো, ফলে রাশিয়ানরা নয় জন খেলতে লাগলো। রাশিয়ান খেলোয়াড়দের উগ্রতা লক্ষ্য করে জার্মানরা আত্মরক্ষায় সচেতন হয়ে পড়লেন। তারা হয়ত জানতেন রাশিয়ানদের হারিয়ে ফাইনালে উঠতে তাদের কোন কষ্ট হবে না। অতএব ফাইনালে লড়াই করার জন্য তাদের অক্ষত থাকতে হবে। তাই তারা যতটা পারলেন শরীর বাঁচিয়ে খেলতে লাগলেন। দ্বিতীয়ার্ধের বাইশ মিনিটের মাথায় মাঝমাঠ থেকে বল ধরে বেকেনবাউয়ার নিজেই এগিয়ে গেলেন সোভিয়েত সীমানার মধ্যে। তারপর বাঁ পায়ের প্রচণ্ড শটে পরাস্ত করলেন অভিজ্ঞ ইয়াসিনকে। ইয়াসিন বল ধরার কোন সুযোগ পেলেন না। তার মতো একজন সেরা গোলরক্ষক গোলপোস্টের নিচে স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে থাকলেন মাত্র। দু'গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর জার্মানেরা আত্মতুষ্টিতে

ভুগতে শুরু করলো। জয় নিশ্চিত জেনে তারা খেলার ওপর প্রাধান্যকে ছেড়ে দিলেন। ফলে সোভিয়েত আক্রমণকারীরা সম্মিলিত চেষ্টায় সুন্দর একটি গোল করার সুযোগ পেলো। গোল দিলেন পোর্কুজান। খেলার শেষ মুহূর্তে তিনি আর একটি অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেয়েছিলেন গোল করার। টিস্কোয়োস্কির হাত থেকে যে বলটি ছিটকে বেরিয়ে আসতে পারে এই চিন্তা তার ছিল না—ফলে সহজ গোলের সুযোগ নষ্ট হলো রাশিয়ানদের। সেই সঙ্গে এই ম্যাচের ভাগ্যও নির্ধারিত হয়ে গেলো। রাশিয়ানদের বিশ্বকাপে ওঠার স্বপ্ন মুছে দিয়ে পশ্চিম জার্মানী আবার উঠলো ফাইনালে।

ওয়েমব্লিতে অন্য আর একটি সেমিফাইনালে আত্মবিশ্বাসী ইংল্যাণ্ড একই ফলাফলে জয় পেল। এই ম্যাচে পর্তুগালের আক্রমণ শক্তি খুব বেশি সক্রিয় হতে পারে নি। ইংল্যাণ্ড এই প্রতিযোগিতায় যতগুলি ম্যাচ খেলেছিল, তার মধ্যে এই ম্যাচটি ছিল সেরা। যোগ্য দল হিসাবেই তারা জয় পেল। বিশেষ করে ববি চার্লটনের ভূমিকা ছিল অনবদ্য। এত ভাল খেলতে চার্লটনকে বহুদিন বাদে দেখা গেল। তার বল নিয়ে ছোটার মধ্যে যেমন ছিল তীব্র গতি, তেমনি ছিল প্রচণ্ড স্যুটিং ক্ষমতা। মাঝ মাঠে ববি মূর, স্টাইলস অসাধ্য সাধন করলেন। পর্তুগালের শ্রেষ্ঠ ফরোয়ার্ড ইউসোবিওকে কঠিন পাহারায় সারাক্ষণ স্থির ছবির মতো দাঁড় করিয়ে রাখলেন স্টাইলস। ফলে তার পক্ষে আক্রমণ রচনা করা বা গোল দেওয়া আদৌ সম্ভব হলো না। তিরিশ মিনিটের মাথায় উইলসন বুদ্ধি খাটিয়ে চমৎকার ব্যাকপাস করলেন হাণ্টকে। হাণ্টের শট পেরিয়ার গা লেগে ফিরে আসার পর চার্লটন ছুটে গিয়ে সেই বলটি গোলের মধ্যে ঠেলে দিলেন।

দ্বিতীয়ার্ধেও ইংল্যাণ্ড প্রাধান্য বজায় রাখলো। তবু পর্তুগালের খেলোয়াড়েরা গা ঘামাবার চেষ্টা করলেন না। সমাপ্তির এগারো মিনিট আগে হার্স্ট সুন্দর পায়ের কাজে কার্লসকে কাটিয়ে গিয়ে বলটি ঠেলে দিলেন চার্লটনকে। দ্বিধাহীন চার্লটন ঠাণ্ডা মাথায় দিলেন দ্বিতীয় গোল।

শেষ মুহূর্তে পর্তুগাল খেলোয়াড়েরা পরাজয় নিশ্চিত জেনে আক্রমণের ভূমিকা নিলেন। তারা এবার একযোগে শুরু করলো আক্রমণ। ডানদিকে বল ধরে সিমোস কিছুটা ছুটে গিয়ে সুন্দরভাবে বল বাড়িয়ে দিলেন টোরেসকে। টোরেস সেটি দর্শনীয়ভাবে হেড দিয়ে পরাস্ত করলেন ব্যাঙ্কসকে। ব্যাঙ্কসকে টপকে বল যখন গোলের মধ্যে প্রবেশ করছিল ঠিক তখনই ছুটে গিয়ে চার্লটন বলে হাত ছোঁয়ালেন। ফলে পেনালটি পেলো পর্তুগাল। পেনালটি থেকে গোল করলেন ইউসোবিও। শেষ মুহূর্তে পর্তুগাল আর একটি গোলের সুযোগ পেলো। খুব কাছ থেকে বল পেয়ে কলুনার ডান পায়ে যে জোরালো শট করলেন, তা অবিশ্বাস্যভাবে ফিরিয়ে দিলেন ব্যাঙ্কস। এরপরই খেলা শেষের বাঁশি বাজলো এবং ইংল্যাণ্ড পৌঁছে গেল ফাইনালে।

ইংল্যাণ্ড যে ফাইনালে উঠবে এই বিষয়ে কারো মনে কোন সন্দেহ ছিল না। ইংল্যাণ্ডের ম্যানেজার আলফ রামসে তো বহু আগেই প্রেস কর্ণারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিলেন "ইংল্যাণ্ড এবার বিশ্বকাপ জিতছে। পৃথিবীর কোন শক্তি নেই যে ইংল্যাণ্ডের প্রত্যাশিত এই সত্যকে উল্টে দিতে পারে।" সত্যি কি তাই ?

সন্দেহ ভরা প্রশ্ন নিয়ে ফাইনালের আগে তাই রামসেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—যদি পশ্চিম জার্মানী জয় পায় তাহলে আপনি কি বলবেন ?

উত্তরে আত্মাভিমানী রামসে বলেছিলেন—'অসম্ভব, যা হতে পারে না তার উত্তর দিতে আমি রাজি নই। শুধু এইটুকু বলতে পারি ইংল্যাণ্ড যদি পশ্চিম জার্মানীর কাছে হারে তাহলে ইতিহাস অন্য খাদে বইবে। পঁয়ষট্টি বছর বাদে জার্মানরা এক নয়া কীর্তি রচনা করবে।'

বলা বাহুল্য অপেশাদার ফুটবলে দুই দেশের মধ্যে প্রথম দেখা হয়েছিল ১৯০১ সালে। এই ম্যাচে ইংল্যাণ্ড জয় পেয়েছিল ১২-০ গোলে। টোটেনহামের এই ম্যাচের পর ইংল্যাণ্ড আর কখনও হারে নি।

আলফ রামসের কথা বিফল হয় নি। ইংল্যাণ্ড জয় পেয়েছিল। পেয়েছিল জার্মানীদের পদানত করে 'সোনার পরী'।

ইংল্যাণ্ডের সাফল্যে আলফ রামসের বরাতে স্যার উপাধি জুটেছিল, খুশী হয়েছিলেন বৃটিশ ফুটবল কর্তাব্যক্তিরা। কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোন দেশের সুধীজনেরা এই ইংল্যাণ্ডের সাফল্যে খুশী হতে পারেন নি। তারা ইংল্যাণ্ডের জয়কে কলঙ্কিত করে নানা প্রশ্ন তুলে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষ করে ফাইনাল ম্যাচের ফলাফল সম্পর্কে প্রতিবাদ ছিল পশ্চিম জার্মানীর। তারা জিওফ হার্স্টের দেওয়া গোলের ছবি নিয়ে বিশ্ব দরবারে ঘুরে বেড়িয়েছে সবার কাছে। বিভিন্ন এ্যাঙ্গেল থেকে তোলা ছবিটি দেখিয়ে জার্মানবাসী এক কঠিন বিতর্কিত প্রশ্ন করেছে প্রত্যেককে—'লুক এ্যাট দ্যা ফ্রিম, ইজ-ইট-এ-গোল ?'

সত্যি সেদিন জিওফ হার্স্টের দেওয়া গোলটি গোল হয়েছিল কিনা, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া পরিষ্কার ভাবে আজও সম্ভব হয় নি কারো পক্ষে। ১৯৫৪ সালে অফসাইড অজুহাতে পুসকাসের বাতিল করা গোলের চাইতেও আরও বেশি রহস্যময় হয়ে আছে হার্স্টের দেওয়া এই গোলটি।

সমস্ত তর্কবিতর্কের পর্দা সরিয়ে আমরা ফিরে আসি ফাইনাল ম্যাচ প্রসঙ্গে।

ইজ ইট এ গোল ?

৩০শে জুলাই। ওয়েমব্লিতে অনুষ্ঠিত হলো উত্তেজনাময় ফাইনাল আসর। বৃটিশ প্রচারে মনে হয় জার্মান ম্যানেজার হেলমুট শ্নেন বেশ একটু চিন্তিত ছিলেন। খেলার আগে অসম্ভব হাসিখুশি মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন রামসে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, ফাইনালের ফলাফল কি হবে তা যেন তিনি আগেই জেনে বসে আছেন। তার চলনে বলনে পরম নিশ্চয়তা। উক্তিতে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস।

ফাইনালের আগে টুর্নামেন্টের তৃতীয় স্থান দখল করা নিয়ে মহাযুদ্ধ হয়ে গেছে পর্তুগাল ও রাশিয়ার সঙ্গে। এই ম্যাচ ২-১ গোলে পর্তুগাল হারিয়াছে রাশিয়াকে।

ফাইনাল ম্যাচ নিয়ে বাজার দর উঠলো ইংল্যাণ্ডের পক্ষে। তবু কেউ কেউ পশ্চিম জার্মানীর পক্ষেও রায় দিলেন। তাদের বিশ্বাস বিশ্ব ফুটবলে পশ্চিম জার্মানী এমন একটি দল, যারা স্ট্যামিনায় বিশ্বের সেরা। সে কোন মুহূর্তে তারা খেলার মধ্যে প্রাধান্য ফিরিয়ে আনতে পারে। বিশেষ করে ১৯৫৪ সালে হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে জার্মানীর সাফল্যের কথা আজও কেউ ভুলে যান নি।

খেলার আগে দল গড়া নিয়ে দুই দলই যথেষ্ট চিন্তায় পড়লেন। শোনা গেল ইংল্যাণ্ড ফাইনালে গ্রিভসকে খেলাবে। কিন্তু কার জায়গায় খেলবেন গ্রিভস? তাকে খেলাতে গেলে বসাতে হবে হার্স্টকে। আর যদি হার্স্টকে খেলানো হয় তাহলে বসাতে হয় রজার হাণ্টকে। কিন্তু হাণ্টকে বসানো চলে না। অসাধারণ ফুটবল খেলেছেন হাণ্ট। তার বল কনট্রোল, পাসিং, সুটিং সমস্ত নিখুঁত। সমস্যা শুধু ইংল্যাণ্ডের ছিল না, ছিল রামসের মতো হেলমুট শ্যোনের'ও। তিনি গোলরক্ষক টিল্কেয়োস্কিকের বদলে খেলাতে রাজি ছিলেন শেপ মেয়ারকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য—মেয়র অসুস্থ। তাছাড়া লেফট্ আউট খেলবেন কে? এমারিশ সুস্থ নয়। যদি তিনি সুস্থ না হন তাহলে কি হবে?

শেষ পর্যন্ত হেলমুট শ্যোন দলের কোন পরিবর্তন করলেন না। কেবল স্ট্র্যাটিজি বদলে দিলেন। এই ম্যাচে বেকেনবাউয়ারকে আক্রমণের ভূমিকায় অংশগ্রহণের সুযোগ না দিয়ে, তিনি কেবলমাত্র চার্লটনকে পাহারায় রাখলেন। হেলমুট শ্যোনের মতো একজন যোগ্য মানুষ কেন যে এই নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তা বোঝা যায় নি। কেবল বলা যায় অতিমাত্রায় রক্ষণাত্মক হতে গিয়েই বেকেনবাউয়ারের অভাবে জার্মান আক্রমণ অনেকখানি গুটিয়ে গিয়েছিল। যদি বেকেনবাউয়ারকে পাহারাদার হিসাবে নিযুক্ত না রেখে অন্য ম্যাচগুলির মতো এ্যাটাকিং

মিডফিল্ডার হিসাবে যথেচ্ছার বিচরণ করার সুযোগ দেওয়া হতো তাহলে হয়তো ফলাফল ভিন্ন হতে পারতো। ফাইনালের দিন বিলি শুলজ্‌কে করা হলো সুইপার ব্যাক, ওয়েবের সেণ্টার ব্যাক এবং হলার ও ওভারাথকে রাখা হলো মিডফিল্ডে। সামনে থাকলেন জিলার, এমারিশ ও হেল্ড। জার্মানী যেমন স্ট্র্যাটিজি বদলে ছিল, ঠিক তেমনি ইংল্যাণ্ড কোনরকম খেলোয়াড় না বদলে কেবল তাদের স্থান পরিবর্তন করলো। এলেন বলকে নিয়ে যাওয়া হলো উইংগারে। রামসে জানতেন স্নেলিঞ্জারের মতো ধীর গতির খেলোয়াড়ের পক্ষে বলকে আগলানো সম্ভব হবে না।

খেলা শুরু হলো উত্তেজনার মধ্যে। সূচনায় ইংল্যাণ্ড আদৌ সুবিধা করতে পারলো না। তেরো মিনিটের মাথায় উইলসনের ভুল পাস চলে আসে হলারের কাছে। হলার বল ধরে দু কদম এগিয়ে সরাসরি গোলে শট নিলেন। ব্যাঙ্কসের পক্ষে সেই বার-ঘেঁষা নিচু শট ধরা সম্ভব হলো না। বলটি গোলে প্রবেশ করলো।

গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়া বৃটিশ ফুটবলারেরা মানসিক দুর্বলতার খোলশ ছেড়ে নব উন্মাদনায় গর্জে উঠলো যেন। খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনার জন্য তারা হয়ে উঠলো মরিয়া। এক সময় হার্স্ট গোলের কাছে এগিয়ে আসতেই প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে সেই বিপদ রক্ষা করলেন টিল্কেয়োস্কি। চার্জ করতে গিয়ে হার্স্টের সঙ্গে ধাক্কায় তিনি আহত হলেন। এরপর মাঝ মাঠে ওভারাথ ববিমুরকে কঠিন ভাবে ট্যাকল করলে রেফারি ফাউলের নির্দেশ দিলেন। ফ্রিকিক নিলেন স্বয়ং মুর। চমৎকার ভাবে তিনি যে শটটি নিলেন, তা জার্মান রক্ষণভাগের প্রাচীর টপকে সোজা এসে পড়লো হার্স্টের মাথায়। শূন্যে লাফিয়ে হার্স্ট হেড দিতেই পরাস্ত হলেন টিল্কেয়োস্কি।

গোল শেষ হতেই দু'পক্ষ মরিয়া হয়ে উঠলো। যে ইংল্যাণ্ড প্রথমটায় নিজেদের গুছিয়ে নিতে পাচ্ছিলো না, তারা এবার ম্যাচের ওপর প্রধান্য বিস্তার করলো। বেকেনবাউয়ার চার্লটন্‌কে পাহারা দিতে গিয়ে সারাক্ষণ

নিজের সীমানার মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকলেন। ফলে ওভারাথ, হেল্ড, জিলার কারো পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না বল নিয়ে ইংল্যাণ্ড সীমানার মধ্যে প্রবেশ করা। তবু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়েও হেল্ড ও জিলার ছিদ্র খোঁজার চেষ্টা করতে লাগলেন। বিরতির আগে দুই দলই গোলের সুযোগ নষ্ট করলেন। জিলারের দুরন্ত শট ব্যাঙ্কস মাটিতে শুয়ে পড়ে বাঁচালেন। কিন্তু অপরপক্ষে ইংল্যাণ্ডের হার্স্ট সে সুযোগ পেয়েছিলেন, তা থেকে যে কোন সময় গোল হতে পারতো। তার বাঁ পায়ের শট টিল্কেয়োস্কি কোনরকমে বাঁচালেন। আসলে বাঁচালেন বলার চেয়ে বলা ভাল বলটি তার গায়ে লেগে বাইরে বেরিয়ে যায়।

বিরতি পর্যন্ত আর কোন গোল হলো না। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু মাত্র নামলো আকাশ ভাঙা বৃষ্টি। বৃষ্টির মধ্যেই খেলা চললো দ্রুত গতিতে। অ্যালন বল অসাধারণ বল কণ্ট্রোল দেখালেন। চার্লটনকে বেকেনবাউয়ার একবারও বল ছুঁতে দিলেন না। জিলার—ওভারথহেল্ড এমরিশ সবাই তখন গোলের জন্য মরিয়া। খেলা প্রায় শেষ হওয়ার মুখে —হঠাৎ অঘটন ঘটলো। অপ্রত্যাশিত গোলে চমক ভাঙালো ওয়েমব্লির। চার্লটনের কর্নার টিল্কেয়োস্কি লুফে নিয়ে, বেশ কয়েক বার মাটিতে নাচালেন। তারপর শট না করে, কি ভেবে বলটা তিনি ছুঁড়ে দিলেন গুল্‌জের উদ্দেশ্যে। টিল্কেয়োস্কির ছোঁড়া বলটি এত আস্তে ছিল যে গুল্‌জের কাছে বল গিয়ে পৌঁছালো না। কাছেই ছিলেন হার্স্ট। তিনি ছুটে গিয়ে গোলে শট নিলেন। বল ওয়েবের গায়ে লেগে শূন্যে উঠলো। পিটার্স ছুটে গিয়ে সেই পড়ন্ত বলে ভলি মেরে ইংল্যাণ্ডকে নাটকীয় ভাবে এগিয়ে দিলো ২-১ গোলে। ইংল্যাণ্ড গোল পেয়ে জয়ের জন্য সমস্ত শক্তি উজাড় করে দিলো। এই সময় আর একটি গোল করার অব্যর্থ সুযোগ এলো হার্স্টের সামনে। তিনি একবারে ফাঁকায় বল পেলেন। গোটা ওয়েমব্লি তখন গোলের চিৎকার ডুবে গেছে। চোখ বুজিয়ে ফেলেছেন জার্মান সমর্থকেরা। হঠাৎ সবাইকে অবাক করে হার্স্ট অনুকূল অবস্থায় মধ্যে বল পেয়েও নিজে গোলে শট না করে বলটি বাড়িয়ে

দিলেন ছুটে আসা চার্লটনকে। চার্লটন বল ধরার আগেই তাকে কভার করে ফেললেন গুল্জ। ফলে চার্লটনের শট গোল-পোস্টের অনেক উঁচু দিয়ে ফানুষের মতো উড়ে গেল। এমন একটি সুযোগ ইংল্যাণ্ড নষ্ট করার ফলে মাশুল গুনতে হলো তাদের। খেলা শেষ হতে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র বাকি। জয় যখন ইংল্যাণ্ডের পক্ষে একরকম প্রায় নিশ্চিন্ত, ওয়েমব্লির চারদিকে বাজি ফুটছে—ঠিক তখনই সুইস রেফারি ডিয়েন্সের বাঁশির শব্দ শোনা গেল। চমকে উঠলো সেই কর্কশ বাঁশির শব্দে উপস্থিত তিরানব্বুই হাজার দর্শক। তারা দেখতে পেলেন পেনালটি বক্সের কয়েক-গজ বাইরে থেকে জার্মানদের ফ্রিকিক মারা নির্দেশ দিচ্ছেন রেফারি ডিয়েন্স। শট নিলেন এমারিশ। সামনে ওয়ালের মধ্যে দাঁড়ানো স্নেলিঞ্জারের পিঠে লেগে বল চলে গেল হেল্ডের কাছে। হেল্ড কালবিলম্ব না করে বল বাড়িয়ে দিলেন ওয়েবেরকে। সমস্ত ঘটনাটা এক লহমায় ঘটলো। দেখা গেল ওয়েবের শট ব্যাঙ্কসকে পরাস্ত করে জালে জড়িয়ে গেছে।

গোল'ও হলো—নির্দিষ্ট সময়ের খেলাও হলো শেষ। অতএব রেফারি এবার অতিরিক্ত সময় খেলানোর জন্য নতুন করে বাঁশি বাজালেন।

জার্মানদের অসম্ভব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। ঘামে ভেজা জিলার ভীষণ ভাবে হাঁপাচ্ছেন। মাটিতে বসে পড়েছেন স্নেলিঞ্জার। অতিরিক্ত সময়ের খেলা শুরু হতেই ইংল্যাণ্ড মোক্ষম ভাবে চেপে ধরলো। অ্যালান বল চমৎকার ভাবে স্নেলিঞ্জারকে কাটিয়ে গোলে শট নিলেন। অল্পের জন্য বল পোস্টের ওপর থেকে উড়ে গেল। ইংল্যাণ্ড একতরফা আক্রমণে খেলাকে প্রায় তখন নিজেদের পকেটে পুরে ফেলেছে। মাঠের মধ্যে হারিয়ে গেছেন জার্মান খেলোয়াড়েরা। অ্যালান বল একাই তখন ভেল্কি দেখাচ্ছেন। তার নিখুঁত স্কিলের সামনে জমি ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। স্নেলিঞ্জারকে সহজ ভাবে কাটিয়ে নিতে কোন কষ্ট হলো না অ্যালান-বলের। তিনি বল নিয়ে বেশ কিছুটা ভিতরে ঢুকে চমৎকার থ্রু বাড়ালেন হার্স্টকে। কালক্ষেপ না করে হার্স্ট সেই বলে পা চালালেন।

বল টিক্কেয়োস্কিকে পরাস্ত করে বারের নিচে লাগলো। সামনেই ছিলেন রজার হার্ন্ট। তিনি বারে লাগা বল মাটিতে পড়া মাত্র দু হাত তুলে গোল পাওয়ার আনন্দে নাচতে লাগলেন। টিক্কেয়োস্কি গোল লাইনের ওপর থেকে বলটি ধরলেন বটে, কিন্তু তার আগেই শোনা গেল বাঁশির শব্দ।

প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন জার্মান খেলোয়াড়েরা। তারা বললেন, বলটি বারের নিচে লেগে গোল লাইনের ওপর পড়ে ছিল মাত্র, কিন্তু তা গোল লাইনকে সঠিক ভাবে অতিক্রম করে নি। জার্মানীর খেলোয়াড়েরা প্রতিবাদ করলেও ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়েরা আনন্দে উল্লাস করতে লাগলেন। গোলের সিদ্ধান্ত সুইস রেফারি প্রথমেই গ্রহণ করেন নি। হয়ত তার মনেও কিছুটা সন্দেহ ছিল। সেই কারণে তিনি এগিয়ে গেলেন টাচ্ লাইন বরাবর রুশ ল্যাইন্সম্যান বাখরামোভের দিকে। রুপোলী চুলের রুশ ভদ্রলোক হাতের পতাকা তুলে সংকেত দিলেন বল সেণ্টারে বসাতে। অতএব গোল, ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে ফেটে পড়লেন ইংল্যাণ্ড সমর্থকেরা।

এই গোলের সিদ্ধান্ত নিয়ে পশ্চিম জার্মানী আজও খুশী হতে পারে নি। এখনও দুঃস্বপ্নের মতো সেদিনের সেই স্মৃতি বুকের গভীরে যন্ত্রণায় কুরে কুরে খায়। হার্স্টের দেওয়া এই গোলের ছবি তুলে, তারা বিশ্বময় ঘুরে বেড়িয়েছে। সাদা পর্দায় ফিল্মের ছবি দেখিয়ে তারা প্রশ্ন করেছেন—"লুক-এ্যাট্-দ্যা পিক্চার, ইজ ইট এ গোল?" সত্যি কি গোল হয়েছিল?

কলঙ্কের কালিমা কিন্তু ফাইনাল ম্যাচ নিয়েই শেষ হয়ে যায় নি—পরে ঘটেছিল বিশ্বকাপে সর্বাপেক্ষা আলোড়ন সৃষ্টিকারী আর একটি রহস্যময় ঘটনা। এই কঠিন প্রশ্নের জবাব আজও মেলেনি। আজও রহস্যময় হয়ে আছে ইংল্যাণ্ডের দেওয়া তৃতীয় গোলটি। এরপরেও হার্স্ট আর একটি গোল দিয়ে ব্যবধান বিড়িয়ে দিলেন বটে, তবে সে গোল সম্পর্কে জার্মানরা সম্পূর্ণভাবে উদীড়তে ছিল। তাদের মনোবল মূলতঃ ভেঙে যায় হার্স্টের দেওয়া তৃতীয়

গোলের সিদ্ধান্তে। এই গোলের সিদ্ধান্তেই মূলতঃ বিশ্বকাপের ভাগ্য সেদিন নির্ধারিত হয়েছিল।

ফাইনালে ৪-২ গোলে জার্মানকে হারিয়ে ইংল্যাণ্ড জুলেরিমে জয় করলেও, এই জয় তাদের গরিমার শ্রীবৃদ্ধি করতে পারে নি। বরং বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে নানাভাবে সমালোচিত হতে হয়েছিল। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ দেশগুলির অনেকেই এবং ল্যাটিন আমেরিকার সেরা তিনটি দেশ ইংল্যাণ্ডকে কঠিনভাবে সমালোচনা করতে কসুর করে নি। তাদের ধারণায় স্বদেশের প্রশ্রয়ে, রামসের ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকরী করার জন্যই ইংলিশ কর্তৃপক্ষ ও সমর্থকেরা উঠে পড়ে লেগেছিলেন। কোনরকম নোংরামো করতে তারা কুণ্ঠিত হননি। বিশ্বকাপ জয়ের জন্য ইংল্যাণ্ডের মতো নির্লজ্জ আচরণ করতে আর কোন দেশকে এমন সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা যায় নি।

কলঙ্কের কালিমা এখানেই থেমে যায় নি, বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পরেও ইংল্যাণ্ডকে মর্মান্তিক সমালোচনার মুখে পড়তে হলো। যে বিশ্বকাপ—'জুলেরিমে' নিয়ে বিশ্ব ফুটবলের লড়াই, সেই দুর্লভ 'সোনার পরী' রহস্যময় ভাবে উধাও হলো ইংল্যাণ্ডের এক প্রদর্শনী থেকে।

২০শে মার্চ তারিখে জনবহুল এই প্রদর্শনী থেকে হঠাৎ নাটকীয় ভাবে উধাও হয়ে যায় সোনার পরী। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। একেই ইংল্যাণ্ডের বিশ্বকাপ জয় নিয়ে সকলের মনে চাপা অসন্তোষ ছিল, তার ওপর এই ঘটনা কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিলো বৃটিশ রাজতন্ত্রের ওপর। ঐতিহ্যময় আভিজাত্যের গরিমা ভূ-লুণ্ঠিত হওয়ায় বৃটিশ কর্তৃপক্ষ নিখোঁজ জুলেরিমে উদ্ধারের দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন দেশের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা বিভাগের হাতে। কিন্তু তাতেও কোন কাজ হলো না। শেষে জাতীয় ঐতিহ্য গরিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বৃটিশ সরকার ছ হাজার পাউণ্ড মূল্যের পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করলেন।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, পিকলস নামের একটি কুকুর শেষ পর্যন্ত এই দুর্লভ

ট্রফিটি নরউডের একটি বাড়ির বাগান থেকে উদ্ধার করে। এর ফলে রক্ষা পায় বৃটিশ জাতের কৌলিন্য।

সমস্ত ঘটনার টানা-পোড়েনের ফলে ছেষট্টির বিশ্বকাপ নানাদিক দিয়ে ইংল্যাণ্ডের কাছে কলঙ্কের হয়ে আছে, যা শত চেষ্টা করেও ইংল্যাণ্ড কর্তৃপক্ষ আজও পারেন নি বিশ্ববাসীর মন থেকে তাদের সন্দেহময় ধারণাকে মুছে ফেলতে।

ইংল্যাণ্ডের আসর শেষ হলো। এই আসরে মোট গোল সংখ্যা দাঁড়ালো উননব্বুইটি। এই গোলের মধ্যে পর্তুগালের গোল সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি—সাতাশেটি। পর্তুগাল শুধু দল হিসাবে বেশি গোল দেয় নি, সেই সঙ্গে তাদের দলের সেরা খেলোয়াড় ইউসোবিও পেয়েছিলেন সেরা গোল দাতার সম্মান। ইংল্যাণ্ডের হার্স্ট বিশ্বের প্রথম ফরোয়ার্ড যিনি ফাইনালে মোট তিনটি গোল দিয়ে রের্কড করলেন।

ফাইনালে উপস্থিত ছিল মোট সাতানব্বুই হাজার দর্শক এবং সর্বনিম্ন দর্শক উপস্থিত ছিলো চিলি বনাম উত্তর কোরিয়ায় খেলায় মাত্র তেরো হাজার।

অষ্টম বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষিত হলো মেকসিকো বিশ্বকাপের কথা। ঠিক হয় আগামী নবম বিশ্বকাপ আসর ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত হবে মেক্সিকোতে।

ঐতিহাসিক মেক্সিকো (১৯৭০)

বিশ্ব ফুটবল ইতিহাসে মেক্সিকোর আসর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই আসরে বিশ্ব ফুটবলের প্রথম অধ্যায়ের শেষ হয়। দীর্ঘ চল্লিশ বছরেব মধ্যে —১৯৭০ সালের মতো এমন ইতিহাস সাক্ষী ঘটনা আর কোথাও ঘটে নি। এই আসরে ল্যাটিন-আমেরিকার শ্রেষ্ঠ শক্তি ব্রাজিল ইউরোপের চ্যাপিয়ান ইতালিকে সম্মুখ সমরে পদানত করে বিশ্বকাপ জয় করে। শুধু তারা এই আসরে শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব অর্জন করে নি, সেই সঙ্গে চিরকালের জন্য জয় করে নিয়ে গেছে 'জুলেরিমে' বা 'সোনার পরী'।

মেকসিকোয় আসর শুরু হওয়ার মুখে বিস্তর প্রশ্ন দেখা গিয়েছিল, সাড়ে সাত হাজার ফিট উঁচুতে অবস্থিত মেকসিকোর আবহাওয়া নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন বিদগ্ধজনেরা, তাঁরা স্থান নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে কঠিন সমালোচনা করে বললেন, মেকসিকোতে কিছুতেই ভাল ফুটবল অনুষ্ঠিত হবে না। অত উঁচুতে স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া যেমন কষ্টকর, তেমনি অসহ্য এখানকার উষ্ণ আবহাওয়া।

মেকসিকোতে যাতে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত না হতে পারে তার জন্য নানাদিক থেকে চক্রান্ত চলেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্ত আলোচনাকে ব্যর্থ করে কার্যকরী সমিতি নিজেদের সিদ্ধান্ত বহাল রাখলেন।

অস্বীকার করার উপায় নেই মেকসিকোর আবহাওয়া মোটেই সুখকর ছিল না। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে বিশ্বকাপ কমিটি খেলাগুলির সময় দুপুরের দিকেই নির্বাচিত করেছিলেন, যাকে বলে গোদের ওপর বিষ-ফোঁড়া।

১৯৬৮ সালে মেকসিকোতে ওলিম্পিক আসরের সময় এই একই সমস্যা দেখা গিয়েছিল। এর জন্য অনেকে বহু আগে এখানে এসে পৌঁছেছিলেন, যাতে আবহাওয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। কিন্তু এতে খরচ অনেক বেশী—যা অনেক দেশের পক্ষে বহন করা কষ্টসাধ্য ছিল।

মেকসিকোর আবহাওয়া এবং তার পাহাড়ি পরিবেশ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা সমালোচনা বেশী করেছিলেন ইউরোপের সাংবাদিকেরা। তারা বললেন, 'মেকসিকোয় ভাল ফুটবল কিছুতেই সম্ভব হবে না বরং এখানে ফুটবল ঘিরে হিংসাত্মক ঘটনাই বেশী ঘটবে।' কিন্তু কার্যতঃ তা হয় নি। বরং সত্তরের আসরে বিশ্বের মানুষ বেশ কিছু শ্রেষ্ঠ ফুটবলের নিদর্শন পেলেন। এই আসরে ব্রাজিল শুধু ঐতিহাসিক জয় পায় নি সেই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছিল শতাব্দির সেরা ফুটবল ম্যাচ।

মেকসিকোর আসরের কে চ্যাম্পিয়ান হবে তা নিয়ে নানা মুনি নানা

মন্তব্য রেখেছিলেন। তবে সকলের কৌতূহলী দৃষ্টি ছিল গতবারের বিজয়ী ইংল্যাণ্ডের ওপর। ১৯৬৭ সালে দাম্ভিক রামসে নিজের দেশের মাটিতে ফুটবল অনুষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করে "জুলেরিমে কাপ" তুলে দিয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডের হাতে। পেয়েছিলেন 'স্যার' উপাধি। সেই কারণে মেকসিকো আসরে প্রত্যেকের জিজ্ঞাসা ছিল ইংল্যাণ্ড কি তাদের ঐতিহ্য বজায় রাখতে পারবে? পারবে কি বিগত সম্মানকে রক্ষা করতে?

ইংল্যাণ্ডের জয়ের ব্যাপারে রামসের আত্মবিশ্বাস ছিল ষোলো আনা। তিনি মেকসিকোয় দল নিয়ে পৌঁছবার পর আত্ম-অহমিকার বশে বেশ কিছু বিরূপ মন্তব্য করলেন। তার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন মেকসিকান সমর্থকেরা। ফলে বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগেই ইংল্যাণ্ডকে সমালোচনায় মুখে পড়তে হলো। তাদের দেখলেই মেকসিকান দর্শকেরা বিদ্রূপ করতেন। এই প্রতিক্রিয়া আরও চরমে উঠলো ইংল্যাণ্ড বেগোটায় পৌঁছবার পর। দলের সেরা খেলোয়াড় এবং অধিনায়ক ববি মুরের বিরুদ্ধে আনা হলো চুরির এক মিথ্যে অভিযোগ। এই অভিযোগে বলা হলো মুর নাকি স্থানীয় একটি দোকান থেকে ব্রেসলেট চুরি করেছেন। তাকে গ্রেপ্তার করা হলো। এই ঘটনা ইংল্যাণ্ড দলের ওপর তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো। মুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ মিথ্যে প্রমাণিত হলেও খেলোয়াড়দের মানসিক উৎসাহ নষ্ট হল। দল হিসাবে ইংল্যাণ্ড কিন্তু সেবারে মোটেই কমজোরি ছিল না। বরং তারা বিশ্বকাপে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েই এসেছিলো। দলে ছিলেন বিগত চ্যাম্পিয়ান দলের প্রায় প্রত্যেকটি খেলোয়াড়—সেই সঙ্গে আনা হয়েছিল নিউটন, কুপার, ফ্রান্সিস লি'র মতো প্রতিভাবানদের।

ইংল্যাণ্ডের চেয়েও ব্রাজিল সম্পর্কে মেকসিকো আসরে উৎসাহ ছিল বেশী। ১৯৬৬ সালে ব্যর্থতার পর ব্রাজিল নিজেদের আরো বেশী শক্তিশালী করে তোলে, দলের দায়িত্ব দেওয়া হয় সালধানার ওপর।

সালধানা ব্রাজিলের একজন বিতর্কিত পুরুষ। ১৯৬২ সাল থেকে সালধানা ব্রাজিল ফুটবল সম্পর্কে উগ্র মতামত প্রকাশ করছিলেন। ১৯৬৬ সালে ব্রাজিল ইংল্যাণ্ডে ব্যর্থ হলে এই সালধানাই সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেন। ফলে ব্রাজিল কর্তৃপক্ষ সত্তরের সাফল্যের কথা চিন্তা করেই বিতর্কিত পুরুষ সালধানার হাতে তুলে দিয়েছিলেন দলের দায়-দায়িত্ব। দলের দায়িত্ব হাতে নিয়ে সালধানা ব্রাজিল ফুটবলের নিজস্ব ধারা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন। ব্রাজিলিয়ানরা যে আক্রমণাত্মক খেলাকে ভুলে গিয়েছিল, সালধানার চেষ্টায় তা আবার পুনর্জীবিত হল। ব্রাজিল খেলোয়াড়েরা খুঁজে পেলেন নিজস্ব ভাবধারাকে। আগেই বলেছি সালধানা একজন বিতর্কিত মানুষ। তিনি ছাত্রাবস্থায় ছিলেন একজন পাকা কমুনিস্ট। স্পষ্ট বক্তা এবং বৈপ্লবিক চিন্তধারার ক্ষেত্রে তার কোনো জুড়ি ছিল না। তার চালচলন এবং মেজাজের সঙ্গে মিল ছিল ইতালির ভিক্টর পোজোর। ১৯৬৯ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী সালধানা জাতীয় দলের ম্যানেজার পদ গ্রহণ করলেন। এই গুরুদায়িত্ব হাতে নিয়েই তিনি দলকে 'এ' ও 'বি' হুটি দলে ভাগ করলেন। কঠিন অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে সালধানা ব্রাজিলকে একবছরের মধ্যেই পৌছে দিয়েছিলেন কোয়ালিফাইং গ্রুপে। ১৯৬৯ সালে সালধানার তৈরি দল মারকানায় ইংল্যাণ্ডকে হারালো ২-১ গোলে।

আত্মবিশ্বাসী সালধানার আত্মঅহঙ্কার ছিল অত্যন্ত বেশী। তিনি নিজে যা বুঝতেন তাই করতেন। আর সেই আত্মাভিমানের প্রশ্রয়ে তিনি কিছুদিনের মধ্যেই এমন কিছু কাজ করে বসলেন যা দেখে ব্রাজিল কর্তৃপক্ষ শিউরে উঠলেন। দেখা গেল কোনরকম কারণ না দর্শিয়ে তিনি দল থেকে বাদ দিলেন চারজন ডিফেনডার সহ হুজন গোলরক্ষককেই। কিছুদিনের মধ্যে তিনি শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে ক্যাম্প থেকে ফেরত পাঠালেন টনিলো ও স্কালাকে। এইসময় টোস্টাও সম্পর্কে সবাই সন্দিহান হয়ে পড়লেন। প্র্যাকটিস গেমে বল

চোখে লাগায় তাকে বেশ কিছুদিন ভুগতে হলো। বোঝা গেল জাতীয় দলে আহত টোস্টাওকে পুরোপুরি পাওয়া যাবে না। এরপর সালধানা অপ্রত্যাশিত ভাবে পেলের ফর্ম সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে এমন এক মন্তব্য করলেন যা দেখেশুনে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হলেন তার হাত থেকে জাতীয় ম্যানেজারশীপের পদ কেড়ে নিতে। যখন এমন একটা কাণ্ড ঘটলো তখন বিশ্বকাপের পুল লীগের খেলা শুরু হতে মাত্র তিনমাস বাকি। এই অবস্থায় জাগালোর ওপর দায়িত্ব দেওয়া হলো। ব্রাজিল ফুটবলে জাগালো একজন ভাগ্যবান পুরুষ। ১৯৫৮ ও ১৯৬২ সালে তিনি ব্রাজিলের চ্যাম্পিয়ান দলের লেফট্ উইংগার ছিলেন। তিনি দু-দুবারই দলে আসেন বদলি খেলোয়াড় হিসাবে। কোচ হিসাবেও এবার তার বদলি নির্বাচন। জাগালো দল হাতে নিয়ে স্ট্র্যাটিজির বিশেষ কোন পরিবর্তন করলেন না। তিনি কেবল খেলোয়াড়দের উসকে দিয়েছিলেন মাত্র। জাগালোর দলে ফিরিয়ে আনা হলো সালধনার বাতিল করা গোলরক্ষক ফেলিকসকে। যে আহত টোস্টাও সম্পর্কে সন্দেহ ছিল সেই তিনিও অল্পদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে দলে ফিরে এলেন। পেলে ও টোস্টাও'র খেলার ধরন ছিল প্রায় একই রকম। দুজনেই নিচে নেমে বল ধরে উপরে উঠে আসেন। এই ক্ষেত্রে জাগালো টোস্টাওকে ধরন বদলাতে বাধ্য করলেন। তিনি বললেন—"টোস্টাও বয়সে নবীন, সে খেলার ছক চেষ্টা করলে বদলাতে পারে, যা এই বয়সে পেলের পক্ষে সম্ভব নয়।"

অনেকেই ভেবেছিলেন জাগালো হয়তো ভুল করলেন। টোস্টাও'র মতো খেলোয়াড়ের পদ্ধতি বদলালে তাকে দিয়ে হয়তো সুফল পাওয়া যাবে না। হয়ত এর জন্য ব্রাজিলকে যথেষ্ট ভুগতে হবে। কিন্তু কার্যতঃ তা হয় নি। বরং নতুন ছকে টোস্টাও নিজেকে অসম্ভব মানিয়ে নিয়েছিলেন। তার স্বাভাবিক ক্রীড়া-বিন্যাস এতটুকু নষ্ট হয় নি। সেই সঙ্গে ব্রাজিলের আক্রমণ ভাগকে মদত যুগিয়েছিলেন রিভালিনো,

জিয়ারজিনো, গরসনের মতো খেলোয়াড়েরা। প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে ব্রাজিল দল এসেছিল মেকসিকোয়। তারা মেকসিকোয় পৌঁছেই একটি বিজয়ী দলের মতো আচরণ করতে লাগলেন। জনগণের মধ্যে বিতরণ করলেন ব্রাজিলের পতাকা, ব্যাজ। মিশলেন স্থানীয় মানুষের সঙ্গে। দেখা গেল ইংল্যাণ্ড দল মেকসিকোয় পৌঁছবার পর যতটা অপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, ঠিক ততোটাই আন্তরিক জনসমর্থন পেয়েছিল ব্রাজিলের খেলোয়াড়েরা।

সত্তরের আসরে সর্বাগ্রে ফেবারিট ছিল ইতালি। তারা এই আসরে দীর্ঘদিন বাদে যেন লড়াই করার জন্য এসেছিল। ইংল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে কোরিয়ানদের কাছে পরাজয় ইতালিকে গভীর ভাবে ব্যথিত করেছিল। এই পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল ইতালির সর্বত্র। তারা নতুন করে দল গঠন করলেন। দলে পেলেন রিভার মতো প্রতিভা, লুইগি রিভা ইতালি দলের একমাত্র ভরসা। তার পায়ে আছে গোলের গ্যারান্টি। ইউরোপীয় ফুটবলে তার নামে সোনার বৃষ্টি ঝরে। এছাড়া ইতালি দলে ছিলেন ডোমেনঘিঘি বনিনসেগনা, ম্যাজোলা, ফ্যাচেত্তির মতো ফুটবলার।

গতবারের ফাইনালে ব্যর্থ পশ্চিম জার্মানীও শক্তির বিচারে কম গেল না। মিডফিল্ডে অভিজ্ঞ ওভারাথকে দেখা গেল। দেখা গেল বিশ্বকাপের বহু পরিচিত ফুটবলার বর্ষীয়ান উয়ে জিলারকে। এই সঙ্গে দলে এলেন গোলম্যাসিন গর্ডন মুলার। অসাধারণ ফরোয়ার্ড এই গর্ডন মুলার। ছোটখাটো দেখতে হলে কি হবে, শরীরে ছিল অসম্ভব কষ। লড়াই করার মতো যেমন শক্তি, তেমনি তার স্ট্যামিনা। এছাড়া মানুষটার বলের ওপর ছিল অভাবনীয় দখল ক্ষমতা। গোলে শট নেওয়ার ব্যাপারে তার পায়ে যেন জাদু আছে। পেনালটি বক্সের মধ্যে মুলারের মতো ঠাণ্ডা মাথার কুশলী ফরোয়ার্ড বিশ্বফুটবলে বিরল বললে মনে হয় ভুল বলা হয় না। দর্শনীয় ভঙ্গিতে তিনি বহু ম্যাচে বহু অসাধারণ গোল করেছেন। সত্তরের আসরে হেলমুট

শ্যেন তার গতবারের স্ট্র্যাটিজি কিছুটা বদল করেছিলেন। বিশেষ করে এবারের আসরে তিনি বেকনবাউয়ার ওপর কোন চাপিয়ে দেওয়া নীতি প্রয়োগ করলেন না। সহজ স্বভাবে তিনি খেলেছিলেন একজন এট্যাকিং-মিডফিল্ডার হিসাবে। ফলে মেকসিকোয় বেকেনবাউয়ারের পক্ষে সেরা ম্যাচ খেলা সম্ভব হয়েছিল।

পুল লীগের খেলা শুরু হওয়ার আগে গণক-যন্ত্রের অভিমতে ইতালি ছিল সম্ভাব্য বিজয়ী দল—সেই কারণে ইতালির পক্ষেই বাজার দল ছিল তুঙ্গে।

প্রাথমিক পর্বের খেলার মধ্য দিয়ে মোট চোদ্দটি দেশ চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলার অনুমতি পায়—সেই সঙ্গে যুক্ত হয় গতবারের বিজয়ী ইংল্যাণ্ড এবং আয়োজনকারী দেশ মেকসিকো অর্থাৎ মোট ষলোটি দেশ নিয়ে তৈরি হয় পুল লীগের তালিকা। প্রচলিত নিয়মে ষোলটি দলকে চারটি পুলে ভাগ করা হয়। এবারের আসরে তিনটি নতুন দল মূল পর্যায়ে খেলার অনুমতি পেয়েছিল। ই. এল স্যালভাদর, মরক্কো এবং ইজরায়েল। এক নম্বর পুলে তৈরি হয়—রাশিয়া, মেকসিকো, স্যালভাদর, এবং বেলজিয়ামকে নিয়ে। দুই নম্বর পুলে থাকে—ইতালি, উরুগুয়ে, সুইডেন, ইজরায়েল। তিন নম্বর পুলে—ব্রাজিল, ইংল্যাণ্ড, রুমানিয়া এবং চেকোশ্লাভিয়া এবং চার নম্বর পুলে—পশ্চিম জার্মানী, পেরু, বুলগেরিয়া, এবং মরক্কো।

৩০শে মে বেলা সাড়ে দশটায় আজটেক স্টেডিয়ামে শুরু হলো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। বর্ণাঢ্য সমারোহে উৎসব পালিত হলো। থরে থরে বেলুন উড়লো আকাশে। ব্যাণ্ড বাজল। প্যারেড হলো। উড়ানো হলো শ্বেত কবুতর। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন মেকসিকোর প্রেসিডেন্ট গুস্তাভ দিরাজ আরদাজ। পরে ভাষণ দিলেন ফিফার সভাপতি স্যার স্ট্যানলী রাউস।

প্রাথমিক কর্মসূচীর সমাপ্তির পর বেলা বারোটায় অনুষ্ঠিত হলো পুল লীগের প্রথম খেলা। উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হলো রাশিয়া ও মেকসিকোর মধ্যে। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে অত্যন্ত বিরক্তিকর খেলা হলো। খেলা দেখে বোঝা গেল কোনো দলই ম্যাচ হারাতে রাজি নয়। রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলার সুবাদে কোন পক্ষই গোল পেল না। অত্যন্ত বিরক্তিকর ম্যাচটি শেষ হলো গোলশূন্য ভাবে।

এই গ্রুপের পরের খেলায় নবাগত স্যালভাদর দলকে শোচনীয় ভাবে বিধ্বস্ত করলো বেলজিয়াম। বেলজিয়ামের পক্ষে দুটি গোল এলো ভ্যান মোয়েরের শট থেকে ও একটি গোল পেলেন ল্যাম্বার্ট।

বেলজিয়াম প্রথম খেলায় ৩-০ গোলে জয় পেলেও, রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে তারা দাঁড়াতে পারলো না। এই ম্যাচে সোভিয়েত খেলোয়াড়েরা অসাধারণ ফুটবলের পরিচয় দিলেন। একতরফা ফুটবল খেলে রাশিয়া জয় পেলো ৪-১ গোলে। রুশ দলের চারটি গোলের মধ্যে দুটি গোল দিলেন বাইশোভেৎস এবং একটি করে গোল দিলেন আশাভিয়ানি এবং খেমলেটিনিস্কি। বেলজিয়ামের পক্ষে একটি মাত্র গোল দিলেন গত ম্যাচের গোলদাতা ল্যাম্বার্ট।

মেকসিকো দলের সঙ্গে স্যালভাদর দলের খেলাটি নিয়ে অসন্তোষ দেখা গেল। নবাগত স্যালভাদর দারুণ খেলেছিল। প্রথম দিকে কিছুতেই তাদের বাগে আনতে পারছিলো না মেকসিকানরা। প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে হঠাৎ ভুল করলেন ইউনাইটেড আরব রিপাবলিকের রেফারি হাসান কানডিল। তিনি প্রথমে স্যালভাদর দলের পক্ষে ফ্রিকিক দিয়েই, পরে আবার দৃষ্টিকটুভাবে সিদ্ধান্ত বদলে ফ্রিকিকের নির্দেশ দিলেন মেকসিকোর পক্ষে। রেফারির এই সিদ্ধান্তে মনক্ষুণ্ণ স্যালভাদর খেলোয়াড়েরা প্রতিবাদ করলেন রেফারির কাছে। রেফারি তাদের প্রতিবাদে কর্ণপাত না করে খেলা চালাবার নির্দেশ দিলেন। এর ফলে প্রবল বাক-বিতণ্ডার মধ্যে মেকসিকান দল বিনা বাধায় ফ্রিকিক থেকে প্রথম গোলটি দেয়।

এই গোলের ফলে স্যালভাদর দলের মানসিক উৎসাহ নষ্ট হয়ে যায়। তাদের মানসিক নিরুৎসাহের সুযোগ নিয়ে মেকসিকো দল অতি সহজে ৪-০ গোলে ম্যাচ জিতে যায়।

পরের ম্যাচেও বেলজিয়াম দলের বিরুদ্ধে মেকসিকো দল জয় পেল রেফারির বিতর্কিত সিদ্ধান্তের ফলে। অহেতুক একটি পেনালটির নির্দেশ দিলেন রেফারি। এই পেনালটি যে রেফারি কেন দিয়েছিলেন তা ঠিক বোঝা গেল না। বেলজিয়ামের খেলোয়াড়েরা প্রতিবাদ করেও ব্যর্থ হলেন। পেনালটি থেকে গোল দিলেন গুস্তাভ পেনা। এই জয়ের ফলে মেকসিকো দল অতিসহজে উঠে আসে কোয়ার্টার ফাইনালে। এই ম্যাচের আগে রাশিয়া ২-০ গোলে স্যালভাদরকে হারিয়ে আগেই উঠেছিল কোয়ার্টার ফাইনালে। এক নম্বর পুলের ফলাফল বিচারে রাশিয়া হলো প্রথম। দ্বিতীয় স্থান পেলো মেকসিকো।

এক নম্বর পুল ঃ

রাশিয়া	৩—২—১—০—৬—১—৫
মেকসিকো	৩—২—১—০—৫—০—৫
বেলজিয়াম	৩—১—০—২—৪—৫—২
স্যালভাদর	৩—০—০—৩—০—৯—০

আশাহত ইতালি

দুই নম্বর পুলে ইতালিকে নিয়ে কারো মনে কোনরকম সন্দেহ ছিল না। কিন্তু খেলা শুরু হওয়ার পর ইতালিয়ানরা নিজেদের সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারলো না। বরং তাদের অনেকখানি ম্লান দেখালো।

এই পুলের প্রথম খেলায় উরুগুয়ে অতি সহজে ২-০ গোলে ম্যাচ হারালো ইজরায়েলকে। সুইডেনের বিরুদ্ধে ইতালির খেলাটি ছিল

উত্তেজনাময়। এই ম্যাচে জয় লাভ করার জন্য প্রচণ্ড খাটতে হলো ইতালি দলকে। ডোমেনঘিঘির একমাত্র গোলে কোনরকমে সম্মান বাঁচালো ইতালি।

পরের ম্যাচেও ইতালিয়ানরা সুবিধা করতে পারে নি। রক্ষণাত্মক নীতিতে খেলার ফলে ম্যাচটি হলো অত্যন্ত বিরক্তিকর। উরুগুয়ের লক্ষ্য ছিল কোন রকমে গোল না খাওয়া। ফলে খেলার মধ্যে কোন সৌন্দর্য ধরা পড়লো না। ম্যাচটি শেষ হলো গোল শূন্য ভাবে।

এই পুলের সেরা খেলা হলো সুইডেন বনাম ইজরায়েলের মধ্যে। দুই পক্ষই প্রচণ্ড লড়াই করলো। এই ম্যাচে সুইডেনের জয়ের ব্যাপারে কারো মনে কোন প্রশ্ন ছিল না। সুইডেন কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার ব্যাপারে একরকম প্রায় নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু তাদের সেই স্বপ্নকে মুছে দিল ইজরায়েল। প্রথম গোল দিয়ে সুইডেন এগিয়ে গেলেও এই ব্যবধান ধরে রাখতে পারলো না। ইজরায়েলের সিপগলার দর্শনীয় গোল করে খেলায় সমতা নিয়ে এলেন। এরপর সুইডেন হাজার চেষ্টা করেও কোন গোল পেল না। ফলে অপ্রত্যাশিত ফলাফলে শেষ হলো ম্যাচ।

পরের ম্যাচে সুইডেন দুরন্ত খেলে পয়েন্ট ছিনিয়ে নিলো উরুগুয়ের কাছ থেকে। সুইডেনের গ্রানের দেওয়া গোলে ম্যাচ হারালো উরুগুয়ে। এত করেও কিন্তু সুইডেন তার স্বপ্ন চরিতার্থ করতে পারলো না। গোল পার্থক্যে তারা ছিটকে গেল মূল আসর থেকে। শেষ ম্যাচে ইজরায়েল আবার প্রচণ্ড লড়াই করলো ইতালির সঙ্গে। এই ম্যাচেও ইতালি ক্রীড়ানৈপুণ্যের জৌলুস ধরে রাখতে পারলো না। ফলে গোলশূন্য ভাবে ম্যাচটি শেষ হলো। এই পুলে ইজরায়েলের খেলা সকলের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিল। খেলার ফলাফল বিচারে ইতালি হলো প্রথম। গোল এ্যাভারেজে দ্বিতীয় হলো উরুগুয়ে।

পুল দুই ঃ

ইতালি	৩—১—২—০—১—০—৪
উরুগুয়ে	৩—১—১—১—২—১—৩
সুইডেন	৩—১—১—১—২—২—৩
ইজরায়েল	৩—০—২—১—৩—১—১

এই পুলে অধিকাংশ খেলায় কোন দলই খুব একটা বেশী গোল করতে পারে নি। ফলে বেশী গোল সংখ্যা দেখা গেল না। ইতালি পুল লীগে প্রথম স্থান পাওয়া সত্ত্বেও তারা গোল পেলো মাত্র একটি। উরুগুয়ের দুটি।

ইংল্যাণ্ড মনোবল হারায় নি

বেগোটায় ব্রেসলেট চুরির ঘটনা যে ইংলিশ খেলোয়াড়দের মনের ওপর বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে নি, তা পরিষ্কার বোঝা গেল পুল লীগের খেলা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। মিথ্যে অভিযোগের প্রধান আসামী ববিমুরকে লীগের প্রতিটি খেলায় স্বাভাবিক ভাবে খেলতে দেখা গেল। মুর ইংলিশ ফুটবলের একজন সেরা সম্ভ্রান্ত ফুটবলার। তার খেলার মধ্যে মানসিক ভারসাম্যের কোন অভাব দেখা গেল না। বরং অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে প্রতিটি ম্যাচে মুরকে প্রতিকুল পরিবেশের মধ্যে সহজ আত্মপ্রত্যয়ে বল নিয়ে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল। মেকসিকোয় ইংল্যাণ্ডের জন-সমর্থন ছিল না। তবু তার মধ্যে ইংলিশ খেলোয়াড়েরা কঠিন মনোবলের পরিচয় দিলেন।

গতবারের চ্যাম্পিয়ান দলের বহু পরিচিত মুখকেই এবারের আসরেও দেখা গেল। ববিমুরের মতো সেরা খেলা খেললেন ববিচার্লটন, জিওফ হার্স্ট। এছাড়া টেরি কুপার ও মুলারির খেলা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

গুয়াদালাজারায় ইংল্যাণ্ডের প্রথম খেলা পড়লো রুমানিয়ার সঙ্গে। এই ম্যাচে স্টেডিয়ামের অধিকাংশ দর্শক ছিলেন ইংল্যাণ্ড বিরোধী। রুমানিয়া প্রথম থেকেই ফাউল করে খেলা শুরু করেছিল। বিশেষ করে রুমানিয়ার লেফট ব্যাক মোকাষু অত্যন্ত নৃশংসভাবে ফাউল আরম্ভ করেন। ছুটি ক্ষেত্রে তার অপরাধ ছিল অমার্জনীয়। কিন্তু বেলজিয়াম রেফারি লোরাক্স সেদিকে ফিরেও তাকালেন না। হার্স্ট এবং বেল আঘাত পেয়ে খোঁড়াচ্ছিলেন। ছুপুরের কড়া রোদে ইংলিশ ফুটবলারদের লড়াই করতে যে বেশ কষ্ট হচ্ছিল সেটা অস্বীকার করার কারো উপায় ছিল না। তবু তারা সমস্ত কষ্টকে মেনে নেওয়ায় জয় পেলো দ্বিতীয়ার্ধে। গোল দিলেন ছেষট্টির বিতর্কিত পুরুষ—জিওফ হার্স্ট। তিনি কুপারের কাছ থেকে বল পেয়ে বাঁ পায়ের জোরালো শটে এগিয়ে দিলেন ইংল্যাণ্ডকে। শুধু ওই একটি মাত্র গোলেই প্রথম ম্যাচে জয়ের মুখ দেখতে পেল ইংল্যাণ্ড।

ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে একই পুলে ছিল ব্রাজিল। তারা খেলা শুরু করলো অত্যন্ত খোশ মেজাজে। চেকোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে অভিজ্ঞ পেলে গোটা দলকে প্রধান শিক্ষকের মতো খেলালেন। তার সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে দলবদ্ধ ফুটবল খেলালেন রিভালিনো, জিয়ারজিনো, গারসন। এই ম্যাচে ব্রাজিল জয় পেলেও তাদের আক্রমণ ভাগ বিগত দিনের মতো সুসজ্যবদ্ধ বলে মনে হলো না। চেক দলের রক্ষণভাগের ছুর্বলতার সুযোগ নিয়েই জয় পেল ব্রাজিল। এছাড়া চেক দলের স্ট্র্যাটিজি জয়ের উপযোগী ছিল না। তারা সব সময় পিছিয়ে খেলার ফলে মাঝ মাঠ প্রায় সারাক্ষণ ব্রাজিলের দখলেই ছিল।

চেকেরা প্রথম গোল দিয়ে এগিয়ে যায়। এই গোল দেওয়াই তাদের কাল হয়েছিল। এই ব্যবধান অল্পক্ষণের মধ্যেই মুছে দিলেন রিভালিনো। তার কোনাকুনি ফ্রিকিক শট চমৎকার সোয়ার্ভ করে গোলে প্রবেশ করলো। এই গোলের পরই ব্রাজিল স্বমূর্তি ধারণ

করে। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূর থেকে গারসনের উঁচু সেন্টারকে চকিতে বুকে দিয়ে নামিয়ে পেলে যে ভলিটি মারলেন তা ধরার সাধ্য হলো না চেক গোল রক্ষকের পক্ষে। বিরতির আগেই এগিয়ে গেল ২-১ গোলে। বিরতির পর চেকদল কর্ণার থেকে একটি গোলের সুযোগ পেয়েও বঞ্চিত হল। এরপর তৃতীয় গোল দিলেন জিয়ারজিনো। পেলের থ্রু পাস বাজপাখির মতো ছুটে গিয়ে তিনি গোলে শট করেছিলেন। এই গোলটি সম্পর্কে অনেকেই অবশ্য সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন, জিয়ারজিনো নাকি অফসাইডে ছিলেন। কিন্তু রেফারি বা লাইন্সম্যান কেউই তা স্বীকার করেন নি। ব্রাজিলের শেষ গোলটি ছিল দর্শনীয়। এই বলটি জিয়ারজিনো অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে ধরে মাঠের এমন একটা দুরূহ এ্যাঙ্গেলে ছুটে যান যে কেউ বুঝতে পারে নি, ওই অবস্থায় শট করে গোল করা যেতে পারে। তিনজন ডিফেনডারকে নিখুঁত পায়ের টানে ছিটকে দিয়ে মিগ বিমান গতিতে ছুটে গিয়ে জিয়ারজিনো চকিত শটে গোলটি করলেন। তাকে পেছন থেকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেও কার্যকরী হতে পারলেন না চেক ডিফেনডারেরা। ফলে ব্রাজিল ৪-১ গোলে ম্যাচ জিতলো।

ব্রাজিলকে পরের ম্যাচে মুখোমুখি হতে হলো ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে। এই খেলার আগে রুমানিয়া ২-১ গোলে জয় পেয়েছিল চেকের বিরুদ্ধে। ব্রাজিল-ইংল্যাণ্ডের খেলাকে ঘিরে উত্তেজনা কম ছিল না। এই ম্যাচে মাঠের অধিকাংশ দর্শক ছিল ব্রাজিলের পক্ষে। ব্রাজিল এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটির জন্য মানসিক দিক দিয়ে তৈরি ছিল। বরং সে তুলনায় ইংলিশ খেলোয়াড়েরা বেশ একটু অস্বস্তির মধ্যে পড়লেন। হোটেল ঘিরে গাড়ির হর্ণ বাজিয়ে ইংলিশ ফুটবলারদের বিরক্ত করা হলো সারা রাত পর্যন্ত। ফলে রাতভোর অনেকেই ঘুমতে পারলেন না। পরের দিন মাঠে গতকালের রাত্রি জাগরণের প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট ধরা পড়লো। রামসে দলের একটি মাত্র খেলোয়াড়কে পরিবর্তন করলেন। টমি রাইটকে আনা হলো রাইট

ব্যাকে। রাইটের কাজ হলো ব্রাজিলের পাউলো সিরাজকে পাহারা দেওয়া। যেমন পেলেকে পাহারা দেওয়ার জন্য রাখা হয়েছিল মুলারিকে। এ ছাড়া এই ম্যাচে বৃটিশ ফুটবলারেরা প্রতিমুহূর্তে সতর্ক ছিলেন যাতে পেলে, রিভোলিনো বা জিয়ারজিনো কেউ একজনও যেন আঠারো গজ বক্সের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারেন। আসলে বলা যায় রামসে এই ম্যাচে যত না গোল দিয়ে জেতার কথা ভেবেছিলেন, তার চেয়েও বেশী ভেবেছিলেন গোল না খেয়ে ম্যাচ বাঁচানো যায় কি করে। এত করেও কিন্তু ইংল্যাণ্ড এই ম্যাচে আত্মরক্ষা করতে পারে নি। প্রায় দশ মিনিটে পেলের একটি দর্শনীয় হেড আকর্ষণীয় ভাবে বাঁচালেন গর্ডন ব্যাঙ্কস। জিয়ারজিনোকে কড়া পাহারা দিয়েও কুপার তাকে কিছুতেই বাগে আনতে পারলেন না। বারবার তিনি বৃটিশ পাহারা ভেঙে বল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। এই ম্যাচে জিয়ারজিনো অসাধারণ কিছু সেণ্টার করেছিলেন। একবার তো তার ওই সেণ্টারে পেলে মাথা ছুঁয়ে নিজেই গোল দেওয়ার আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিলেন। কিন্তু ব্যাঙ্কস দৈবকৃপায় কি ভাবে যে ওই বলটি রক্ষা করেছিলেন তা চোখে দেখার পরও কারো বিশ্বাস হয় নি। বিরতির পর ব্রাজিল সারাদিনে একটি মাত্র গোলের মুখ দেখতে পেল। এই গোলের জন্য টোস্টাওয়ের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশী। সৃজনশক্তির অধিকারী টোস্টাও সুপরিকল্পিত ভাবে বাঁ দিক দিয়ে ড্রিবল করে এগিয়ে যায়। মুর তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা সত্ত্বেও, টোস্টাও নিজের কনট্রোল নষ্ট করেন নি। বলের ওপর সম্পূর্ণ দখল রেখে তিনি চমৎকার ভাবে মাঝ মাঠে বল বাড়ালেন পেলেকে। পেলে ওই বল গোলে শট না করে, ঠেলে দিলেন ডান দিক বরাবর। চকিতে পিছন থেকে উঠে আসা জিয়ারজিনো কালক্ষেপ না করে গোলে শট নিলেন। ইংল্যাণ্ড এরপরও গোল শোধ করার সুযোগ পায়। কিন্তু এ্যালন বল সে সুযোগকে কাজে লাগাতে পারলেন না। জিয়ারজিনো দেওয়ার গোলেই ব্রাজিল ম্যাচ জিতে গেল ১-০ গোলে।

পরপর দুটো ম্যাচে জয় পাওয়ায় ব্রাজিল কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার ব্যাপারে একরকম প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেল। ফলে তারা রুমানিয়ার বিরুদ্ধে পরীক্ষা-মূলক ভাবে নতুন দল নিয়ে মাঠে নামলেন। এইদিন পিয়াজ্জকে দেওয়া হলো মাঝ মাঠের দায়িত্ব। রুমানিয়া অপেক্ষাকৃত কমজোরি দল হলেও তারা শেষ দিকে বেশ চিন্তায় ফেলেছিলো ব্রাজিলকে। একতরফা ঝড়ো আক্রমণে ব্রাজিল কিছুক্ষণের জন্য ছত্রাকার হয়ে যায়। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে দলীয় সংহতি। এই ম্যাচ শেষ হলো ৩-২ গোলে। ব্রাজিলের হয়ে তিনটি গোলের দুটি গোল দিলেন পেলে, অন্য গোলটি এলো জিয়ার-জিনোর পা থেকে।

শেষ ম্যাচে ইংল্যাণ্ড ক্লার্কের দেওয়া গোলে জয় পেল চেক দলের বিরুদ্ধে। এই সুবাদে তিন নম্বর পুল থেকে ব্রাজিলের মতো কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলো ইংল্যাণ্ড। তিন নম্বর পুলের ফলাফল দাঁড়ালো :

ব্রাজিল	৩—৩—০—০—৮—৩—৬
ইংল্যাণ্ড	৩—২—০—১—২—১—৪
রুমানিয়া	৩—১—০—২—৪—৫—২
চেকোশ্লাভিয়া	৩—০—০—৩—২—৭—০

চার নম্বর পুলে গোলের বন্যা বইয়ে দিলো জার্মানরা। তারা যে মেকসিকোয় যথার্থ ভাবে তৈরি হয়ে এসেছে, তা পরিষ্কার বোঝা গেল তাদের খেলার বহর দেখে। ফরোয়ার্ড লাইনে উয়ে জিলার, মুলার, লোহার অনবদ্য ভূমিকা নিলেন। মিডফিল্ডে সম্রাটের ভূমিকায় বিচরণ করতে দেখা গেল বেকেনবাউয়ারকে।

পুলের প্রথম খেলায় জার্মানদের খেলতে হলো মরক্কো দলের সঙ্গে। এই খেলায় প্রথম দিকে জার্মানরা নিজেদের গুছিয়ে তোলার আগেই মরক্কো দল একতরফা ঝড়ো আক্রমণে তাদের চেপে ধরলো। এই সময় মরক্কো দল যে ভাবে খেলছিল, তাতে তাদের একাধিক

গোলে এগিয়ে গেলেও কিছু বলার ছিল না। কিন্তু তারা একটির বেশী গোল দিতে পারলো না। গোলটি এলো জার্মান গোলরক্ষক শেপ মেয়ারের ভুলের জন্য। হেজেসের দুর্বল ব্যাক হেড মেয়ার ঠিক মতো ধরতে না পারায়, বলটি তার হাত থেকে বেরিয়ে যায়। হুমেন ছুটে এসে সেই বল গোলে ঠেলে দিয়ে এগিয়ে দেয় মরক্কো দলকে। গোল খাওয়ার পর জার্মান খেলোয়াড়দের সম্বিত ফিরে আসে। গোলের জন্য মরিয়া জার্মান দলে নামানো হলো দুজন পরিবর্তিত খেলোয়াড়। গ্রাবোস্কি মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল জার্মান আক্রমণের চিত্র। তিনি বল নিয়ে অসম্ভব গতিতে দৌড়ে মরক্কো রক্ষণভাগকে ভেঙেচুরে দিলেন। বিরতির পর গ্রাবোস্কির বাড়ানো বল ধরেই মুলার ও জিলারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জার্মান দল গোল শোধ করলো। গোলটি এলো জিলারের শট থেকে। গ্রাবোস্কি তখন অসাধারণ ফুটবল খেলছেন। তার বলের ওপর দখল ক্ষমতা এবং সূক্ষ্ম কাজ ছিল দেখার মতো। এই গ্রাবোস্কির ঐকান্তিক চেষ্টায় জার্মান পেল জয় সূচক গোল। প্রচণ্ড গতিতে গ্রাবোস্কি বল নিয়ে দৌড়লেন। তার গতির সামনে ছিটকে গেলেন মরক্কো দলের দু-তিনজন ডিফেনডার। এরপর তিনি চকিতে সেণ্টার করা মাত্র, বলে মাথা ছোঁয়ালেন লোহার। বলটি পোস্টে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো। সামনেই ছিলেন মুলার। তিনি কালবিলম্ব না করে জোরালো শটে জয় এনে দিলেন জার্মানীর।

পরের দুটি ম্যাচে সহজ জয় পেল পশ্চিম জার্মানী। দ্বিতীয় ম্যাচে তারা বুলগেরিয়াকে হারালো ৫-২ গোলে। পাঁচটি গোলের মধ্যে মুলার দিলেন তিনটি গোল। একটি করে গোল এলো লিবুডা ও জিলারের পা থেকে। শেষ ম্যাচে মুলারের হ্যাটট্রিকে পশ্চিম জার্মানী জয় পেল পেরুর বিরুদ্ধে। ফলাফল ৩-১। পেরুর পক্ষে গোলটি করলেন কুশলী ফরোয়ার্ড কিউবিলাশ।

পেরু লীগ পর্যায়ে একটি মাত্র ম্যাচে হেরেছিল। তারা প্রথম

খেলায় জয় পায় বুলগেরিয়াকে ৩-২ গোলে হারিয়ে। এই ম্যাচেও জয়সূচক গোল করেন পেরুর শ্রেষ্ঠ তারকা কিউবিলাশ। মরক্কোকে ৩-০ গোলে হারানোর পিছনেও কিউবিলাশের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশী। তিনটি গোলের মধ্যে তিনি দিয়েছিলেন দুটি গোল। সত্তরের আসরে তাই সেরা প্রতিভাবানদের মধ্যে কিউবিলাশ নিজের জায়গা করে নিয়েছিলেন। পুল লীগ শেষে ফলাফল বিচারে পশ্চিম জার্মানী এবং পেরু উঠে এলো কোয়ার্টার ফাইনালে। ফলাফল দাঁড়ালো—

পঃ জার্মানী	৩—৩—০—০—১০—৪—৬
পেরু	৩—২—০—১— ৭—৫—৪
বুলগেরিয়া	৩—০—১—২— ৫—৯—১
মরক্কো	৩—০—১—২— ২—৬—১

জার্মান বদলা নিলো

মেকসিকো আসরের কোয়ার্টার ফাইনালে দুরন্ত লড়াই করে পশ্চিম জার্মানী পূর্ব পরাজয়ের শোধ নিলো। প্রচণ্ড লড়াই হয়েছিল সেদিন। ইংল্যাণ্ড লিঁয়তে প্রাধান্য বিস্তার করে খেলা শুরু করেছিল। ববিমুর রাজসিক মেজাজে আগলে রেখেছিলেন মাঝ মাঠ। তার খেলার মধ্যে ফুটবলের যাবতীয় ঐশ্বর্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। টেরিকুপার তিনি লিবুডাকে কড়া পাহারায় রাখলেন। ফলে কুপারকে অতিক্রম করে লিবুডা একবারও বল নিয়ে আক্রমণ রচনা করতে পারলেন না। ফরোয়ার্ড লাইনে ববি চার্লটন দীর্ঘদিন বাদে তার জীবনের সেরা ম্যাচটি খেললেন। অনেকের ধারণায় এই ম্যাচটি ছিল ববি চার্লটনের জীবনের সেরা খেলা। সেই সঙ্গে এইদিন অনবদ্য ভূমিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লি, বল এবং মুলারি।

প্রথম গোল আসে তিরিশ মিনিটের মাথায়। এই গোলের জন্য সবটুকু কৃতিত্ব ছিল মুলারির। তিনি নিজস্ব ভঙ্গিমায় বল ধরে দুজন

খেলোয়াড়কে কাটিয়ে গোল দিয়েছিলেন। মুলারি গোল দেওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত বোঝা যায় নি যে তিনি বলটিকে সেন্টার না করে নিজেই গোলে মারবেন। বলটি লি বাড়িয়ে দিলেন ডান প্রান্তে উঠে আসা খেলোয়াড় নিউটনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু কোথায় নিউটন? কেউ কিছু বোঝার আগেই মুলারি বলটিকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে গেলেন। তারপর সেন্টার করার ভঙ্গিমায় শট নিলেন গোলে। বাতাসে বাঁক নিয়ে বল প্রবেশ করলো গোলে।

প্রথম গোলটি হওয়ার পর ইংল্যাণ্ড যেন মরিয়া হয়ে উঠলো গোলের নেশায়। তারা গোল চায়—আরো গোল। বিরতির কয়েক মিনিট আগে তাদের চেষ্টা সফল হলো। পিছন থেকে উঠে আসা নিউটন তখন ফরোয়ার্ড লাইনে বল যোগাচ্ছেন হার্স্টকে। এই ম্যাচে হার্স্টকে অসম্ভব ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। তিনি যেন বল বেশিক্ষণ পায়ে রাখতে চাইছেন না। নিউটনের ক্রশপাস হার্স্ট ধরেই পাঠালেন মার্টিন পিটার্সকে। পিটার্স দর্শনীয় শটে দ্বিতীয় গোল করে এগিয়ে দিলো ইংল্যাণ্ডকে।

দুই গোলে পিছিয়ে পড়া জার্মানরা বিরতির পর দলের বেশ কিছু পরিবর্তন করলেন। হেলমুট শ্যেন পাহারায় অকেজো লিবুড়াকে সরিয়ে তার জায়গায় মাঠে নামালেন গুল্‌জকে।

গ্রাবোস্কি মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গে খেলার চিত্র বদলে গেল। যে লিবুডাকে এতক্ষণ ছবির মতো আটকে রেখেছিলেন, সেই তিনি এবার যথেষ্ট বিব্রত বোধ করলেন গ্রাবোস্কির গতির কাছে। প্রচণ্ড গতির টানে গ্রাবোস্কি বার বার ছিটকে ফেললেন কুপারকে। অসাধারণ গ্রাবোস্কি—যেমন স্কিল, তেমনি তার স্পীড।

জর্মানরা দ্বিতীয়ার্ধে সমস্ত প্রাণশক্তি উজাড় করে মাঠে নেমেছিল। এই ম্যাচে বেকেনবাউয়ার এ্যাটাকিং ডিফেনডার হিসাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিলেন। তার পক্ষে এই কাজ করা আরো সহজ হলো যখন ববি চার্লটন কঠিন ট্যাকলে মাঠের বাইরে বেরিয়ে

গেলেন। বেকেনবাউয়ার উঠে এলেন ইংল্যাণ্ডের গোল সীমানার মধ্যে। তার কাছে জিলারের একটি রিবাউণ্ড ফিরে আসামাত্র প্রচণ্ড শটে তিনি তা গোলের মধ্যে পাঠালেন। প্রচণ্ড গতিতে বলটি বেনট্রিকে হতবাক করে জড়িয়ে গেল জালে।

ইংল্যাণ্ড দলে এই সময় বেশ কিছু পরিবর্তন করা হলো। চার্লটনের বদলী নামলেন বেল। পিটার্সের জায়গায় আনা হলো নরম্যান হাণ্টারকে। কিন্তু সাধ্যমতো চেষ্টা করেও ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয়ার্ধের শেষদিকে কিছুতেই প্রতিযোগিতার মধ্যে ফিরতে পারলো না। জার্মান খেলোয়াড়েরা তখন গোলের নেশায় তৎপর। ক্ষুধার্ত হায়নার মতো তার গোল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এই সময় এ্যালান বলের একটি পাশ ঠিকমতো ধরতে পারলেন না বেল। কাছে ছিলেন হার্স্ট। তিনি দ্বিতীয়ার্ধে এই একটি বারই গোলে শট করার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তার এই শট গোলপোস্টের বাইরে চলে যায়। এরপর স্নেনিঞ্জার মাঝ মাঠ থেকে একটি বল ধরে চমৎকার উঁচু পাস করলেন। সেই বল সকলের মাথা টপকে এসে পড়লো অরক্ষিত জিলারের পায়ে। জিলার কালবিলম্ব না করে চমৎকার শটে পরাস্ত করলেন বেনট্রিকে।

নির্দিষ্ট সময় খেলা শেষ করে শুরু হলো অতিরিক্ত সময়ের খেলা। ইংল্যাণ্ড খেলোয়াড়েরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তবু তারা ম্যাচ ছেড়ে দিলেন না। লড়াই চললো দ্রুতগতিতে। প্রথম সুযোগ আসে হার্স্টের কাছে। তিনি লি'র কাছ থেকে বল পেয়ে গোলে শট নিতেই—গোল। কিন্তু রেফারি গোলের বাঁশি বাজালেন না। কেন যে এই গোল বাতিল করা হলো তা বোঝা শক্ত। অথচ হার্স্ট অফসাইডে ছিলেন না, কিংবা স্নেলিঞ্জারকেও কেউ ফাউল করেন নি, —তাহলে?

এই প্রশ্নের উত্তর মেলে নি। এবারও গ্রাবোস্কির অসামান্য ভূমিকায় গোলের সুযোগ পেল জার্মানরা। কুপারকে গতির টানে পিছিয়ে দিয়ে গ্রাবোস্কি চমৎকার ক্রশপাস করলেন লোহারকে।

লোহার মাথা দিয়ে সেই বল পৌঁছে দিলেন মুলারকে। অসামান্য দর্শনীয় ভঙ্গিতে মুলার বেনট্টিকে পরাস্ত করে জয় এনে দিলেন জার্মান দলের।

ইংল্যাণ্ড ম্যাচ হারালো। গতবারের চ্যাম্পিয়ানকে ছিটকে যেতে হলো প্রতিযোগিতার আসর থেকে। জার্মানের এই জয় বিশ্বকাপে তাদের চোখে নতুন করে স্বপ্ন আঁকলো।

গুয়াদালাজারায় ব্রাজিলের জয় নিয়ে কারো মনে কোন সন্দেহ ছিল না। এই ম্যাচে পরাজিত পেরু দল অসাধারণ ভাল ফুটবলের পরিচয় দিয়েছিল। আক্রমণ-প্রতি আক্রমণের মধ্যে খেলাটি হয়ে উঠেছিল আকর্ষণীয়। এই ম্যাচে ব্রাজিল দলে আবার গারসন ফিরে এলেন। মাঝমাঠে এই গারসন-রিভালিনোর জুটি টপকানো অসম্ভব হয়ে উঠেছিল পেরু দলের। এই ম্যাচে অসাধারণ চাতুর্য দেখালেন টোস্টাও। ফুটবলের কলাকৌশলে টোস্টাও একজন পোক্ত খেলোয়াড়। তার অসামান্য পায়ের টানে পেরুর ডিফেন্স একেবারে নড়বড়ে হয়ে যায়। ব্রাজিলের দেওয়া চারটি গোলের মধ্যে টোস্টাও সেদিন দিয়েছিলেন দুটি গোল। একটি করে গোল দিলেন জিয়ার-জিনো ও রিভালিনো। পেরু দলও যোগ্য জবাব দিতে কসুর করে নি। তারাও দিয়েছিল দুটি গোল। প্রথম গোলটি দিলেন গ্যালার্ডো এবং দ্বিতীয় গোলটি এলো পেরুর আলোচিত তারকা কিউবিলাশের নিচু শট থেকে।

মেকসিকো সিটিতে উরুগুয়ে জয় পেল অতিরিক্ত সময়ের একেবারে অন্তিম লগ্নে। এই গোলের পর রাশিয়ানদের গোল শোধ করার মতো মেজাজ বা সময় হাতে ছিল না। উভয় দলই কিছুটা ঢিমে তালে খেলা শুরু করেছিল। উরুগুয়ের যে গোলটি করেছিলেন কুবিল্লা—সে সম্পর্কে অনেকেই বিরক্ত প্রকাশ করলেন রেফারি ও লাইন্সম্যানের বিরুদ্ধে। কারণ তাদের ধারণায় কুবিল্লা যখন বলটি টেনে নিয়ে

এসেছিলেন পিছনের দিকে, তখনই মনে হয়েছিল বলটি গোল লাইন অতিক্রম করে গেছে। কিন্তু রেফারি বা লাইন্সম্যান সংকেত না দেওয়ায় কুবিল্লা সহজে গোলটি দিয়ে যান। এই ম্যাচে দর্শকদের প্রশংসা কুড়ালেন মাজুর কিউইজ—এই নিয়ে তিনি তৃতীয়বার বিশ্বকাপ খেলতে এসে অসাধারণ গোলকিপিং করলেন।

তারুকায় ইতালি অতি সহজে জয় পেল মেকসিকোর বিরুদ্ধে। এই ম্যাচে ইতালি দলের যেন প্রকৃত শক্তি খুঁজে পেল। পুল লীগের খেলায় ইতালি খুব একটা ভাল খেলতে না পারায় অনেকেই আশাহত হয়ে পড়েছিলেন। রিভা নিজের আত্মপ্রত্যয় ফিরে পেয়ে, দেখিয়ে দিলেন কেমন করে তিন চার জন ডিফেনডারকে অতি সহজে অতিক্রম করে গোল দেওয়া যায়। ইতালি ম্যাচ জিতলো ৪-১ গোলে। গোল দিলেন দুটি রিভা এবং একটি করে ডোমেনঘিঘি ও রিভেরা। মেকসিকোর পক্ষে একটি মাত্র গোল দিলেন গঞ্জালেস।

শতাব্দীর সেরা ম্যাচ

বিশ্বফুটবলে সর্বকালের সেরা ম্যাচ কোনটি—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে মনে হয় আজ আর কেউ দ্বিধা করবেন না। বরং প্রতিটি দেশের ফুটবল সমর্থক সমস্বরে বলতে বাধ্য—মেকসিকো সিটিতে অনুষ্ঠিত দুই ইউরোপীয় শক্তির লড়াই হলো বিশ্বফুটবলের সেরা একটি চিত্র। এই লড়াইতে যে কে জিতবে খেলার অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত সঠিক ভাবে কেউ কোন উত্তর দিতে পারেন নি। দুই দলই জুলেরিমের ফাইনালে ওঠার জন্য তাদের জীবনপণ করে মাঠে নেমেছিলেন। পুল লীগের খেলায় ইতালি খুব একটা কার্যকরী ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি নিজেদের। তাদের খেলার ধরণ বদল হয়েছে কোয়ার্টার ফাইনালে। রিভা, রিভেরা,—তাদের হারানো ফর্ম খুঁজে পাওয়ায়

পশ্চিম জার্মানীকে যথেষ্ট সমস্যায় ফেলেছিল। তবু ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তাদের জয় মনের দিকে অনেকখানি প্রেরণা এনে দিলো।

১৭ই জুনের ফুটবল আসরে মেকসিকো সিটি উপচে পড়েছিল। স্থানীয় মেকসিকানরা ছিলেন জার্মানদের পিছনে। ইতালিকে তারা এমনিতেই বরদাস্ত করেন না, তাছাড়া এই ইতালির কাছে হেরে মেকসিকানদের আসর থেকে সরে যেতে হয়েছে।

কিক অফের সঙ্গে সঙ্গে দুই পক্ষ লড়াই করার জন্য কোমর বেঁধে নামলো। কেউ কারো চেয়ে কম নয়—হার মানতে রাজি নয়। নির্ধারিত নব্বুই মিনিট গলদঘর্ম হয়েও কোন দল কারো চেয়ে এগিয়ে যেতে পারলো না। ফলে শুরু হয়েছিল তিরিশ মিনিটের বাড়তি সময়ের খেলা।

পৃথিবীর ফুটবল ইতিহাসে এমন খেলা এর আগে কখনও হয়েছে বলে জানা নেই। নব্বুই মিনিটে যেখানে গোল হয়েছিল একটি করে—দুটি, সেখানে তিরিশ মিনিটে গোল হলো পাঁচ-পাঁচটা। জমে ওঠা খেলার চেহারা দাঁড়ালো উল্টো। একজন গোল দেয় তো অন্যজন গোল শোধ করে এগিয়ে যায়। গোলের বন্যা বয়ে গেল। চিৎকারে চিৎকারে কেঁপে উঠলো মেকসিকো সিটির কাঠামো। শেষ দিকে উত্তেজনায় বোঝা গেল না, কে কোন দলের সমর্থক—প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেকের জন্য। ম্যাচের চেহারা দেখে বোঝা মুস্কিল ছিল, কোন দল শেষ মুহূর্তে জিতবে। ভালমন্দ বিচার করার সম্ভব ছিল না—দুই দলই যেন সমান! কেউ কারো চেয়ে ছোট নয়। একশো মিনিট জীবন সঁপে খেলতে খেলতে সবাই যেন বিধ্বস্ত। পরিশ্রমের ক্ষমতা ছিল না কারো মধ্যে। গত ম্যাচেও জার্মানিদের বাড়তি সময় খেলতে হয়েছিল, ফলে তাদের প্রাণ-শক্তিতে টান পড়েছিল। জীবন যেন বেরিয়ে যায় আর কি। বর্ষীয়ান উয়ে জিলারের মস্ত টাক ঘামে ভিজে জ্যাব জ্যাব করছে। দু' চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। মুলার আর ছুটতে পারছেন না, আর একটু বাড়তি সময়

খেলতে হলে হয়ত তিনি মাটিতে টলে পড়বেন। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটছিলেন ডোমেনঘিঘি—আর যেন তিনি পারছেন না, শরীরের সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষিত। তবু—তবু তার মধ্যেই লড়াই চলেছিল। মাঝ মাঠে কাঠের শিলিংয়ে ভাঙা হাত ঝুলিয়ে পাগলের মতো বল নিয়ে ছোটাছুটি করছিলেন বেকেনবাউয়ার। হাত ভাঙার যন্ত্রণা তিনি ভুলে গেছেন। ইতালিয়ানরাও ফুরিয়ে গিয়েছিলেন। রিভা বারবার পেটে হাত দিয়ে বসে পড়েছিলেন মাটিতে। রিভেরা জিভ বার করা কুকুরের মতো হাঁপাচ্ছিলেন—তবু লক্ষ্য ছিল তাদের বল গোল করা।

খেলা শুরুর আট মিনিটের মধ্যেই বোনিনসেগনারোর দুরন্ত শটে ইতালি এগিয়ে গেল। জার্মান গোলরক্ষকের পক্ষে ওই ভারি ওজনের শটকে ধরা সম্ভব ছিল না। বিরতি পর্যন্ত ওই একটি গোলের ব্যবধানে এগিয়েছিল ইতালি। বিরতির পর ম্যাজোলাকে বসিয়ে তার জায়গায় নামানো হলো রিভেরাকে। গতদিন এই ফরমুলায় লাভ হয়েছিল ইতালির কিন্তু আজ কোন ফল পেলো না। বেকেনবাউয়ার মাঠের অনেকখানি জায়গা দখল করে এমন রাজসিক দর্পে খেলছিলেন যে তাকে টপকে যাওয়া খুব কঠিন হয়ে উঠেছিল ইতালিয়ানদের। হয়ত এটাই ছিল ইতালিয়ানদের স্ট্র্যাটিজির ভুল—বেকেনবাউয়ারকে তারা উপরে উঠে খেলার সুযোগ দিয়েছিলেন। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই আক্রমণের ঝড় তুললো জার্মানরা। ছুঁড়তে লাগলো একের পর এক দুর্ধর্ষ মারণ তূণ—নিজের ভুলের জন্য গ্রবোস্কি একটা সুযোগ নষ্ট করলেন। বুড়ো জিলার গোলের জন্য পরিশ্রম করছিলেন। কিন্তু মুলার কিছুটা নিষ্প্রভ হওয়ায় তার পক্ষে বোঝাপড়া করে গুছিয়ে এগুনো সম্ভব হচ্ছিল না। তবু এরই মধ্যে একসময় জিলার সবাইকে বোকা বানিয়ে অনেকটা উঁচুতে উঠে হেড দিয়েছিলেন—ইতালির ভাগ্য ভাল থাকায় বলটি কোনরকমে রক্ষা করলেন আলবেত্রিশ। বল আবার গোলরক্ষকের হাত ঘুরে লম্বা শটে চলে এলো মাঝ মাঠে। রিভা সেই বল ধরে ছোট্ট ক্রশ পাস দেওয়ার চেষ্টা করে-

ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ করেই সেই বল ছিনিয়ে নিলেন বেকেনবাউয়ার, তিনি এবার লম্বা ভাবে বল বাড়ালেন জিলারকে। জিলার-মুলার-লোহার চমৎকার একটা ওয়ালফর্ম করে এগিয়ে গেলেন। এরপর চকিতে মুলার মাঝখান থেকে সরে যাওয়া মাত্র—পিছন থেকে উঠে আসা ব্যাক স্নেলিঞ্জার চকিত শটে সমতা ফিরিয়ে আনলেন খেলায়। সবাই অবাক—ইতালিয়ানরা বোকা বনে গেলেন, স্নেলিঞ্জার ওভার-ল্যাপ করে উঠে এলেন কখন? কি ভাবেই বা তিনি এত ফাঁকায় জায়গা পেলেন।

খেলার গতি বদলে গেল। নির্দিষ্ট সময়ের একবারে শেষ মুহূর্তে, স্নেলিঞ্জারের গোল মনোবল বাড়িয়ে দিল জার্মানদের। অতিরিক্ত সময়ের খেলা শুরু হতে না হতেই জমে উঠলো নাটক। ইতালি এবার দ্বিতীয় পরিবর্তন করলো। রোসাতোর জায়গায় নামালেন পলেণ্ডি। বেকেনবাউয়ার তখন অসাধারণ ফুটবল খেলছেন, ঘনঘন তিনি এগিয়ে আসছেন বল নিয়ে ইতালির সীমানায়। তাকে রোখা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। হঠাৎ একসময় ওই বেকেনবাউয়ার হলেন আহত, হাতে আঘাত লাগলো। মাঠের বাইরে তিনি বেরিয়ে গেলেও আবার তিনি মাঠে ফিরে এলেন ভাঙা হাতে কাঠের শিলিং ঝুলিয়ে। কিন্তু তিনি আগের মতো স্বপ্রভায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারলেন না। সমালোচকদের ধারণায়, বেকেনবাউয়ারের এই আঘাতই খেলার গতিকে পরিবর্তন করেছিল।

বাড়তি সময়ের খেলায় জার্মান দল অতিমাত্রায় উৎসাহী হয়ে খেলছিল। খেলার মধ্যে তাদের প্রাধান্য ছিল ষোলো আনা। পাঁচ মিনিটের মাথায় ইতালির গোলের সামনে এক জটলার মধ্যে থেকে আশ্চর্যজনক ভাবে বলটিকে গোলের মধ্যে ঠেলে দিলেন মুলার, কেউ কিছুই বুঝতে পারলেন না। ২-১ গোলে জার্মানরা এগিয়ে যেতে না যেতেই ইতালি পেয়ে গেল ফ্রিকিক। রিভার শটে বার্গনিচ পা ছোঁয়াতেই জার্মান গোলরক্ষক হলেন পরাস্ত। ফলাফল দাঁড়লো

২-২ গোল। এবার রিভা মাঝ মাঠে স্লেলিঞ্জারকে চমৎকার কাটালেন, তারপর আশ্চর্য দক্ষতায় বলকে নিজের আয়ত্তে আনার ফাঁকে গোটা জার্মান ডিফেন্সকে তিনি ছত্রাকার করে দিলেন। শেপ মেয়ার রিভার পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার মুহূর্তে, তিনি বল ঠেলে দিলেন গোলে। এই গোলের বিনিময়ে ইতালি আবার এগিয়ে গেল ৩-২ গোলের ব্যবধানে। অতিরিক্ত সময়ের প্রথম পর্বের খেলা শেষ হলো। দ্বিতীয় পর্বের খেলা শুরু হওয়া মাত্র জার্মানরা সর্বশক্তি প্রয়োগ করলো। জিলারের হেড আবার কোনরকমে রুখে দিলেন আলবেত্রশি। জার্মানী তখন সুইপারহীন হয়েই খেলছে। বেকেনবাউয়ার আহত। তবু চরম মুহূর্তে জীবন বিপন্ন করে লড়াই করতে তারা কসুর করলো না। জার্মান দল কর্ণার পেল। জিলার কর্ণার করতে ছুটে গেলেন। তারপরই দেখা গেল বাঁক নেওয়া শূন্যে ভাসমান বল লক্ষ্য করে লাফালেন অনেকেই··সকলের নাগাল টপকে মুলারের স্প্রিংয়ের মতো শরীরটা ছুঁয়ে দিলো সেই বল। ফলে আবার খেলায় সমতা ফিরে এলো—৩-৩। মুলার এই নিয়ে চলতি আসরে দিলেন দশটি গোল। এরপরই নাটক আরো জমে উঠলো। উত্তেজনায় উত্থান পতনের প্রতিটি মুহূর্ত হয়ে উঠলো রমণীয়। দ্বিতীয় অতিরিক্ত সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে বনিনসেগনার হঠাৎ একটা ফাঁকায় বল পেয়ে গেলেন। কাল বিলম্ব না করে তিনি দিলেন লম্বা দৌড়। তারপর সুযোগ বুঝে বলটি কোণাকুণি বাড়িয়ে দিলেন রিভেরাকে। একবারে ফাঁকায় তখন রিভেরা—তার সামনে তখন বিরাট এক সাম্রাজ্য। পিছন থেকে তাকে ছুটে এসে যে কেউ বাধা দেবে এমন সাধ্য কারো নেই। সামনে কেবল মেয়ার। রিভেরা ভুলচুক না করে সহজ শটে মেয়ারকে গোল ছেড়ে দিতে বাধ্য করলেন।

এই গোলই এগিয়ে দিল ইতালিকে, শুধু এগিয়ে দিলো না, দলকে তুলে আনলো ফাইনালে।

একশো কুড়ি মিনিট কঠিন লড়াই করার পর রেফারীর শেষ

সংকেত শুনে ইতালিয়ানরা যেন মুক্তি পেলেন—খেলা শেষ।

নিঃশেষিত জার্মান খেলোয়াড়েরা খেলা শেষের বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। তাদের আর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই—যা ছিল, তা উজাড় করে দিয়ে তারা ফুরিয়ে গেছেন। ছুটে এলেন তাদের কাছে ইতালির বিধ্বস্ত সেনারা—পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন—ফুটবলের এ' এক দুলর্ভ রমণীয় দৃশ্য। চোখে জল অথচ বুক ভরা কৃতজ্ঞতা! পরাজিত হয়েও জার্মানরা সেদিন পেল সত্যিকার বিজয়ীর সম্মান। গোটা মাঠ করতালির প্লাবনে ভেসে গেল—শোনা গেল পরাজিত জার্মানদের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন ধ্বনি। পৃথিবীর ফুটবল ইতিহাসে এমন খেলা আর দ্বিতীয়টি হয় নি। এই ফুটবল শুধু মেকসিকোর মাটিকে পবিত্র করেছিল তাই নয়—গরিমা বৃদ্ধি হয়েছিল ইউরোপীয় ফুটবলের। মেকসিকো বিশ্বকাপ পর্যালোচনা করতে গিয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকের দল স্পষ্ট গলায় বললেন, 'এই ম্যাচটি শতাব্দীর সেরা সর্ব শ্রেষ্ঠ ম্যাচ।"

সেদিনের এই ঐতিহাসিক সেমিফাইনালে উভয় দলের হয়ে যারা খেলেছিলেন, তারা হলেন ;

ইতালি—আলবেত্রশি, বার্গনিচ, রোসাটাণ্ড, সেরার, ফেচিত্তি, বার্টিন, ম্যাজোলা (রিভেরা) সিণ্ডি, ডোমেনঘিঘি, বানিনসেগনা, লুইগি, রিভা।

জার্মানী : শেপমেয়র, পাজকে, স্কালজ, স্লেলিঞ্জার, ভগটস, বেকেনবাউয়ার, ওভারথ, গ্রবোস্কি, জিলার, মুলার, লোহর।

রেফারী—আর্যুর ইয়ামসেকি, (মেকসিকো)।

ইতালি উঠলো ফাইনালে। ব্রাজিল-ইতালি দুই দল মুখোমুখি হওয়ায় স্পষ্ট বোঝা গেল ঐতিহাসিক জুলেরিমে চল্লিশ বছরের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। উভয় দলই বিশ্বকাপ জয় করেছে দু-দুবার—

কাজেই এবারের আসরে যে দল জিতবে, তারাই পাবে সোনার পরী।

কে পাবে—ব্রাজিল না ইতালি? শুরু হলো ফাইনাল ম্যাচ নিয়ে পণ্ডিত মহলের চুলচেরা গবেষণা। ব্রাজিল সম্পর্কে প্রথম থেকে সবাই যতটা নিশ্চিত ছিলেন, শেষ দিকে ঠিক ততোটা স্বাভাবিক বলে মনে হলো না কাউকে। কোয়ার্টার ফাইনালের পর ইতালির পুনরুত্থান সবাইকে নতুন করে ভাবাতে শুরু করে। বিশেষ করে সেমিফাইনালে ইতালির খেলা দেখে সবাই মুগ্ধ। একথা ঠিক—ইতালির ডিফেন্স ব্রাজিলের তুলনায় অনেক বেশী কঠিন। ফেচিত্তি ও বার্গনিচ অসাধারণ ফর্মে ফুটবল খেলছেন। গোল করার মানসিকতা নতুন করে খুঁজে পেয়েছেন রিভা। বরং সে তুলনায় ব্রাজিলিয়ানদের একটু চিন্তিত বলে মনে হলো।

২১শে জুন, মেকসিকো সিটির এক সান্ধ্য আসরে মিলিত হলো ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকান গোষ্ঠী।

ব্রেজিল পেলো সোনার পরী

১৯৭০ সালে মেকসিকোর আসরে সোনার পরীর অধ্যায় শেষ হলো। বিশ্বফুটবলের প্রথম অধ্যায়কে শেষ করে ব্রাজিল জিতে নিয়ে গেল সোনার পরী।

বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী ইতালির আশাও কম ছিল না, তারাও এই কাপ জয় করেছিল দু' দুবার। কাজেই ফাইনাল ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে একটি প্রশ্ন প্রত্যেকের মনের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছে, তা হলো "সোনার পরী" কে পাবে—ব্রাজিল না ইতালি?

সম্ভবনার বিচারে দুই দলই সমান। ব্রাজিল প্রথম থেকেই চ্যাম্পিয়ান দলের মতো খেলা শুরু করেছিল। তাদের জয় সম্পর্কে তাই প্রত্যেকেই একরকম প্রায় নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু সেমিফাইনালে

জার্মানির বিরুদ্ধে ইতালির ফুটবল দর্শকদের মনে নতুন আশার সৃষ্টি করেছিল। অসাধারণ ফুটবল খেলেছিলেন তখন ইতালির ফেচিত্তি, বনিনসেগনা, সামনের দিকে ম্যাজোলা, রিভা অতুলনীয়। বিশেষ করে রিভার পায়ের সূক্ষ্ম কাজ কঠিন ডিফেন্স ভাঙার পক্ষে মস্ত হাতিয়ার। ব্রাজিলের রক্ষণভাগ খুব একটা জোরদার নয় তার প্রমাণ পাওয়া গেছে পেরুর সঙ্গে খেলার দিন। পেরুর ফরোয়ার্ডেরা বারবার ভেদ করেছে ব্রাজিলের কঠিন রক্ষণ প্রাচীর। অনবদ্য ছিলেন এই ম্যাচে কিউবিলাস। কাজেই তাদের পক্ষে রিভা বা রিভেলাকে যে আটকানো কষ্টসাধ্য হবে তা সহজেই বোঝা গিয়েছিল। উত্তেজনা এবং বাগবিতণ্ডার মধ্যে ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হলো ২১শে জুন তারিখে।

ম্যাচটি নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক। জুলেরিমের অধ্যায়ে যে এই ম্যাচটি শেষ খেলা তা পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল। এই ম্যাচে ইতালি বা ব্রাজিল যেই জিতুক না কেন, জুলেরিমে কাপকে তারা চিরকালের জন্য গ্রহণ করবে। কিন্তু কে পাবে এই কাপ? "সোনার পরী কার গলায় পরাবে বিজয় মাল্য?

সমস্ত প্রশ্নের জটিলতার যথার্থ উত্তর মিললো মেকসিকো সিটির ফাইনাল আসরে। আজটেক স্টেডিয়ামের মনোরম সান্ধ্য আসরে উপস্থিত এক লক্ষ দশ হাজার দর্শক সাক্ষী রেখে ব্রাজিল জয় করলো জুলেরিমে—চিরকালের জন্য তারা নিয়ে গেল 'সোনার পরী'।

এই ম্যাচে ব্রাজিল খেললো প্রকৃতপক্ষে একটি চ্যাম্পিয়ান দলের মেজাজে। তাদের খেলার মধ্যে কোনরকম আত্মরক্ষার প্রবণতা ছিল না। যে ডিফেন্স নিয়ে ইতালির গর্ব ছিল ষোলআনা—সেই ডিফেন্সকে নিখুঁত পায়ের টানে ছত্রাকার করে দিলেন পেলে। ইতালির দুই এ্যাটাকিং ডিফেনডার-ফেচিত্তি ও বার্গনিচকে মাঝ মাঠে ধরে রাখলেন জিয়ারজিনো। বার্গনিচ সেন্টারব্যাকে উপযুক্তভাবে খেলতে না পারায় গারসন অনেকখানি জায়গা জুড়ে আধিপত্য বিস্তার করলেন।

প্রথম গোল এলো আঠারো মিনিটের মাথায়। বাঁ দিকের দুরূহ কোণ থেকে রিভালিনো চমৎকার ক্রশ সেন্টার করলেন। বল পৌঁছাবার আগেই পেলে রিভালিনোর গতি আন্দাজ করে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন গোলের কাছে, ফলে বলটি পেলের কাছে পাঠানো মাত্র তিনি হেড দিয়ে ব্রাজিলকে এগিয়ে দিলেন। সতেরো গজ দূর থেকে পেলের হেড বিদ্যুৎ গতিতে জালে প্রবেশ করলো। এরপর ইতালি প্রতিযোগিতায় ফেরার চেষ্টা করেছিল। চমৎকার একটি গোল দিয়ে বনিনসেগনা খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইতালির প্রাধান্য বিলুপ্ত হলো। শুরু হলো ব্রাজিলের একতরফা আক্রমণ। গারসন অসাধারণ ভূমিকা নিলেন। তার পা থেকে যেন বোমা বর্ষণ হচ্ছিল। পেলে অভিজ্ঞ শিক্ষকের মতো খেলাচ্ছিলেন। সতীর্থদের মধ্যে টোসটাও, জিয়ারজিনোর ভূমিকা ছিল অসাধারণ। মাঠের মধ্যে ফুটবলের সৌন্দর্য সৃষ্টি করে চলেছিল ব্রাজিলিয়ানরা। ছেষট্টি মিনিটের মাথায় পেনালটি বক্সের বাইরে থেকে চমৎকার শট করে গারসন ব্রাজিলকে এগিয়ে দিলেন। এই গোলের সাত মিনিট পরে আবার একটি গোল দিলেন জিয়ারজিনো। ৩-১ গোলে পিছিয়ে পড়া ইতালির মনোবল ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। জয়ের আশা ছেড়ে তারা আত্মরক্ষায় সর্তক হলেন। শেষ গোলটি এলো অধিনায়ক আলবার্টোর পা থেকে। ব্যাক থেকে উঠে আসা আলবার্টো আক্রমণে অংশ নিলেন। পেলে-জিয়ারজিনোর সম্মিলিত আক্রমণে বল এসে পড়েছিল ইতালির সীমানায়। জিয়ার-জিনো শেষ বারের মতো পেলেকে পাস দিলেন। পেলে বল ধরে গোলে শট না করে ব্যাক পাস করলেন আলবার্টোকে। আগুয়ান আলবার্টোর চকিত শটে ব্রাজিল এগিয়ে গেল ৪-১ গোলে। এই গোলের বিনিময়ে ফুটবলের 'সোনার পরী' চিরকালের জন্য জয়মাল্য পরিয়ে দিলেন ব্রাজিলের কণ্ঠে। সোনার পরীকে কণ্ঠলগ্না করে ব্রাজিল খেলোয়াড়দের সেকি আনন্দ। খেলা শেষ হতেই খেলোয়াড়েরা

জড়িয়ে ধরলেন পরস্পরকে। গায়ের জামা খুলে বাতাসে উড়ালেন। তারপর সারা মাঠ জুড়ে ছুটলেন ব্রাজিলের জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে।

ব্রাজিলের এই জয় সৃষ্টি করলো ফুটবলের বুকে এক অসামান্য ঐতিহাসিক নজির। বিশ্বফুটবলে প্রথম পর্বের ছেদ টেনে জুলেরিমে চিরকালের জন্য জিতে নিয়ে গেল ব্রাজিল। চল্লিশ বছরের ইতিহাসে—ব্রাজিল প্রতিষ্ঠা করলো নিজেকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দল হিসাবে।

বলাবাহুল্য ফাইনাল ম্যাচে পেলে প্রথম গোলটি করার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বকাপে ব্রাজিলের শততম গোল হলো, সেই সঙ্গে জিয়ারজিনো আর একটি অসাধারণ রেকর্ড করলেন—নবম বিশ্বকাপ আসরে দেখা গেল প্রতিটি খেলায় ব্রাজিলকে তিনি গোল উপহার দিয়েছেন।

মেকসিকো আসরে মোট গোল সংখ্যা দাঁড়ালো চুরানব্বুইটি। এই গোলের মধ্যে ব্রাজিলের গোল ছিল উনিশটি।

মেকসিকো ফুটবলে তৃতীয় স্থানের সম্মান পেলো পশ্চিম জার্মানী। উরুগুয়েকে তারা ১-০ গোলে হারিয়ে পেল তৃতীয় স্থান। গোল দিলেন ওভারাথ। জার্মানীর মুলার পেলেন নবম বিশ্বকাপ আসরে সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান।

ব্রাজিলের জয়—'জুলেরিমে' অধ্যায়ের শেষ। বিশ্ব ফুটবলে নতুন করে চালু হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের নতুন ট্রফি—ফিফা।

জুলেরিমে থেকে ফিফা (১৯৭৪)

মেক্সিকো আসরে আলবার্টোর নেতৃত্বে ব্রাজিল ইতালিকে হারিয়ে বিশ্বফুটবলে প্রতিষ্ঠা করেছিল লাটিন-আমেরিকা গোষ্ঠীর প্রাধান্য, সেই সঙ্গে তারা চল্লিশ বছরের ইতিহাসকে সামনে রেখে বিশ্বকাপ জয় করে চিরকালের জন্য জিতে নিয়ে যায় 'জুলেরিমে'।

ব্রাজিলের এই জয়ের ফলে বিশ্বফুটবলের প্রথম অধ্যায়ের ছেদ পড়ে। দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলা শুরু হয় ১৯৭৪ সালে ফিফা কাপ জন্মের মধ্য দিয়ে।

ছত্রিশ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য এই নয়া কাপটি আঠারো ক্যারেট সোনায় মোড়া। এই ট্রফির মডেল তৈরি করেন বিখ্যাত ভাস্কর শিল্পী সিলভিও গাজানিও। এই মডেল অনুসারে সুদৃশ্য কাপটিকে বাস্তব রূপ দিলেন মণিকার বার্তোনি। এই ট্রফিটি করতে খরচ পড়েছিল বিশ হাজার ডলার।

মিউনিখ ওলিম্পিকে সাফল্যের পর ১৯৭৪ সালে ফিফার নতুন আসর বসে পশ্চিম জার্মানীতে। এই আসর নতুন করে শুরু করার সময় ঠিক হয়—তিনবার জিতলেও ফিফা কাপ আর কাউকে দেওয়া হবে না।

১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত ফিফা আসরে মোট বারটি দল মূল প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পায়। সেই সঙ্গে প্রতিযোগিতার নিয়মানুসারে বাই দেওয়া হয় গতবারের বিজয়ী ব্রাজিল এবং আয়োজনকারী দেশ পশ্চিম জার্মানীকে।

পশ্চিম জার্মানীর বিশ্বকাপ নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই আসরে ইউরোপ আবার বিশ্ব ফুটবলে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা

করে। ফাইনালে উঠেছিল ইউরোপের সেরা দল—পশ্চিম জার্মানী এবং হল্যাণ্ড। গতবারের বিজয়ী এবং জুলেরিমের প্রাপক ব্রাজিল তাদের পুরনো ঐতিহ্য এই আসরে তুলে ধরতে পারে নি। তৃতীয় স্থান নির্বাচন ক্ষেত্রেও তাদের হার স্বীকার করতে হয়েছিল অস্ট্রিয়ার সঙ্গে। ফলে বিশ্ব ফুটবলে দক্ষিণ মার্কিন মণ্ডলের আধিপত্য বলতে কিছুই বজায় ছিল না। তবে এই আসর শুরু হওয়ার আগে এক স্মরণীয় ঘটনা ঘটলো। সত্তর বছরের প্রাধান্য হারিয়ে ফিফার কর্তৃত্ব ইউরোপের হাত থেকে চলে গেল অন্য মহাদেশ। তেরো বছর সভাপতির পদ আগলে থাকার পর স্যার স্ট্যানলী রাউস সরে যেতে বাধ্য হলেন। সভাপতি নির্বাচিত হলেন ব্রাজিলের জোয়াও হাভেলানজ।

বিশ্বকাপ উপলক্ষে জার্মানিতে খুব দ্রুত বেশ কিছু স্টেডিয়াম তৈরি হলো। ঠিক হলো ফাইনালে আসর বসবে মিউনিখে। বাকি খেলা-গুলি হবে—হামবুর্গ, পশ্চিম বার্লিন, হ্যানোভার, ডর্টমুণ্ড, গেলসেন-কিরখেন ও ডুসেলডর্ফে।

সুইডেনে সবচেয়ে বেশী শহরে খেলার আয়োজন করা হয়েছিল। সেবার আসর বসেছিল বারোটি শহরে। জার্মানীতে আসর বসলো নটি শহরে। এর আগে মেকসিকোতে বসেছিল পাঁচটি শহরে, ইংল্যাণ্ডে সাতটি শহরের আটটি স্টেডিয়ামে।

উদ্যোক্তারা ন'টি শহরে আটচল্লিশ ম্যাচকে সুন্দর ভাবে বণ্টন করলেন। দীর্ঘ পরিকল্পনার পর এবার সাংগঠনিক কমিটি অগ্রিম টিকিট বিক্রির সিদ্ধান্ত নিলেন। চূড়ান্ত পর্যায়ের আটত্রিশটি খেলার জন্য মোট টিকিট বিক্রি হলো ২১,২৯,০০০ টাকার।

কঠিন নিরপত্তার মধ্যে শহরগুলিকে রাখা হলো। দেখে মনে হলো গোটা শহরে মিলিটারি পাহারা চলেছে।

প্রাথমিক পর্বের খেলা শেষ হয় অত্যন্ত নাটকীয় ভাবে। এবারের আসরে সবচেয়ে বিপন্ন মনে হলো ইংল্যাণ্ডকে। তারা

প্রাথমিক পর্বেই ছাঁটাই হয়ে যায়। আত্মঅহংকারী রামসে গদিচ্যুত হলেন। ১৯৫০ সালের পর ইংল্যাণ্ডকে এমন নিঃসঙ্গ আর কখনও মনে হয় নি। রাজনৈতিক কারণে রাশিয়া চিলিতে না যাওয়ায় বিশ্বকাপ থেকে তারা বাতিল হয়ে যায়। এবারের আসরে প্রথম চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগিতায় দেখা গেল হাইতি ও অস্ট্রেলিয়াকে।

চূড়ান্ত পর্বের খেলায় বেশ কিছু নিয়ম বদল করা হলো। তৈরি হলো চারটি কোয়ালিফাইং গ্রুপ। ঠিক হয় প্রতি গ্রুপের শীর্ষস্থান অধিকারী দুটি করে দল নিয়ে আরও দুটি গ্রুপ করে মোট আটটি দলের মধ্যে দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলা হবে। এই দুই গ্রুপের চ্যাম্পিয়ানরা ফাইনাল খেলবেন। এবং রার্নাসেরা তৃতীয় স্থান অধিকারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

পশ্চিম জার্মানীতে অনুষ্ঠিত দশম বিশ্বকাপ আসরে পশ্চিম জার্মানী ছিল সম্ভাব্য বিজয়ী দল। কারণ তারা শুধু আয়োজনকারী দেশ নয় তারা—বিশ্বকাপ পর্যায়ের খেলা শুরু করার আগেই জয় করে ছিলেন ইউরোপীয় কাপ।

এই কাপ জয় পশ্চিম জার্মানির মধ্যে নতুন প্রেরণা এনে দিয়েছিল, অনেকেই বললেন, বিশ্বকাপ আসরে পশ্চিম জার্মানী শুধু জয় পাবে না, তারা আকর্ষণীয় ফুটবল দেখাবে। বেকেনবাউয়ার পশ্চিম জার্মানীর অধিনায়ক এবং শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। তার মতো এ্যাটাকিং ডিফেনডার তখন বিশ্বে বিরল। তার সৃষ্টিধর্মী ফুটবলের মধ্যে যেমন ছিল টেকনিকের সাবলীল মুনশীয়ানা তেমনি ছিল শিল্প সৌন্দর্যের জাদুকাঠি। ড্রিবলিং পাসিং এবং সুটিংয়ে তার যোগ্যতার ধার-পাশে পৌঁছাবার কেউ ছিল না। এ ছাড়া স্টেমিনা ও স্ট্যামিনায় তাদের তুলনা নেই। শুধু বেকেনবাউয়ার নয় দলে আছেন বিগত দিনের শ্রেষ্ঠ তারকা মুলার, ওভারাথ, ব্রাইটনার শেপমেয়র। আক্রমণে মুলারের ওপর গোটা জার্মানির ভরসা, গোল করার ব্যাপারে মানুষটি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। যে কোন অবস্থায় তিনি গোলে শট নিতে পারেন, তেমনি আছে হেড দেওয়ার ক্ষমতা।

হেলমুট শ্যেন তাই পশ্চিম জার্মানীর প্রাণ শক্তি হিসাবে যেমন মাঝ মাঠে ভরসা করেছেন বেকেনবাউয়ারকে, তেমনি নির্ভর করেছেন মুলারকে।

পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই আসরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল হল্যাণ্ড। ক্রুয়েফ এই দলের সেরা ফুটবলার, গোটা দলের একমাত্র খেলোয়াড় তিনি। সমগ্র ইউরোপ তখন ক্রুয়েফের ইন্দ্রজালে মায়া মুগ্ধ। তার পায়ে যেমন আছে ফুটবলের সক্রিয় জাতু, তেমনি আছে ছন্দোবদ্ধ গতি। বল ধরে তিনি প্রচণ্ড গতিতে ছুটতে পারেন। ডাচ ফুটবলে শুধু নয় বিশ্বফুটবলেও তার মতো ফরোয়ার্ড তখন বিরল। যে রিভা গত আসরে চমক এনেছিলেন ইউরোয়পীয় ফুটবলে, তা ম্লান হয়েছে ক্রুয়েফ আবির্ভাবে। অনেকে বললেন, বিশ্বফুটবলে পেলের অভাব পূরণ করেছেন ক্রুয়েফ। গোল দেওয়া এবং গোল করানো উভয় দিকেই তিনি সমান দক্ষ। স্পিড ও স্কিলের চাতুর্য বিন্যাসে তিন চারজন ডিফেনডারকে কাটিয়ে নেওয়া ক্রুয়েফের পক্ষে খুব একটা কঠিন কাজ নয়।

এবারের আসরে হতাশ করলো ব্রাজিল। অথচ বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত তাদের মনোবল ছিল অসীম। প্রতিটি খেলোয়াড় থেকে শুরু করে দলের সমর্থক পর্যন্ত সবাই আত্মবিশ্বাসে ছিলেন পরিপূর্ণ। অনেকেই তো প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ১৯৭৪ সালে ব্রাজিল বিশ্বকাপ জয় করে ফিরে এলে, প্রতিটি খেলোয়াড়ের আবক্ষ মূর্তি বসানো হবে। কিন্তু কার্যতঃ তা হয় নি। পেলে হীন ব্রাজিল হতাশ করেছে। এক পেলে যে দলের পক্ষে কতখানি মূল্যবান তা বোঝা গেছে ১৯৭৪ সালের বিশ্ব আসরে। পেলের শূন্যস্থান পূরণ করা সম্ভব হয় নি, হয়ত সম্রাট পেলের জায়গা পূরণও হবে না, এমন আশঙ্কাও অনেকে করেছিলেন। তাই লক্ষ লক্ষ মানুষ বিশ্বকাপ শুরুর মুখে পেলের কাছে আবেদন করেছিলেন, দলের সঙ্গে তাকে মাঠে উপস্থিত থাকতে। পেলে রাজি ছিলেন না, তিনি প্রকাশ্যে বললেন, "ব্রাজিলের বহু

ভালো খেলোয়াড় আছেন। আপনাদের উচিত নতুন খেলোয়াড়দের প্রতি আস্থা রাখা।"

কোনরকম অর্থের লোভ সেদিন পেলেকে মাঠে নামাতে পারে নি। ফলে পেলে ছাড়াই দল গিয়েছিল পশ্চিম জার্মানীতে, গতবারের দুই সেরা তারকা রিভালিনো এবং জিয়ারজিনো দলে থাকা সত্ত্বেও ব্রাজিল সুবিধে করতে পারে নি। তাদের খেলার মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি দেখা গেল, বোঝা গেল চারবছরে তাদের খেলার ধার অনেকখানি কমেছে। বোঝা গেল পেলে হীন ব্রাজিল অত্যন্ত দুর্বল। অথচ দলে নামী খেলোয়াড় তো দলে কম ছিল না, ছিলেন দুর্ভেদ্য ডিফেনডার লুই পেরিরা। মারিনোর মতো ফুল ব্যাক, রিভালিনোর পাশে পাওলো সিজার।

এবারের আসরে বিশ্বজনকে বিস্মিত করে চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলতে এলো পোল্যাণ্ড। তাদের খেলা চমক এনেছিল। তৃতীয় স্থান নির্বাচনে তারা ব্রাজিলের মতো দুর্ধর্ষ দলের পরাভবকে চূর্ণ করে জয় পায় ১-০ গোলে।

পোল্যাণ্ডের দুর্ভাগ্য লুবানস্কি হাঁটুতে দ্বিতীয়বার আঘাত পেলেন। তাকে অস্ত্রোপচার করা হলো। ফলে তাদের মন কিছুটা নষ্ট হয়েছিল, তবু তারা লড়াই করার মেজাজ হারালেন না।

প্রথম রাউণ্ডের খেলা

পশ্চিম জার্মানীতে চূড়ান্ত পর্বের প্রথম রাউণ্ডের খেলা শুরু হলো ১৩ই জুন তারিখে। এবারের আসরে কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমি-ফাইনালের খেলা তুলে দিয়ে নতুন নিয়মে খেলা শুরু হলো। প্রাথমিক পর্যায়ে ষোলোটি দেশকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হলো। ঠিক হয় এই চারটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান ও রার্নাসদের নিয়ে দুটি গ্রুপ

করে আবার খেলা হবে ফাইনাল রাউণ্ডের লীগ। এই দুই গ্রুপের চ্যাম্পিয়ানরা সরাসরি মিলিত হবেন ফাইনালে, রার্নাসেরা লড়াই করবেন তৃতীয় স্থানের জন্য। বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলার আগের দিন, ১২ই জুন বিভিন্ন ক্রীড়াকেন্দ্রে গরিলা হানার সংবাদ পাওয়া গেল। প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ হলো ফ্রাঙ্কফুর্টে। উদ্বোধনী খেলার দিন চিলির দূতাবাস আক্রান্ত হলো। শহরের বিক্ষিপ্ত ঘটনায় সবাই শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা আরও কঠোর করলেন। কঠিন নিরাপত্তার মধ্যে শুরু হলো উদ্বোধনী ম্যাচ।

"খ বিভাগের" খেলায় যুগোশ্লাভিয়া মিলিত হলো গতবারের বিজয়ী ব্রাজিলের সঙ্গে। প্রচণ্ড লড়াইয়ের মধ্যে ম্যাচটি গোলশূন্য ভাবে শেষ হলো। সুইস রেফারি শুয়েরার সতর্ক করলেন একাধিক খেলোয়াড়কে। এই ম্যাচে যুগোশ্লাভ গোল করার একটি সুবর্ণ সুযোগ পায় সমাপ্তির কুড়ি মিনিট আগে। ব্রাজিলের কপাল ভাল লুই পেরিয়া কোন রকমে গোল লাইন থেকে বলটিকে রক্ষা করেন। ম্যাচ শেষে প্রেস বক্সে বসে থাকা সম্রাট পেলে বললেন, "ব্রাজিলের খেলা আমাকে দুঃখু দিয়েছে।"

শুধু প্রথম ম্যাচে নয় দ্বিতীয় ম্যাচেও ব্রাজিল ওই একই ফলাফলে ম্যাচ শেষ করলো স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও তারা গোল পেলো না। বরং স্কটেরা একসময় ভয়ানক ভাবে চেপে ধরেছিল। এই ম্যাচে কঠিন ট্যাকল করার জন্য সতর্কিত হলেন রিভালিনো। গোটা ম্যাচে রিভালিনোর একটি শট থেকে গোল হওয়ার মতো সুযোগ ছিল। কিন্তু স্কট গোলরক্ষক সেটিকে ঘুষি মেরে উড়িয়ে দিলেন। এই ম্যাচে স্কটেরা যে ভাল ফুটবল খেলেছিল এই বিষয়ে কারো মনে কোন সন্দেহ ছিল না। ভাগ্য ভাল থাকলে হে'র শট হয়ত জাল ছিঁড়ে ফেলতো। শেষ ম্যাচে নবাগত জায়েরকে ৩-০ গোলে হারালো ব্রাজিল। যুগোশ্লাভ ও স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে খেলাটি

শেষ হলো ১-১ গোলে। এই গ্রুপে যুগোশ্লাভ দল বড়সড় ব্যবধানে হারালো জায়েরকে। প্রথম পর্যায়ের লীগ শেষে দেখা গেল খ বিভাগে তিনটি দলই একই পয়েন্ট পেয়েছে। ফলে গোল এ্যাভারেজের ফলাফল বিচারে লীগে দেখা গেল :—

যুগোশ্লাভ	৩—১—২—০—১০—১ —৪
ব্রাজিল	৩—১—২—০—৩ —০ —৪
স্কটল্যাণ্ড	৩—১—২—০—০ —১ —৪
জায়ের	৩—০—০—৩—০ —১৪—০

'ক' বিভাগে পশ্চিম জার্মানী কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে পড়লো পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে। এর আগে পশ্চিম জার্মানীকে প্রথম ম্যাচে ভয়ানক লড়াই করতে হয়েছিল চিলির সঙ্গে। কঠিন যুদ্ধের পর পশ্চিম জার্মানী মাত্র ১-০ গোলে জয় পায়। চিলি পরের ম্যাচে রুখে দিল পূর্ব জার্মানীকে। এই ম্যাচের ফলাফল হলো ১-১। অস্ট্রেলিয়া দুই জার্মানীর সঙ্গে ম্যাচ হেরে আশ্চর্যজনক ভাবে রুখে দিলো চিলিকে। ফলে এই গ্রুপের শেষ খেলাকে ঘিরে উত্তেজনা উঠলো চরমে।

২৩শে জুন দুই জার্মান হলো মুখোমুখি। এই ম্যাচকে ঘিরে চারদিকে রাখা হলো কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা। প্রচণ্ড লড়াই হলো দু' দলের। গোলের জন্য উভয় দলই মরিয়া। প্রথমার্ধে কোন গোল হলো না। দ্বিতীয়ার্ধের বহু সময় ফলহীন ভাবে গড়িয়ে গেল। সমাপ্তির বারো মিনিট আগে পূর্ব জার্মানী পেলো জয় সূচক গোল, চল্লিশ গজ দূর থেকে হামান ডান দিকে ছুটে গিয়ে চমৎকার ফরোয়ার্ড পাস করলেন স্পারওয়াশারকে। তিনি জোরালো শটে পরাস্ত করলেন মেয়ারকে। পশ্চিম জার্মানী পরাজিত হলো। ক বিভাগের প্রাথমিক লীগ শেষে দেখা গেল দুই জার্মানী প্রথম ও দ্বিতীয় হয়ে দ্বিতীয় রাউণ্ডের লীগে উঠেছে।

ক বিভাগ ঃ

পূর্ব জার্মানী	৩—২—১—০—৪—১—৫
পশ্চিম জার্মানী	৩—২—০—১—৪—১—২
চিলি	৩—০—২—১—১—২—২
অস্ট্রেলিয়া	৩—০—১—২—০—৫—১

তিন নম্বর গ্রুপে চমৎকার ভাবে খেলা শুরু করলো হল্যাণ্ড। হ্যানোভারে তারা অতি সহজে ২-০ গোলে হারালো উরুগুয়েকে। হল্যাণ্ডের পক্ষে ছুটি গোলই করলেন জনিরেপ। ক্রুয়েফকে প্রাণপণ শক্তিতে এই ম্যাচে আটকে রাখার চেষ্টা করা হলো। তবে বুদ্ধিমান ক্রুয়েফ খুব একটা ঝুঁকি নিলেন না। তিনি আত্মরক্ষায় যতটা পারলেন মাঝমাঠে বিচরণ করলেন। তবে হল্যাণ্ডের পক্ষে এই ম্যাচে সেরা খেলা খেললেন হ্যানেজেম। তিনি মাঝমাঠ থেকে বল তুলে নিয়ে এলেন ওপরে, তার চমৎকার ড্রিবল ও পাসিং ছিল দেখার মতো। কিন্তু পরের ম্যাচে সুইডেনের বিরুদ্ধে তারা খুব একটা সুবিধে করতে পারলো না। ম্যাচ শেষ হলো গোল শূন্য ভাবে। তবে শেষ ম্যাচে বুলগেরিয়া সম্পূর্ণ ভাবে বিধ্বস্ত হলো। ৪-১ গোলে হারলো বুলগেরিয়া। হল্যাণ্ডের পক্ষে ছুটি গোল দিলেন নিসকেন্স এবং একটি করে গোল এলো ক্রুয়েফ এবং রেপের পা থেকে।

উরুগুয়ে হল্যাণ্ডের সঙ্গে হার স্বীকার করলেও তারা অভাবনীয় ভাবে রুখে দিল বুলগেরিয়াকে। ১-১ গোলে খেলা শেষ হলো। সুইডেন বুলগেরিয়ার ফলাফল হলো গোলশূন্য। শেষ ম্যাচে সুইডেন উরুগুয়েকে হারালো ৩-০ গোলে। ছুটি গোল করলেন এস্ট্রোয়েম এবং একটি গোল দিলেন স্যাণ্ডয়ার্স। ফলে গ বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হল্যাণ্ড এবং রানার্স হলো সুইডেন। লীগে ফলাফল দাঁড়ালো ঃ—

'গ' বিভাগ ঃ

হল্যাণ্ড	৩—২—১—০—৬—১—৫
সুইডেন	৩—১—২—০—৩—০—৪

বুলগেরিয়া	৩—০—২—১—২—৫—২
উরুগুয়ে	৩—০—১—২—১—৬—১

'ঘ' বিভাগের খেলায় হতাশ করলো গতবারের রানার্স ইতালি। এই গ্রুপে ছিল ইতালি সহ পোল্যাণ্ড, আর্জেন্টিনা এবং নবাগত হাইতি। এই গ্রুপে আশা জাগানো ফুটবলের পরিচয় দিলো পোল্যাণ্ড। তারা প্রাথমিক পর্যায়ে হল্যাণ্ডকে হারিয়ে নিজেদের আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। দুর্ধর্ষ আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে প্রথম খেলায় পোল্যাণ্ড ৩-২ গোলে ম্যাচ জিতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। পোল্যাণ্ড ম্যাচের গোড়ার দিকে চমৎকার খেললো, তেমনি আবার ওদের ভাল খেলতে দেখা গেল ম্যাচের শেষ দিকে। এই ম্যাচে ল্যাটো দিলেন দুটো গোল এবং একটি জারমাশ। অন্যপক্ষে আর্জেন্টিনা দিলো দুটো গোল। গোল দিলেন হেরেদিয়া ও ব্যারিংটন। পরের ম্যাচে পোল্যাণ্ড ৭-০ গোলে জিতলো। এই গ্রুপ লীগে ইতালি মোটেই সুবিধে করতে পারে নি। প্রথম ম্যাচে তারা হাইতিকে ৩-১ গোলে হারালেও পরের ম্যাচে জয় পেলো না আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে। দুর্ধর্ষ লড়াই করে আর্জেন্টিনা তাদের রুখে দিলো। ম্যাচ শেষ হলো ১-১ গোলে। গতবারের তারকা রিভা এবারের আসরে মোটেই সফল হলেন না। শেষ ম্যাচে পোল্যাণ্ডের হাতে হার হলো ইতালির। জারমাশ এবং ডেইনার দেওয়া গোলে পোল্যাণ্ড জয় পেলো। ইতালির পক্ষে একটি মাত্র গোল পেলেন ক্যাপেলো। ফলে যোগ্য দল হিসাবে প্রাথমিক লীগে চ্যাম্পিয়ান হলো পোল্যাণ্ড, রানার্স হলো গোল এ্যাভারেজে আর্জেন্টিনা। ফলাফলের হিসাব কষে দেখা গেল :—

'ঘ' বিভাগ :

পোল্যাণ্ড	৩—৩—০—০—১২— ৩—৬
আর্জেন্টিনা	৩—১—১—১— ৭— ৫—৩
ইতালি	৩—১—১—১— [illegible]— ৪—৩
হাইতি	৩—০—০—৩— ২—১৪—০

প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের খেলা শেষ করে, শুরু হলো আটটি দল নিয়ে দ্বিতীয় পর্বের লীগ আসর।

দ্বিতীয় পর্বের লীগ

দ্বিতীয় পর্বের এক নম্বর গ্রুপ লীগের খেলায় হল্যাণ্ডের সূচনা ভালই হলো। তারা অসামান্য ক্রীড়া নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে প্রথম ম্যাচে ৪-০ গোলে হারালো আর্জেন্টিনাকে। অনবদ্য ভূমিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেন ক্রুয়েফ। বাকি দুটি গোল দিলেন ক্রল এবং রেপ।

অন্য গ্রুপের খেলায় ডুসেলডর্ফে পশ্চিম জার্মানীর কাছে হার হলো যুগোশ্লাভের। এই ম্যাচে যুগোশ্লাভ দল যে ২-০ গোলে হারবে এই বিশ্বাস অনেকেরই ছিল না। চমৎকার দুটি গোল দিলেন ব্রাইটনার ও মুলার। ৩৮ মিনিটের মাথায় প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে বুলেটের মতো জোরালো শটে প্রথম গোল দিলেন ব্রাইটনার। দ্বিতীয় গোল হলো সাতাত্তর মিনিটের মাথায়। গার্ড মুলার জটলার মধ্যে থেকে চকিতে গোলটি করলেন—সবাইকে তাজ্জব বানিয়ে দিয়ে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগে ব্রাজিল কঠিন লড়াই করার পর ম্যাচ জিতলো আর্জেন্টিনার সঙ্গে। দুটি গোল এলো এই ম্যাচে। রিভালিনো এই দিন চমৎকার ফুটবল খেললেন। অনেকদিন বাদে তাকে ভাল খেলতে দেখা গেল। এই ম্যাচে তার বাঁ পায়ের ভলিটি ছিল অতীব দর্শনীয়। তার নিখুঁত ভলি শটটিকে ধরার মতো সুযোগ পেলেন না কার্নোভোলি। গোল খাওয়ার পর আর্জেন্টিনা যেন ফুঁসে উঠলো। ব্রিনদিসির ফ্রিকিক সাতজনের বাধা টপকে সরাসরি প্রবেশ করলো জালে। এরপরই ব্রাজিল খেলায় ফিরে আসে। পঞ্চাশ মিনিটের মাথায় ঢিমে তালে খেলার মধ্যে হঠাৎ করে জিয়ারজিনো একটি বল পেয়ে যান। তিনি ওই বল ধরে দুজন ডিফেনডারকে অতিক্রম করে এগিয়ে দিলেন ব্রাজিলকে। ব্রাজিল এই ম্যাচে ভাল

খেলা সত্ত্বেও তাদের ক্রীড়া বিন্যাসের পূর্বের কোন স্মৃতি লক্ষ্য করা গেল না। কেমন যেন ম্রিয়মাণ মনে হলো। ব্রাজিল সম্পর্কে এই অনুমান যে মিথ্যে ছিল না তা বোঝা গেল পরের ম্যাচে। হল্যাণ্ডের কাছে ২-০ গোলে হার হলো ব্রাজিলের। নিসকেন্স এবং ক্রুয়েফ চমৎকার ছুটি গোল করলেন। অন্যদিকে পূর্ব জার্মানী হেরে গেলো ছুটি গুরুত্বপূর্ণ খেলায়। আর্জেন্টিনার সঙ্গে শেষ ম্যাচে তারা কোন রকমে খেলা শেষ করলো ১-১ গোলে। ফলে 'ক' বিভাগে তিনটি খেলায় পাঁচ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ান হলো হল্যাণ্ড। অন্য দিক থেকে ফাইনালে উঠলো 'ঘ' বিভাগের চ্যাম্পিয়ান পশ্চিম জার্মানী। তারা সুইডেনকে ৪-২ এবং শেষ ম্যাচে পোল্যাণ্ডকে ১-০ গোলে হারিয়ে ছয় পয়েন্ট পেয়ে হলো চ্যাম্পিয়ান। রানার্স হিসাবে তৃতীয় স্থানের জন্য লড়াই করলো পোল্যাণ্ড ব্রাজিলের সঙ্গে। বলাবাহুল্য তৃতীয় স্থান নির্বাচনের খেলায় পোল্যাণ্ড লাটোর দেওয়া গোলে পেলো তৃতীয় স্থান। ব্রাজিল চতুর্থ স্থান পেলো। ফাইনাল নিয়ে শুরু হলো প্রচণ্ড উত্তেজনা। উৎসাহ যে চরমে উঠেছিল তার প্রমাণ মেলে কালোবাজারে টিকিটের দর দেখে। একটা ৩০ মার্কের টিকিটের দাম ব্ল্যাকে বিক্রি হলো ১৫০০ মার্কে।

কোন দল যে জিতবে, তা হলফ করে বলা গেল না। উভয় দলের সম্ভাবনাই সমান সমান। এই অবস্থায় মিউনিখ শহর উত্তাল করে ৭ই জুলাই অনুষ্ঠিত হলো ফিফার প্রথম ফাইনাল আসর।

ফিফা পেল জার্মান

৭ই জুলাই মিউনিখে বসলো ঐতিহাসিক ফিফা কাপ আসর। উৎকণ্ঠা এবং উত্তেজনায় গোটা শহর তখন কানায় কানায় ভরা। ইংল্যাণ্ড রেফারি টেলর বাঁশি বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো হল্যাণ্ডের ঝড়ো আক্রমণ। ক্রুয়েফ তীর গতিতে বল নিয়ে উপরে উঠে এলেন।

দেখে মনে হলো গোটা হল্যাণ্ড যেন জার্মান সীমানার মধ্যে এসে পৌঁছেছে। খেলার প্রথম মুহূর্তেই পিছিয়ে গেল জার্মানী। ক্রুয়েফকে ট্যাকল করায় পেনালটি পেল ডাচ দল। পেনালটি থেকে নিসকেন্স গোল দিয়ে এগিয়ে দিলো হল্যাণ্ডকে।

এই গোলের পর হল্যাণ্ডের দৌরাত্ম্য যেন বেড়ে গেল। ক্রুয়েফ অসাধারণ ভূমিকা নিলেন। সঙ্গে ক্রল, রেপ, নিসকেন্স। কিন্তু জার্মান রক্ষণভাগে ফোগটস একা খেলতে লাগলেন। তার লক্ষ্য ছিল ক্রুয়েফ। তিনি বুঝেছিলেন যদি কোন রকমে ক্রুয়েফকে আটকানো যায় তাহলে এই ম্যাচ জেতা তাদের পক্ষে কষ্টকর হবে না। হলোও তাই। বেশ কয়েকবার ফোগটস ক্রুয়েফকে অবৈধভাবে চার্জ করে নিজে যেমন সতর্ক হলেন, তেমনি ক্রুয়েফদের মেজাজ নষ্ট করে দিয়ে তাকেও সতর্কিত হতে বাধ্য করলেন। রেফারি হলুদ কার্ড দেখানোর ফলে ক্রুয়েফের মেজাজ নষ্ট হয়ে যায়। বিরতির সময় তিনি রেফারির সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ তর্ক করলেন।

দ্বিতীয়ার্ধে ফোগটসের পরিকল্পনা কার্যকরী হলো। ক্রুয়েফের সমস্ত আক্রমণ তিনি একা প্রতিহত করতে লাগলেন। এক গোলে এগিয়ে থাকা ডাচেরা ভেবেছিল পাল্টা মার দিলে হয়তো জার্মানদের ঠাণ্ডা করা যাবে। ফলে তারা জার্মানদের খেলতে না দেওয়ার জন্য বেপরোয়া ফাউল শুরু করলো। কিন্তু ডাচদের এই স্ট্র্যাটিজি যে ভুল ছিল তা বোঝা গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। লম্বা পাসে খেলে জার্মানরা আক্রমণ তৈরি করলো। হ্যোলৎসেনবাইনকে পেনালটি বক্সের মধ্যে ফাউল করায় জার্মানরা পেনালটি পেলেন। জার্মান পক্ষে পেনালটি থেকে গোল দিলেন ব্রাইটনার।

এই গোলের পরেই জার্মানরা দুই উইং দিয়ে শুরু করলো আক্রমণ। ঘন ঘন আক্রমণের চাপে ডাচ দল এত দিশেহারা হয়ে পড়েছিল যে শেষ দিকে তাদের কোন পাস নিখুঁত হলো না। ক্রুয়েফ কিছুতেই পারলেন না ফোগটসকে টপকে যেতে। বরং গোটা ডাচ

দল নেমে এলো নিজেদের গোল সীমানায়। তাদের খেলার মধ্যে রক্ষণাত্মক ধরন এই প্রথম দেখা গেল। ৬৩ মিনিটের মাথায় বেকেনবাউয়ার অসামান্য তৎপরতায় গোলের কাছে বল পেয়ে যে প্রচণ্ড শটটি করলেন তা জংব্লডকে পরাস্ত করতে পারলো না। তিনি ঘুষি মেরে সেই কামান দাগা শট উড়িয়ে দিলেন। দশ মিনিট বাদে জার্মান পক্ষে অসাধ্য সাধন করলেন অভিজ্ঞ মুলার। গ্রাবোস্কির নিচু সেণ্টার রিসিভ করেই মুলার গোলে শট নিয়ে জার্মানকে এগিয়ে দিলেন ২-১ গোলে। শেষ মুহূর্তে ডাচেরা মরণ কামড় দিলেন। এই চরম মুহূর্তে শেপ মেয়ারের ভূমিকা ছিল স্মরণীয়। তিনি অবিশ্বাস্য ভাবে ক্রুয়েফের একটি ফ্রিকিক রক্ষা করলেন। পরে নিসকেন্সের একটি পোস্ট ঘেঁষা শট শূন্যে শরীর ছুঁড়ে রক্ষা করলেন শেপ মেয়ার। বিদগ্ধজনের ধারণায় ফাইনাল ম্যাচে মেয়ারের অভাবনীয় দৃঢ়তার ফলেই পশ্চিম জার্মানীর পক্ষে ফিফা কাপ জয় করা সম্ভব হয়েছিল। তিনি অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে নিশ্চিত গোল রক্ষা করেছেন ডাচ আক্রমণের সঙ্গে মোকাবিলা করে।

২-১ গোলের ব্যবধানে পশ্চিম জার্মানী সমস্ত উৎকণ্ঠা শেষ করে ম্যাচ জিতলো। জার্মান প্রেসিডেণ্ট ভালটার শীল্ড ফিফা কাপ তুলে দিলেন জার্মান অধিনায়ক ফ্রনজ বেকেনবাউয়ারের হাতে। শুধু ফিফা কাপ নয়—চুয়াত্তরের ফেয়ার প্লে ট্রফিও পেয়েছিল পশ্চিম জার্মানী। শোভন আচরণে তাদের সংগৃহীত পয়েণ্ট ছিল ৩২।

বলা বাহুল্য পশ্চিম জার্মানী ফিফা কাপ জয় করলেও হল্যাণ্ডের ক্রীড়া নৈপুণ্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তাদের অল আউট খেলার ধরনে নতুন স্বাদ আনলো ফুটবলে। সেই সঙ্গে দর্শক চিত্তে পেলের অবর্তমানে নায়ক হয়ে উঠলেন জোহান ক্রুয়েফ।

এই আসরে হল্যাণ্ড প্রথম পরাজিত হলো ফাইনালে। পোল্যাণ্ড দীর্ঘদিন বাদে প্রতিযোগিতায় ফিরে এলো। তাদের দলের লাটো

পেলেন সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান—সেই সঙ্গে বিশ্বফুটবলে নতুন করে প্রাধান্য বিস্তার করলো ইউরোপীয় গোষ্ঠী।

এই আসরে হল্যাণ্ড হার স্বীকার করলেও, তাদের ক্রীড়া নৈপুণ্যের চাতুর্য বুঝিয়ে দিলো ভবিষ্যত ফুটবলে তাদের সার্বিক সম্ভাবনার কথা। জার্মান অধিনায়ক ফ্রনজ বেকেনবাউয়ার কৃতজ্ঞ চিত্তে বিশ্বকাপ ট্রফি তুলে দিলেন শেপ মেয়ারের হাতে—প্রমাণ দিলেন সত্যিকার অধিনায়কোচিত মানসিকতার।

চল আর্জেন্টিনা (১৯৭৮)

বিশ্বফুটবলে লাটিন আমেরিকার অন্যতম ফুটবল দেশ হলো আর্জেন্টিনা। প্রতিযোগিতার আসরে এই প্রথম আর্জেন্টিনা আয়োজনকারী দেশের সম্মান পেল—সেই সঙ্গে জয় করলো বিশ্ব-ফুটবলের শ্রেষ্ঠ স্মারক 'ফিফা কাপ'।

সেই কবে ১৯৩০ সালে আর্জেন্টিনা ফাইনালে উঠেছিল। সেবার তারা হেরে যায় নিজেদের গোষ্ঠীভুক্ত দেশ উরুগুয়ের কাছে—এই পরাজয়ের পর দীর্ঘ বছর আর্জেন্টিনাকে এই সম্মান অর্জনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে।

বিশ্বকাপ অনুষ্ঠান আর্জেন্টিনার মাটিতে অনুষ্ঠিত হোক—এই দাবী ছিল আর্জেন্টিনার বহুদিনের। ১৯৭০ সালে এই সুযোগ তাদের কাছে এসেছিল, কিন্তু আভ্যন্তরীণ অসুবিধার জন্য আর্জেন্টিনার পক্ষে সম্ভব হয় নি এই আয়োজনের দায়িত্ব নেওয়া। ১৯৭৮ সালে সুযোগ আসায় তারা দ্বিতীয়বার প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করতে পারে নি। বুয়েনস এয়ারস জুড়ে দীর্ঘ চারবছর ধরে চলেছে সাজ সাজ রব। তৈরি হয়েছে গোটা দেশ জুড়ে ফুটবলের প্রস্তুতি পর্ব।

আর্জেন্টিনার ব্যবস্থা সম্পর্কে কারো কোন অভিযোগ নেই। বরং

১লা জুন উদ্বোধনী আসরে ফিফার সভাপতি ডক্টর জাও হ্যাভলেঙ্গ অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন আর্জেন্টিনার সংগঠকদের। সত্যি, ব্যবস্থার দিক দিয়ে কোন ত্রুটি ছিল না—যেমন নজর রাখা হয়েছিল প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির ওপর, তাদের সমর্থকদের ওপর, তেমনি কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল নিরাপত্তার এবং যানবাহনের। প্রতিটি স্টেডিয়ামে ছিল আধুনিকতার ছাপ।

আর্জেন্টিনার একাদশ আসরে উপস্থিত ছিল ষোলটি দেশ। প্রতিটি দেশই যথেষ্ট তৈরি হয়েই প্রতিযোগিতায় এসেছিল। দুরন্ত লড়াই করে বিশ্বের সেরা দলগুলির হাত থেকে মহামূল্যবান স্মারক ছিনিয়ে নেওয়া আর্জেন্টিনার পক্ষে কম গর্বের কথা নয়। ফাইনালে হল্যাণ্ডকে হারিয়ে গোটা আর্জেন্টিনা তাই যেন বিশ্বজয়ের আনন্দে মেতে উঠেছিল। ফুটবল ঘিরে এত উল্লাস এর আগে দেখা যায় নি। বিশ্বকাপের বিজয় উৎসব জাতীয় উৎসবের মর্যাদা পেয়েছিল। দেখে মনে হয়েছে আর্জেন্টিনার মানুষ যেন স্বাধীনতা লাভের আনন্দে বিভোর হয়ে আছে। চারদিকে পতপত করে উড়ছে যৌবন দীপ্ত নীল পতাকা। নীলে নীল হয়েছিল গোটা স্টেডিয়াম। ফাইনাল ম্যাচের পরের দিন, জাতীয় ছুটি হিসাবে ঘোষণা করা হলো। সামরিক শাসনের ক্লান্তিকর অবসাদের মধ্যে এই জয় আনন্দ, আর্জেন্টিনাবাসীর মনে জাতীয় স্তরে এনে দিল এক নতুন প্রেরণা। একাদশ কাপ আসরে আর্জেন্টিনা যে জয় পাবে এই বিষয়ে কারো মনে কোন সন্দেহ ছিল না। পোল্যাণ্ড ফুটবল এসোসিয়েশনের টেকনিক্যাল ডিরেকটার জ্যাকে মোশ বহু আগেই বলেছিলেন, "আটাত্তরের আসরে আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ান হবে। ব্রাজিলের থেকে আর্জেন্টিনার চান্স অনেক বেশী।" জ্যাকে মোশের কথা যে মিথ্যে ছিল না ফলাফলের দিকে চোখ রাখলেই বোঝা যায়। আর্জেন্টিনার সাফল্য এসেছে তাদের শ্রম এবং শৃঙ্খলার জন্য। কোচ মেনোত্তি অসাধারণ খেটেছিলেন। দলের সাফল্যে দেশের সামরিক সরকার তাকে

অভ্যর্থনা দিয়েছে, সংবর্ধনা দিয়েছে দেশের মানুষজন। অথচ মেনোত্তি জানতেন, তার জন্য অপেক্ষা করে আছে বন্দুকের নল কিংবা ফুলের মালা।

এবারের আসরে সবচেয়ে বিপন্ন হয়েছেন ব্রাজিলের কোচ কুটিনহো। ব্রাজিল শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের খেলায় তারা মোটেই সুবিধা করতে পারে নি। ভাগ্য ভাল থাকায় দ্বিতীয় পর্যায়ে খেলার সুযোগ পেয়েছিল ব্রাজিল।

ব্রাজিল কেন ফাইনালে গেল না—এর উত্তরে হয়তো অনেকে আঙুল তুলে বলবেন পেরু-আর্জেন্টিনার খেলার ফলাফল। কিন্তু সত্যি কি তাই? হয়তো হতে পারে—হতে পারে এই ম্যাচে পেরুর বড়সড় ব্যবধানে পরাজয়ের পিছনে কোন রহস্যময় কারণ ছিল। ছিল কোন গোপন আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং—কিন্তু তাবলে গোটা টুর্নামেন্টে ব্রাজিল যে ভাল খেলেছে তা নয়। বরং এবারের ব্রাজিলকে অনেক বেশী ম্রিয়মাণ বলে মনে হয়েছে। আক্রমণের তুলনায় তারা রক্ষণাত্মক খেলার দিকেই নজর রেখেছিলো বেশী। ছিল না এই দলে বিগত দিনের প্রতিভাবানদের সমকক্ষ কোন ফুটবলার। সে তুলনায় বরং আর্জেন্টিনার খেলার মধ্যে ফোর্স ছিল। খেলোয়াড়েরা আক্রমণের দিকে নজর রেখেছিলেন। তাদের বল ট্রিটমেন্ট ছিল অসাধারণ। এছাড়া তারা প্রতিটি ম্যাচে চেষ্টা করেছেন উইং দিয়ে আক্রমণ করতে।

ব্রাজিলের কুটিনহোর মতো বেদনাহত হয়েছেন আর এক মানুষ —তিনি হলেন গতবারের বিশ্বকাপ জয়ী দলের ম্যানেজার হেলমুট শ্যেন। জার্মানী যে এই আসরে এমন শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হবে এই আশা কারো ছিল না। তাদের রক্ষণভাগ মোটেই সুবিধে করতে পারে নি। মিডফিল্ডে বেকেনবাউয়ারের অভাব প্রতি পদে পদে বোঝা গেছে। অথচ শ্যেন বলেছেন, এবারের জার্মানীকে অনেক বেশী তালিম দেওয়া হয়েছিল। তবে তার ধারণায়, পশ্চিম জার্মানীর

ব্যর্থতার জন্য দায়ী হলো ফ্লোহে ও জিমারম্যানের আহত হওয়া। তারা খেলতে না পারায় পশ্চিম জার্মানীর মনোবল ভেঙে যায়।

ইতালির কোচ এনজোবিয়ারজোট দলের ওপর রীতিমতো বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। তার বিশ্বাস ছিল ইতালি ফাইনালে উঠবে। শুধু তিনি একা নয়, ইতালি সম্পর্কে এই বিশ্বাস বিশ্বের প্রায় প্রতিটি সাংবাদিকদের ছিল। এই আসরে সত্যিকার চমক এনেছিল আফ্রিকার দেশ টিউনেসিয়া। প্রথম পর্যায়ের খেলায় তারা সফল হতে না পারলেও, তারা বেশ বড় রকমের ধাক্কা দিয়েছিল ফুটবল প্রেমিকদের মনে। নবাগত দল হিসাবে অফ্রিকার এই দেশটির প্রতি কারো প্রথম দিকে কোন উৎসাহ ছিল না। অথচ তারা ফুটবল সমৃদ্ধ একটি দেশ না হওয়া সত্ত্বেও প্রথম ম্যাচে চোখ ঝলসে দিয়েছিল ফুটবল প্রিয় দেশ লাটিন-আমেরিকা গোষ্ঠীর। টিউনেসিয়ার কাছে ৩-১ গোলে পরাজিত হয়েছিল আমেরিকা মুলুকের একটি ফুটবল দেশ—মেকসিকো। বিশ্বফুটবলে মেকসিকো মোটেই দুর্বল নয়। তারা এবার নিয়ে মোট অ্যটবার বিশ্বকাপের ফাইনাল পর্যায়ে খেলার সুযোগ পেয়েছে। টিউনেশিয়া শুধু প্রথম ম্যাচে জয় পায় নি, তারা দুর্ধর্ষ লড়াই করেছিল পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। ভাগ্য ভালো হলে হয়তো তারা এই ম্যাচে পরাজিত হতো না। পরের ম্যাচেও তারা রুখে দিয়েছিল বিগত চ্যাম্পিয়ান পশ্চিম জার্মানীকে। ম্যাচ শেষ হয়েছিল গোলশূন্য ভাবে। এই গ্রুপের অন্য খেলায় পশ্চিম জার্মানীকে লড়াই করতে হয়েছিল পোল্যাণ্ডের সঙ্গে। এই ম্যাচে পোল্যাণ্ড অসাধারণ ফুটবলের পরিচয় দিয়েছিল। তারা একতরফা আক্রমণ করেও কেবলমাত্র গোল পেলো না অভিজ্ঞ শেপ মেয়ারের জন্য। মেয়ার গোলে না দাঁড়ালে হয়ত এই ম্যাচে জার্মানকে গোলের মালা পরতে হতো। তবে প্রথম পর্যায়ের লীগে জার্মান ফরোয়ার্ডদের একমাত্র কৃতিত্ব যে তারা দুর্বল মেকসিকোকে ৬-০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করেছিল। বি-গ্রুপের প্রাথমিক লীগে তিনটি ম্যাচে চার পয়েন্ট পেয়ে জার্মানরা

হয়েছিল দ্বিতীয়। বলা বাহুল্য শেপ মেয়ার প্রথম পর্যায়ের খেলায় একটিও গোল খান নি। একমাত্র তার দৃঢ়তার জন্যই গতবারের চ্যাম্পিয়ান দল কোন রকমে সম্মান বাঁচাতে পেরেছিল। বরং তুলনা-মূলক বিচারে পোল্যাণ্ড প্রতিটি খেলায় ভালই খেলেছিল। গত-বারের সর্বোচ্চ গোলদাতা পোল্যাণ্ড দলের অভিজ্ঞ তারকা লাটো এবারের আসরে প্রথম পর্যায়ের প্রতিটি খেলায় বেশ ভালই খেললেন। সেই সঙ্গে ভাল খেলতে দেখা গেল বেনিয়েক এবং এবং অধিনায়ক দেনাকে।

এই গ্রুপের (বি. গ্রুপ) ফলাফল বিচারে দেখা গেল ঃ—

পোল্যাণ্ড	৩—২—১—০—৪—১ —৫
পশ্চিম জার্মানী	৩—১—২—০—৬—০ —৪
টিউনেশিয়া	৩—১—১—১—৩—২ —৩
মেকসিকো	৩—০—০—৩—২—১২—০

এই প্রসঙ্গে পাঠকদের বলে রাখি, একাদশ বিশ্বকাপের উদ্বোধন হয় ১লা জুন তারিখে পোল্যাণ্ড বনাম পশ্চিম জার্মানীর খেলার মধ্য দিয়ে।

একাদশ ফুটবল আসরের লীগ পর্যায়ের খেলাগুলির ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—লীগে অংশগ্রহণকারী ষোলটি দেশের মধ্যে একমাত্র ইতালি প্রথম পর্যায়ের লীগে কোন পয়েণ্ট নষ্ট করে নি। তারা তিনটি ম্যাচেই জয় পেয়েছিল। প্রথম খেলায় তারা হারালো ফ্রান্সকে ২-১ গোলে। হাঙ্গেরীকে ৩-১ গোলে এবং শেষ ম্যাচে জয় পেয়েছিল আয়োজনকারী দেশ আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ১-০ গোলে। একমাত্র ইতালির প্রাথমিক লীগে খেলার মধ্যে উৎসাহ ছিল। তারা মোটেই রক্ষণাত্মক নীতি গ্রহণ করে নি। বরং রোসি, বেগেটা, বেনেট্রির মতো ফুটবলারেরা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন। তাদের দলীয় শক্তি ও বোঝাপড়া প্রত্যক্ষ করে তাই অনেকে ভেবে-ছিলেন ইতালি হয়ত আটাত্তরের আসরে চ্যাম্পিয়ানশিপের মুখ

দেখতে পাবে। প্রথম পর্যায়ের লীগ ম্যাচ হওয়ার পর তাই ইতালি রাতারাতি ফেভারিট হয়ে উঠেছিল।

মূল প্রতিযোগিতায় যে ষোলটি দেশ খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল তারা কে কোন গ্রুপে খেলবে, তা ঠিক হয় ফিফা প্রেসিডেন্ট জোয়াও হ্যাভেলাঞ্জের নাতি রিকার্ডোকে দিয়ে এক লটারীর মাধ্যমে। অনেক দেশের অভিযোগ এই লটারীর মধ্যে নাকি কারচুপি ছিল।

ইতালির সঙ্গে এক নম্বর গ্রুপে স্থান পায় ফ্রান্স, আর্জেন্টিনা এবং হাঙ্গেরী। আর্জেন্টিনা প্রথম পর্যায়ের লীগে সাদামাটা খেলা শুরু করে। তারা ২-১ গোলের ব্যবধানে হাঙ্গেরী ও ফ্রান্সকে হারিয়ে শেষ ম্যাচে হেরে যায় ইতালির সঙ্গে। আর্জেন্টিনার ফুটবলে এবার বেশ কিছু প্রতিভাবানকে দেখা যায়। এদের মধ্যে বাজার দরে আকর্ষণীয় ছিলেন মেরিও কেমপেস, লিওপোল্ড লুক, প্যাসারেলা জোরগে ওলগুইন, আরডিলিসের মতো খেলোয়াড়েরা। প্রথম দুটি ম্যাচে লুকে অসাধারণ ফুটবলের পরিচয় দিয়ে দুটি গোল করেছিলেন। কিন্তু ইতালির বিরুদ্ধে তিনি আহত হওয়ার জন্য খেলতে পারেন নি। অনেকের ধারণা লুকে না খেলায় ইতালির সঙ্গে আর্জেন্টিনার পরাজয়ের একটি মস্ত কারণ। এই গ্রুপে হাঙ্গেরীর পরাজয় ছিল বিস্ময়ের। তারা দলগত শক্তিতে জোরদার হওয়া সত্ত্বেও গ্রুপ লীগের তিনটি খেলাতেই হেরে যায়। এই গ্রুপের ('এ') ফলাফল বিচারে দেখা গেল :—

ইতালি ৩—৩—০—০—৬—২—৬
আর্জেন্টিনা ৩—২—০—১—৪—৩—৪
ফ্রান্স ৩—১—০—২—৫—৫—২
হাঙ্গেরী ৩—০—০—৩—৩—৮—০

সি গ্রুপে সবচেয়ে কাহিল অবস্থা ছিল ব্রাজিলের। অথচ উদ্বোধনী ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে পর্যবেক্ষকরা নানা গবেষণার মধ্যে দিয়ে ব্রাজিলকেই সম্ভাব্য বিজয়ী দল হিসাবে প্রচার করে এসেছিলেন। কিন্তু ম্যাচ শুরুর পর ব্রাজিল যে খেলা দেখালো তা

অত্যন্ত দুঃখজনক। তাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগে ওঠার প্রশ্নেও সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। এই গ্রুপে অসাধারণ সাফল্যের পরিচয় দিল অস্ট্রিয়া। দীর্ঘ চব্বিশ বছর বাদে তারা পেল ফাইনাল পর্যায়ে খেলার সুযোগ। চমৎকার ফুটবলের পরিচয় দিলেন অস্ট্রিয়ার জোহান শ্যাঙ্কল, শাকনারের মতো খেলোয়াড়। বিশেষ করে যোগ্যতার বিচারে ইউরোপীয় ফুটবলে শ্যাঙ্কলের ভূমিকা তখন তুঙ্গে। তিনি চলতি বছরে ছিলেন ইউরোপের সেরা গোলদাতা। র‍্যাডিপ ভিয়েনার পক্ষে তার গোল সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল একচল্লিশটি।

প্রথম ম্যাচে ব্রাজিল জয় পেল না সুইডেনের সঙ্গে। রিনাণ্ডোর গোলে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও, শেষ মুহূর্তে সুইডেন খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনলো। সোয়েবার্গের গোলে ব্রাজিলের জয়ের স্বপ্ন মুছে গেল। দ্বিতীয় ম্যাচেও ব্রাজিলকে রুখে দিল স্পেন। খেলা শেষ হলো গোলশূন্য ভাবে। ফলে ব্রাজিলের সামনে কঠিন এক প্রশ্ন এসে দাঁড়ালো অস্ট্রিয়াকে হারানোর। শেষ ম্যাচে অস্ট্রিয়ার খেলোয়াড়দের ওপর কোন মানসিক চাপ ছিল না। তারা স্পেন এবং সুইডেনকে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউণ্ডে ওঠার প্রশ্নে একরকম প্রায় নিশ্চিন্ত হয়েছিল। এই ম্যাচে ব্রাজিল গোলের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেও বারবার প্রতিহত হয় অস্ট্রিয়ার রক্ষণভাগের কাছে। ঈশ্বর দোহাই—পরপর দুটি গোলের সুযোগ নষ্ট করার পর মেনডোনকা তৃতীয়বার বল নিয়ে একক চেষ্টায় গোল সীমানার মধ্যে প্রবেশ করেও সরাসরি গোলে শট না নিয়ে ক্রশপাস করেন রাবার্টোকে। অরক্ষিত রাবার্টো বলটি গোলে ঠেলে দিতেই ব্রাজিল দ্বিতীয় রাউণ্ডে উঠার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়। এই গ্রুপে কোন দলের শক্তির মধ্যে খুব একটা পার্থক্য ছিল না। ব্রাজিল ও অস্ট্রিয়া একই পয়েণ্ট পেয়ে দ্বিতীয় রাউণ্ডে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলো। ফলাফল বিচারে দেখা গেল ঃ—

অস্ট্রিয়া	৩—২—০—১—৩—২—৪
ব্রাজিল	৩—১—২—০—২—১—৪

স্পেন	৩—১—১—১—২—২—৩
সুইডেন	৩—০—১—২—১—৩—১

চার নম্বর গ্রুপে হল্যাণ্ডের সঙ্গে ফেভারিট ছিল স্কটদল। তাদের খেলার ধরন সম্পর্কে অনেকেই ছিলেন আশাবাদী। কিন্তু প্রথম ম্যাচে পেরু ফুটবলে তুফান ছুটিয়ে স্কট দলকে ৩-১ গোলে হারতে বাধ্য করে। অসাধারণ ফুটবলার কিউবিলাস। আগের দুটো বিশ্বকাপেও তার পা থেকে একাধিক দর্শনীয় গোল এসেছিল। স্কটের বিরুদ্ধে সেই কিউবিলাস দিলেন দুটি গোল। এবারের আসরে কিউবিলাসকে আরও পরিপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। ইরানের বিরুদ্ধে পেরু জিতলো ৪-১ গোলে। এই ম্যাচে পেনালটি গোলে হ্যাটট্রিক করলেন কিউবিলাস। এটি ছিল এবারের আসরে দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক। প্রথম হ্যাটট্রিক করেছিলেন হল্যাণ্ডের রেনসেনব্রিঙ্ক। এই হ্যাটট্রিক এসেছিল ইরানের বিরুদ্ধে। হল্যাণ্ড প্রথম খেলায় জয় পায় ৩-০ গোলে। দুর্ধর্ষ স্কটেরা এবারের আসরে ভাল দল নিয়ে এসেও সাড়া জাগাতে পারলো না। ইরানের সঙ্গে দ্বিতীয় খেলায় তারা ড্র করে বসলো। স্কটল্যাণ্ডের উইলি জনস্টনের বিরুদ্ধে আনা হলো উত্তেজক ওষুধ সেবনের অভিযোগ। এই অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ হওয়ার ফলে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হলো। তাকে ফেরত পাঠানো হলো আর্জেন্টিনা থেকে। এই ঘটনায় স্কট খেলোয়াড়দের মনোবল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়—ফলে প্রথম রাউণ্ডের খেলায় তারা যথেষ্ট শক্তি থাকা সত্ত্বেও ব্যর্থ হলো। এই গ্রুপ থেকে আশ্চর্যজনক ভাবে সাফল্য পেলো পেরু। তারা তিনটি খেলায় পাঁচ পয়েণ্ট পেয়ে হলো চ্যাম্পিয়ান। হল্যাণ্ড শেষ খেলায় অভাবনীয়ভাবে হার স্বীকার করলো স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে। দুইপক্ষ ঝড়ের গতিতে লড়াই করলো। এই ম্যাচে হল্যাণ্ডের নিসকেন্স আহত থাকায় মাঠে নামতে পারলেন না। স্কটদলের দুর্ভাগ্য, তারা হল্যাণ্ডকে হারিয়ে একই পয়েণ্ট অর্জন করেও

কেবলমাত্র গোল এ্যাভারেজে উঠতে পারলো না দ্বিতীয় রাউণ্ডে। ব্রাজিলের মতো ফেভারিট হল্যাণ্ড কোনরকমে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সম্মান রক্ষা করলো। এই গ্রুপের ফলাফল দাঁড়ালো যথাক্রমে ঃ—

পেরু	৩—২—১—০—৭—২—৫
হল্যাণ্ড	৩—১—১—১—৫—৩—৩
স্কটল্যাণ্ড	৩—১—১—১—৫—৬—৩
ইরান	৩—০—১—২—২—৮—১

দ্বিতীয় রাউণ্ডে ইতালি ফেভারিট

দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলা শুরু হওয়ার আগেই ইতালি সম্পর্কে সকলেই উৎসাহ প্রকাশ করলেন। প্রথম পর্যায়ের লীগে ইতালি একমাত্র দেশ যারা সবকটি খেলাতেই জয় পেয়েছিল। শুধু তাই নয়—ইউরোপের তারা সেরা শক্তি। দ্বিতীয় রাউণ্ডে যে আটটি দলের মধ্যে পাঁচটি ইউরোপের দল ছিল তার মধ্যে ফুটবলের গুণাগুণ বিচারে ইতালির শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে কারো মনে কোন সন্দেহ ছিল না। অনেকেই ভেবেছিলেন রিভার প্লেটে জার্মানদের হারাতে কষ্ট হবে না ইতালির। কিন্তু কার্যত তা হলো না। জার্মান খেলোয়াড়েরা ইতালিয়ানদের গায়ের সঙ্গে এমনভাবে লেপটে থাকলেন যে, ফাঁকায় বল পাওয়া খুব কঠিন হয়ে উঠেছিল রোসি, বেনাট্টি, বেগেটার পক্ষে। শেপমেয়ার এইদিন হয়ত চলতি বিশ্বকাপে প্রথম গোলটি খেতেন যদি না রোসির কামানদাগা শট রাসম্যানের কাঁধে লেগে ফিরে না যেতো। ম্যাচটি শেষ হলো গোল শূন্যভাবে। গ্রুপ 'এ'র খেলায় হল্যাণ্ড অতি সহজে বিধ্বস্ত করলো অস্ট্রিয়াকে। ৫-১ গোলে ম্যাচ জিতলো হল্যাণ্ড। 'খ' বিভাগে পেরুর ৩-০ গোলে হার হলো

ব্রাজিলের কাছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলায় ব্রাজিলকে অনেকখানি আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে দেখা গেল। মনে হলো তারা ফাইনালে ওঠার কথা ভাবতে শুরু করেছে।

ইতালি অস্ট্রিয়ার সঙ্গে ম্যাচ জিতলো ১-০ গোলে। এই ম্যাচে অসাধারণ গোল দিলেন পাওলা রোসি। ফলে হল্যাণ্ডের সঙ্গে ম্যাচটি হয়ে উঠলো আকর্ষণীয়। হল্যাণ্ড দ্বিতীয় খেলায় পশ্চিম জার্মানীর হাত থেকে জয় ছিনিয়ে নিতে পারে নি। প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে ম্যাচ শেষ হয় ২-২ গোলে। এই গ্রুপের সেরা খেলা অনুষ্ঠিত হলো হল্যাণ্ড বনাম ইতালির। ফলাফল বিচারে দুই দলের অবস্থাই তখন সমান। ফলে ফাইনালে ওঠার জন্য উভয় দলকেই জয়ের জন্য লড়াই করতে হলো। এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি দেখতে মাঠে হাজির ছিলেন একাত্তর হাজার দর্শক। বেশ চড়া মেজাজের মধ্যেই খেলাটি শুরু হয়। এই ম্যাচে আরনেস্ট হ্যাপেল দলে ফিরিয়ে এনেছিলেন আহত নিসকেন্সকে। তাকে তিনি মাঝ মাঠে নিযুক্ত করলেন পাওলা রোসির পাহারাদার হিসাবে। ফলে রোসির পক্ষে স্বাভাবিক খেলা যেমন সম্ভব হয় নি, তেমনি নিসকেন্স পারেন নি নিজস্ব বিন্যাস রক্ষা করতে। উত্তেজনার চাপ উভয় দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে থাকায় খেলার মেজাজ মাঝে মাঝে উসকে যায়। তারা নিজেদের স্বাভাবিক মেজাজের ভারসাম্য রক্ষা করতে না পারায় ফাউলের মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে রেফারিকে ঘনঘন বাঁশি বাজিয়ে খেলা থামাতে হয়। দেখাতে হয় হলুদ কার্ড। প্রথম হাফে ইতালি এত গতিময় ফুটবল শুরু করে যে তাদের সঙ্গে তাল মেলাতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল হল্যাণ্ড দলের। প্রচণ্ড চাপের ফলেই প্রথমার্ধে ইতালি ব্রানডের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে হল্যাণ্ড যেন ফাইনালে ওঠার মরণপণ সংকল্প নিয়ে মাঠে হাজির হয়। যে নিসকেন্স প্রথম হাফে রোসির পাহারাদার ছিলেন, সেই তিনি স্বাভাবিক খেলায় ফিরে আসেন। ইতালি দলে এই সময় পরিবর্তন হয়—ক্যাসিওকে

বদলে নামানো হয় সালাকে। দ্বিতীয়ার্ধের ৫০ মিনিট প্রচণ্ড লড়াই করার পর খেলার সমতা ফিরিয়ে আনেন হল্যাণ্ডের ব্রানডস। এই গোলের পরই ইতালি দল যেন আত্মরক্ষায় ফিরে যায়। সমাপ্তির বারো মিনিট আগে এরিকহ্যানের জোরালো শটে ইতালি পিছিয়ে পড়ে ২-১ গোলে। হ্যান শটটি অন্তত চল্লিশ গজ দূর থেকে নিয়েছিলেন। হ্যানের এই গোলই জয় এনে দিলো হল্যাণ্ডকে। ফেভারিট ইতালির আশা নিশ্চিহ্ন হলো। হল্যাণ্ড 'ক' বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়ে উঠে এলো ফাইনালে। তৃতীয় স্থানের জন্য লড়াই করার যোগ্যতা পেল ইতালি। 'ক' বিভাগের ফলাফলে ঃ—

হল্যাণ্ড	৩—২—১—০—৯—৪—৫
ইতালি	৩—১—১—১—২—২—৩
পঃ জার্মানী	৩—০—২—১—৪—৫—২
অস্ট্রিয়া	৩—১—০—২—৪—৮—২

বিশ্বাসঘাতক পেরু

ফাইনালে ওঠার প্রশ্নে ব্রাজিল যখন অস্বস্তিবোধ করছিল, ঠিক তখনই দুর্ধর্ষ পেরুকে ৬-০ গোলে হারিয়ে এক নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে ফাইনালে নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে উঠে এলো আর্জেন্টিনা। স্বপ্ন তাদের সার্থক হলো। গোল এ্যাভারেজে পিছিয়ে গেল ব্রাজিল—ধুয়ে মুছে গেল তাদের ফাইনালে ওঠার সমস্ত রঙিন বাসনা। পেরুর এই পরাজয় সম্পর্কে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। কেনই বা দেখা যাবে না—দল হিসাবে তো তারা কমজোরি ছিল না। আগের ছুটো ম্যাচে এবং বিশেষ করে প্রাথমিক লীগে পেরু যে ফুটবলের পরিচয় দিয়েছিল তাতে তাদের পক্ষে ছ-ছটি গোল খাওয়া রীতিমতো

অকল্পনীয় ঘটনা। ব্রাজিল প্রথম পর্যায়ের লীগে নিজেদের গুছিয়ে তুলতে না পারলেও, দ্বিতীয় পর্যায়ে তারা পায়ের নিচে মাটি খুঁজে পেয়েছিল। পেরুকে হারিয়ে ছিল ৩-০ গোলে এবং পোল্যাণ্ডকে ৩-১ গোলে। সে তুলনায় আর্জেন্টিনা জয় পায় পোল্যাণ্ডের কাছে মাত্র ২-০ গোলে। আর্জেন্টিনা ব্রাজিলের মধ্যে খেলাটি গোলশূন্য ভাবে শেষ হওয়ায় দুই দলের শেষ ম্যাচটি হয়ে উঠে আকর্ষণীয়। ব্রাজিলকে মিলিত হতে হয় অস্ট্রিয়ার সঙ্গে, আর্জেন্টিনাকে পেরুর বিরুদ্ধে। এই ম্যাচের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই ব্রাজিলের তরফ থেকে খেলার সময় বদলাবার জন্য অনুরোধ করা হয়। তারা বলেন, এই দুটি ম্যাচ একই সময় হওয়া বাঞ্ছনীয়। নচেৎ পেরু ও আর্জেন্টিনার খেলা পরে অনুষ্ঠিত হলে এই ম্যাচে ব্রাজিল-পোল্যাণ্ডের খেলার প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হবে। ব্রাজিলের এই যুক্তি মিথ্যে ছিল না। তাদের অনুরোধকে সমর্থন করেছিল পোল্যাণ্ড। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সময় বদল করতে রাজি হলেন না। ফলে তারই চরম রূপ স্পষ্টভাবে ধরা পড়লো পেরুর অভাবনীয় পরাজয়ের মধ্যে। পোল্যাণ্ডকে ৩-০ গোলে হারাবার পর ব্রাজিল একরকম নিশ্চিন্ত ছিল। তারা জানতেন গোল এ্যাভারেজে আর্জেন্টিনাকে ফাইনালে উঠতে গেলে পেরুকে কমসেকম চার গোলে হারাতে হবে। কিন্তু চার গোল খাওয়ার মতো দল পেরু নয়। কিন্তু আশ্চর্যজনক ফলাফলে সবাইকে অবাক করে আর্জেন্টিনা উঠে এলো ফাইনালে। পেরুকে অভাবনীয় ৬-০ গোলে হারিয়ে আর্জেন্টিনা ম্যাচ জিতলো। ফলে তারা পেরুর চরম বিশ্বাসঘাতকতার ফলে পেলো ব্রাজিলের পরিবর্তে ফাইনাল খেলার সুযোগ। এই ম্যাচে পেরুর ফুটবল দেখে মনে হলো, তারা যেন একটি ফুটবলের শিক্ষানবীশ দেশ। এক তরফা ফুটবল খেললো আর্জেন্টিনা। এই জয়ের পক্ষে আর্জেন্টিনা বহু যুক্তি দর্শালেও, সন্তুষ্ট করা গেল না ব্রাজিলকে। তারা পরিষ্কার বললেন, ফলাফল যে এইরকম কিছু একটা ঘটতে পারে তা আন্দাজ করেই

আমরা দুটি খেলা একই সময় আরম্ভ করতে বলেছিলাম। আর্জেন্টিনা রাজি হয় নি। পেরু ফুটবলের বিশ্বাসঘাতক।

ব্রাজিলের অন্যতম কর্মকর্তা ক্যাভালহিরো বললেন, "পেরুর এই পরাজয়, শুধু একটি ফুটবল ম্যাচের নয়, এই পরাজয় তাদের জাতীয় চরিত্রের।"

কোচ কুটিনহো দুঃখ করে বললেন—"পেরুর পরাজয় আমাদের স্তম্ভিত করেছে। তারা যদি এইভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে না হারতো, তাহলে আর্জেন্টিনা গোলের গড় হিসাবে ফাইনালে উঠতে পারতো না। আসলে পেরু এই ম্যাচে খেলার চেষ্টা করে নি। তারা হাল ছেড়ে দিয়েছিল।"

লোকে যে যাই বলুক—আর্জেন্টিনা খুশী। তাদের কোচ মেনোত্তি পরিষ্কার বললেন—"আমার ছেলেরা ভাল খেলে জিতেছে।"

দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগের ফলাফল বিচারে দেখা গেল গোল এ্যাভারেজে আর্জেন্টিনা প্রথম এবং ব্রাজিল দ্বিতীয়।

'খ' বিভাগ :—

আর্জেন্টিনা	৩—২—১—০—৮—০—৫
ব্রাজিল	৩—২—১—০—৬—১—৫
পোল্যাণ্ড	৩—১—০—২—২—৫—২
পেরু	৩—০—০—৩—০—১০—০

বলা বাহুল্য এবারের আসরে ব্রাজিল কোন খেলাতে না হেরেও তৃতীয় স্থান পেতে বাধ্য হলো। চমৎকার ফুটবলের মধ্যে তারা ইতালিকে হারালো ২-১ গালে। এই ম্যাচটি শিল্প চাতুর্যের দিক দিয়ে চরম উৎকর্ষের স্তরে পৌঁছেছিল। ফাইনাল অপেক্ষাও ম্যাচটি ছিল আকর্ষণীয়।

হল্যাণ্ড আবার ব্যর্থ হলো

গতবারের রানার্স হল্যাণ্ড এবারের আসরেও ব্যর্থ হলো। ঝড়ো ফুটবলের পরিচয় দিয়েও তাদের পরাজিত হতে হলো আয়োজনকারী দেশ আর্জেন্টিনার কাছে।

২৫শে জুন বুসেনস এয়ারসে যেন স্বাধীনতা উৎসব পালিত হলো। হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হলো—আর্জেন্টিনা আর-আর-জেন-টিনা শ্লোগান। এই ম্যাচে অসাধারণ ফুটবলের পরিচয় দিলেন কেম্পেস। তিনি না থাকলে হয়ত ফাইনালে হল্যাণ্ডকে বিধ্বস্ত করা আর্জেন্টিনার পক্ষে সম্ভব হতো না। শুরুতেই উভয় দল দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করে। প্রচণ্ড সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন পুটভিলয়েট ও হ্যান। পাঁচ মিনিটের মাথায় বাঁ দিক থেকে করা হ্যানের ফ্রিকিক রেপের মাথা ছুঁলে আর্জেন্টিনা থমকে যায়। সৌভাগ্য তাদের—বলটি পোস্টে লেগে ফিরে যায়। এর পরই আর্জেন্টিনা প্রখর আক্রমণে চেপে ধরে। অসাধারণ গোল কিপিং করলেন ইয়ং ব্লড। তিনি পাসারেলার একটি শট কোনরকমে রক্ষা করেন। পরে বার্তোনির শট অকল্পনীয় ভাবে রক্ষা পায় ব্লডের ঘুষিতে। ৩৭ মিনিটের মাথায় কেম্পেস প্রথম গোল দিয়ে এগিয়ে দেয় আর্জেন্টিনাকে। বিরতির আগেই হল্যাণ্ড সমতা ফিরিয়ে আনার সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু রেনসেনব্রিংক সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারলেন না।

দ্বিতীয়ার্ধে হল্যাণ্ড ঝড়ের গতিতে শুরু করলো আক্রমণ। এই সময় নিসকেন্সের পাস থেকে বল ধরে রেনেভ্যান যে শটটি করেন সেটি বারে লেগে ফিরে আসে। ফিরতি বলে শট নিলেন হ্যান—ফিল্লোল সেটি চমৎকার ভাবে রক্ষা করলেন। খেলার সমতা ফিরে আসে ৮১ মিনিটের মাথায়। রেনেভ্যান কর্কহফের উঁচু সেণ্টারে মাথা ছুঁয়ে গোলটি করেন।

নাটক জমলো অতিরিক্ত সময়ে। এই অতিরিক্ত সময়ের খেলায় কেম্পেস নিলেন দলের দায়িত্ব। গোটা মাঠ জুড়ে তিনি খেলতে থাকেন। তার প্রাধান্যের ফলে হল্যাণ্ডের রক্ষণভাগ ছত্রাকার হয়ে যায়। ১৪ মিনিটের সময় কেম্পেস একক প্রচেষ্টায় দুজন ডিফেনডারকে ড্রিবল করে সরাসরি হল্যাণ্ডের গোলের মধ্যে ঢুকে যান। অতিরিক্ত সময়ের ৩০ মিনিটে কেম্পেসের পাস থেকে তৃতীয় গোল দিলেন বার্তোনি। ফলে ফাইনালে ৩-১ গোলে জিতলো আর্জেন্টিনা। এই জয়ের সুবাদে তারা দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর জয় করলো বিশ্বকাপ।

হল্যাণ্ড আবার ব্যর্থ হলো। মুছে গেল তাদের সামনে থেকে বিশ্বজয়ের রঙিন স্বপ্ন। আনন্দের বন্যা বয়ে গেল বুয়েনস এয়ারসে।

এই আসরের সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক হয় ১৯৮২'র দ্বাদশ বিশ্বকাপ ফুটবল আসর বসবে—স্পেনে।

এবারের আসরে সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান পেলেন আর্জেন্টিনার কেম্পেস। তিনি গোল দিলেন ছটি। সেই সঙ্গে এবারের বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায়—সহস্র গোল সম্পূর্ণ হলো। এই ঐতিহাসিক সহস্র গোলটি করলেন হল্যাণ্ড দলের লেফটআউট রবার্ট রেনসেনব্রিঙ্ক, স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি পেনালটি কিকে এই গোলটি করলেন।

১৯৭৮ সালের কয়েকটি বিশেষ পরিসংখ্যানে দেখা যায়—এই আসরে মোট খেলোয়াড় সংখ্যা ছিল ২৫৭ জন এবং পরিবর্ত খেলোয়াড় ছিল ৭১ জন। সর্বাধিক খেলোয়াড় এবারের বিশ্বকাপে নামিয়েছিল ফ্রান্স—বাইশজন। এবং দ্রুততম গোল এসেছে এই আসরে মাত্র ৩০ সেকেণ্ডের মাথায়। গোলটি হয় ইতালির বিরুদ্ধে এবং ফ্রান্সের ল্যাকোবের শট থেকে।

এবারের বিশ্বকাপ কমিটি হল্যাণ্ডের রেনসেনব্রিঙ্কের সহস্রতম বিশ্বকাপের গোলকে স্মরণীয় করার জন্য একটি স্মারক টিকিট বার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঠিক হয় এই টিকিটের ওপর লেখা থাকবে গোল ১,০০০ হাজার, রেনসেনব্রিঙ্ক (হল্যাণ্ড), মেনডোজা

জুন ১১, ১৯৭৮। বলা বাহুল্য এই রেনসেনব্রিঙ্ক গত বিশ্বকাপেও হল্যাণ্ডের সদস্য ছিলেন।

পরিশেষে বলি, হল্যাণ্ডকে হারিয়ে আর্জেন্টিনার ফিফা জয়—তাদের জনজীবনে এনে দিয়েছিল এক অপার প্রেরণা। তাদের প্রতিশ্রুতি, ১৯৮২'র বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা স্পেনে আবার লড়াই করবে, রক্ষা করতে চেষ্টা করবে ফিফা জয়ের সম্মান। তারই জন্য এক বিশ্বকাপের শেষে আর এক বিশ্বকাপের প্রস্তুতি এখনই। লক্ষ্য তাই আমাদের দ্বাদশ বিশ্বকাপে—কোন দেশ সাফল্য পাবে? কোথায় যাবে ফিফা—ইউরোপ নাকি ল্যাটিন আমেরিকায়?

'এস্‌পেনা'—৮২

১৯৮২।

ইউরোপের শ্রেষ্ঠভূমি স্পেনে অনুষ্ঠিত হলো দ্বাদশ বিশ্বকাপ আসর। শিল্প ও সংস্কৃতির পীঠস্থান এবং পেশাদার ফুটবলের তীর্থভূমি স্পেনের মাদ্রিদ নতুন রূপে সুসজ্জিত হলো। এই আসরকে কেন্দ্র করে সমগ্র স্পেনে ছড়িয়ে পড়লো ফুটবলের হৃদয় উচ্ছ্বাস। বিশ্ব ফুটবলে স্পেনই প্রথম দেশ যারা এই বিরাট মহোৎসবকে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিলেন। সারাদেশের মোট চোদ্দটি শহরের আঠারোটি স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলিকে সমান ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হলো। রাজধানী মাদ্রিদ নির্বাচিত হলো প্রতিযোগিতার মূল কেন্দ্র হিসাবে। এছাড়া খেলাগুলি বণ্টন করা হলো ভ্যালেনসিয়া, লাকরুনা, মেলাখা, আলিকান্ত, এলছি, সোভিয়া, ওভিয়েদো, খারাখিজোন, বিলবাও, ভাদোলিদ, খিজোন এবং বার্সিলোনায়। বলা বাহুল্য বার্সিলোনা স্পেনের সর্বাপেক্ষা জীবন্ত এবং সংস্কৃতি সমৃদ্ধ শহর।

ভূমধ্য সাগরের ওপর অবস্থিত পাহাড়-ঘেরা সুদৃশ্য বার্সিলোনা বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠচিত্র শিল্পী পিকাশোর জাদু মোহনীর সেরা স্থান। এই শহরের বুকে যেমন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে শিল্পসংস্কৃতির প্রতীক হিসাবে বিখ্যাত ক্যাথলিক গির্জা সহ পিকাশোর শ্রেষ্ঠ শিল্প মিউজিয়াম, তেমনি এই শহরের বুকেই গড়ে উঠেছে ফুটবলের শ্রেষ্ঠ স্টেডিয়াম—'নিউ ক্যাম্প স্টেডিয়াম,' যা দ্বাদশ বিশ্বফুটবল উৎসবের শুভ উদ্বোধনী স্থানের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য ফাইনাল ম্যাচের জন্য নির্বাচিত হয় মাদ্রিদের সান্তিয়াগো স্টেডিয়াম।

সংগঠক দেশ হিসাবে স্পেনের সমস্ত শহরগুলিকে নানান বর্ণ মাধুর্যে চিত্রিত করা হয়। দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হলো স্পেনীয় শিল্প মাধুর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলিকে। বিশেষ ভাবে বর্ধিষ্ণু বার্সিলোনা ও মাদ্রিদ শহরকে অলংকৃত করা হলো পিকাশোর আঁকা শ্রেষ্ঠ চিত্র-গুলিকে দিয়ে। এই উপলক্ষে নিউইয়র্ক থেকে প্রচুর অর্থব্যয় করে রাজধানী মাদ্রিদে আনা হলো পাবলো পিকাশোর অঙ্কিত সেরা চিত্র—'গুয়েরনিকাকে'। বলা বাহুল্য পিকাশোর এই ছবিটি ছিল হিংসা ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে। এঁকেছিলেন তিনি প্যারিসে বসে। পরে ছবিটি নিউইয়র্কে চলে যায়।

স্পেনে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ বিশ্বকাপ আসরে বেশ কিছু নিয়ম সংশোধন করা হয়। এই প্রথম বিশ্বকাপে ষোলটি দেশের বদলে শ্রেষ্ঠ চব্বিশটি দেশকে মূল প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে দেখা যায়।

এবারের আসরে মস্ত অঘটন শুরুতেই ঘটে যায়। গত দু' দুবারের রার্নাস হল্যাণ্ড মূল প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে নি। আসতে পারে নি উরুগুয়ে।

চব্বিশ দলকে প্রথম পর্যায়ে মোট চারটি করে দল নিয়ে ছটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। ঠিক হয় প্রথম পর্যায়ের লীগভিত্তিক খেলা শেষ হওয়ার পর ছটি গ্রুপের প্রথম ও দ্বিতীয় দলকে বেছে নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগ ভিত্তিক খেলা। এই পর্যায়ে বারোটি

দলকে ভাগ করা হবে চারটি গ্রুপে। এই চারটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান দলকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে যথাক্রমে দুটি সেমিফাইনাল এবং পরে ফাইনাল ম্যাচ।

স্পেনের আসরে চব্বিশটি দলের মধ্যে ব্রাজিল ছিল সবার ফেভারিট। এছাড়া সম্ভাব্য তালিকায় ব্রাজিলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আর্জেন্টিনা, পশ্চিম জার্মানী, ইতালি, সোভিয়েত ইউনিয়নের নাম। বলা বাহুল্য এই পাঁচটি দেশ ছিল প্রথম সারির দল। এছাড়া ইউরোপ থেকে এই আসরে যোগ দিয়েছিল, যুগোশ্লাভ, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লাভিয়া, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, হাঙ্গেরী, স্পেন সহ ইংল্যাণ্ড, উত্তর আয়ারল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, এবং ল্যাটিন আমেরিকার ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা ছাড়া পেরু, চিলি, সালভাদর, হণ্ডুরাস, আফ্রিকার আলজিরিয়া, এশিয়ার কোয়েত এবং নিউজিল্যাণ্ড।

বিশ্বকাপের মূল প্রতিযোগিতার প্রথম পর্যায়ের চব্বিশটি দলকে নিম্নলিখিত ছটি ভাগে ভাগ করা হয়। এই ভাগ হয় যথাক্রমে ঃ

১ গ্রুপ ইতালি, ক্যামরুন, পোল্যাণ্ড ও পেরু।

২ গ্রুপ পশ্চিম জার্মানী, অস্ট্রিয়া, চিলি ও আলজিরিয়া।

৩ গ্রুপ আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, হাঙ্গেরী, সালভাদর।

৪ গ্রুপ ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, চেক ও কুয়েত।

৫ গ্রুপ যুগোশাভ, হণ্ডুরাস, স্পেন ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ড।

৬ গ্রুপ ব্রাজিল, রাশিয়া, স্কটল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড।

১৪ই জুন শুরু হয় দ্বাদশ বিশ্বকাপের উদ্বোধনী আসর। বার্সিলোনার নিউক্যাম্প স্টেডিয়ামে এই উদ্বোধনী আসরে মুখোমুখি হলো তিন নম্বর গ্রুপের বেলজিয়াম দলের সঙ্গে গত বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ান দুর্ধর্ষ আর্জেন্টিনা দল।

বর্ণাঢ্য উদ্বোধনে বেলজিয়ামের চমক

বার্সিলোনার নিউক্যাম্প স্টেডিয়াম রঙের বাহারে সুসজ্জিত হয়েছিল উদ্বোধনী আসরকে কেন্দ্র করে। প্রায় পঞ্চাশ মিনিট গোটা স্টেডিয়াম ছিল উৎসবের মেজাজে ভরপুর। চারদিক সুসজ্জিত ছিল রঙিন কাগজ ও বেলুনের বাহারে। হাজার হাজার রঙিন আলোর মধ্যে খুশির বাজি মুক্ত আকাশকে রং-বেরঙে রঞ্জিত করে তুলেছিল। ব্যাণ্ড বাজলো। পতাকা উড়লো। উড়ানো হলো হাজার হাজার সাদা পায়রা সহ রঙিন বেলুন। মাঠ জুড়ে দেখা গেল মধ্যযুগীয় স্পেনীয় রাজপোশাকে সুসজ্জিত পনেরো ফুট উচ্চতার চল্লিশটি পুতুল —যাদের গায়ে বড় হরফে লেখা ছিল—

"এস্‌পেনা—৮২"—মানভিয়াল ফিফা"।

অনুষ্ঠানের তেইশ মিনিটের মাথায় রাজা জুয়ান কার্লোস এবং রানী সোফিয়া স্টেডিয়াম মঞ্চে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ফিফার সভাপতি।

বার্নাঢ্য মুখর নিউক্যাম্প স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচে উপস্থিত ছিলেন প্রায় সত্তর হাজার দর্শক—এদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ ছিলেন আর্জেন্টিনার সমর্থক। হাতে তাদের নীল-সাদা পতাকা, কেউ বাজালেন ড্রাম-বিউগিল।

পঞ্চাশ মিনিট উৎসব মুখর মেজাজ অতিবাহিত হওয়ার পর শুরু হলো বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ। এই ম্যাচে আর্জেন্টিনার জয় সম্পর্কে এক রকম প্রায় সবাই নিশ্চিত ছিলেন। তাদের দলের অন্যতম সুপার স্টার মারাদোনা ছিলেন এই আসরের অন্যতম আকর্ষণ। অথচ দুর্ভাগ্য, উদ্বোধনী ম্যাচে শক্তিহীন বেলজিয়ামের

রক্ষণভাগ মারাদোনাকে এমন ভাবে বেঁধে রাখলেন, যার ফলে তার পক্ষে সম্ভব ছিল না দলের আক্রমণকে সাহায্য করা। এই ম্যাচের তেষট্টি মিনিটের মাথায় বিশ্বের কাছে চমক আনলেন ভাণ্ডারবার্গ। তিনি ফ্রাঙ্ক ডারকাউটেনের কাছ থেকে বল পেয়ে বেশ কিছুটা ছুটে গিয়ে প্রচণ্ড গতিতে গোলে শট নিলেন—ভাণ্ডারবার্গের শট আগুয়ান আর্জেন্টিনার গোল রক্ষক ফিল্লের পক্ষে ধরা সম্ভব হলো না, ফলে এই একটি গোলের সুবাদেই দ্বাদশ বিশ্বকাপের শুরুতেই বিস্ময় সৃষ্টি করে ম্যাচ হারলো গতবারের চ্যাম্পিয়ান আর্জেন্টিনা। ১৯৬২ সালে চিলির বিশ্বকাপের পর, এই প্রথম দেখা গেল উদ্বোধনী ম্যাচের মীমাংসা হতে। এর আগের চারটি বিশ্বকাপের উদ্বোধনী আসর ফলশূন্য ভাবেই শেষ হয়েছিল—অতএব ভাণ্ডারবার্গের এই গোল শুধু যে দ্বাদশ বিশ্বকাপের কাছে চমক সৃষ্টি করেছিল তাই নয় সেই সঙ্গে সৃষ্টি করেছিল এক ঐতিহাসিক নজির। বেলজিয়ামের এই জয়ের পরিপ্রেক্ষিতে খুশী হতে পারেন নি আর্জেন্টিনার কোচ মিনেত্তি। তিনি ভাণ্ডারবার্গের গোলটিকে অবৈধ বলে দাবী করেন। কিন্তু মিনেত্তির এই অভিযোগ যে সঠিক ছিল না তা স্পষ্ট বোঝা গেল দূর-দর্শনের স্লোমোশান চিত্রের মাধ্যমে।

উদ্বোধনী ম্যাচে আর্জেন্টিনার এই পরাজয়, শুরুতেই চমক সৃষ্টি করলো, সেই সঙ্গে নতুন করে প্রেরণা এনে দিল অন্যান্য দলগুলির মধ্যে।

পরের দিন—অর্থাৎ ১৪ জুন অনুষ্ঠিত হলো বিশ্বকাপের সেরা দুটি ম্যাচ। ভিগোর বালাইদস স্টেডিয়ামে ইতালি মিলিত হলো পোল্যাণ্ডের সঙ্গে, সেভিয়ায় সাশ্চেস পিজুয়ান স্টেডিয়ামে ব্রাজিলকে খেলতে হলো সোভিয়েতের সঙ্গে।

ভিগোয় অনুষ্ঠিত ইতালি-পোল্যাণ্ডের ম্যাচটি আদৌ প্রাণবন্ত ছিল না, উভয় দলই আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ায় খেলার মধ্যে কোন ফলাফল তৈরি হলো না। গোটা ম্যাচে ইতালির একটি মাত্র শট

একাশি মিনিটের মাথায় পোল্যাণ্ড দলের পোস্টে লেগে ফিরে যায়— শটটি করেছিলেন মার্কো তারাডলি। এই একটি মাত্র শট ছাড়া গোটা ম্যাচে আর কোন আলোচ্য বিষয় ছিল না। এই প্রসঙ্গে পাঠকদের জানিয়ে রাখি ইতালির বর্ষীয়ান গোলরক্ষক ডিনোডফ, একচল্লিশ বছর বয়সে তার শততম আন্তর্জাতিক ম্যাচটি খেললেন।

সেভিয়ায় ফেবারিট ব্রাজিলকে দুরন্ত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলো সোভিয়েত ইউনিয়ন। কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গড়া ম্যাচটি হয়ে উঠেছিল প্রাণবন্ত। ম্যাচ শেষ হওয়ার পনেরো মিনিট আগে পর্যন্ত সোভিয়েত দল এগিয়েছিল এক শূন্য গোলে। শেষ পনেরো মিনিটে খেলার চিত্র বদলে যায়। ব্রাজিল দলের সমস্ত খেলোয়াড়েরা একসঙ্গে ওপরে উঠে গিয়ে আক্রমণ শানাতে উদ্যোগী হন। ফলে শেষ মুহূর্তে ব্রাজিল ব্যবধান মুছে ফেলে নিশ্চিত পরাজয়কে সরিয়ে দেখতে পায় একটি সত্যিকার জয়ের চেহারা। ম্যাচটি শুরু হয় উভয়পক্ষের ঝড়ো আক্রমণের মধ্য দিয়ে। ৩৩ মিনিটের মাথায় প্রায় তিরিশ গজ দূর থেকে শট নিয়ে সোভিয়েত দলকে এগিয়ে দিলেন আন্দ্রেই বল। গোলটি খুব একটা দর্শনীয় ছিল না, বরং এই শটটি কেন যে ওয়ালডির দোবেস ধরতে পারলেন না তা ঠিক বোঝা গেল না। পিছিয়ে পড়া ব্রাজিল শেষ মুহূর্তে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সোভিয়েত সীমানায়। ৭৩ মিনিটের মাথায় ব্রাজিলের অধিনায়ক এবং চিকিৎসক সক্রেটিসের একটি জোরালো সোয়ার্ভিং শটে প্রথম ব্যবধান মুছে ফেলে দলের মধ্যে প্রেরণা জাগিয়ে তোলে। এরপর জয়-সূচক দৃষ্টিনন্দন গোলটি করেন বুদ্ধিমান এডগার। বক্সের বাইরে জিকোর থ্রু পাসে একজন ফলস দিলে পিছন থেকে উঠে আসা এডগার চকিতে গোলে শট নিলেন, যা রাশিয়ান গোলরক্ষকের পক্ষে ধরা সম্ভব হলো না, ফলে অপ্রত্যাশিতভাবে শেষ পনেরো মিনিটে দু-দুটি গোল দিয়ে পিছিয়ে পড়া ব্রাজিল ম্যাচ জিতে গেল।

লা করুণায় এক নম্বর গ্রুপে পেরু ও ক্যামরুনের মধ্যে ম্যাচটি শেষ

হলো গোলশূন্য ভাবে। এলছিতে এল. সালভাদরকে শোচনীয় ভাবে বিধ্বস্ত করলো হাঙ্গেরী। তারা এই ম্যাচে জয় পেল ১০-১ গোলে। এই একপেশে খেলায় হাঙ্গেরীর পক্ষে হ্যাটট্রিক করলেন লাসজালো কিস। তিনি দিলেন তিনটি গোল। এছাড়া ছুটি করে গোল দিলেন মিলসি ও ফ্যাজেকাস এবং একটি করে গোল এলো টথ, জেন্টেস ও পালোস্কেইয়ের শট থেকে। বিশ্বকাপ আসরে বড় সড় ব্যবধানে জেতার এটি হলো এক নয়া নজির। এর আগে ১৯৭৪ সালে মিউনিখের আসরে যুগোশ্লাভিয়া ৯-০ গোলে ম্যাচ হারিয়েছিল নবাগত জায়েরকে।

মেলাখায় স্কটল্যাণ্ড সহজ জয় পেল নবাগত নিলজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। তারা এই ম্যাচে জিতলো ৫-৩ গোলের ব্যবধানে।

বিস্ময় সৃষ্টি করলো আলজিরিয়া

খিজোনে এল মলিনন স্টেডিয়ামে বিস্ময় সৃষ্টি করলো আলজিরিয়া ছুরন্ত পশ্চিম জার্মানী, যারা স্পেনের আসরে প্রথম সারির দল হিসাবে চিহ্নিত, তাদের হারিয়ে আলজিরিয়া যে অসাধ্য সাধন করতে পারবে, মনে হয় ম্যাচটি শেষ হওয়ার পরও অনেকে বিশ্বাস করতে পাচ্ছিলেন না। এই ম্যাচে আলজিরিয়া আগাগোড়া প্রাধান্য বজায় রেখেছিল। তাদের ছুটি গোলই এসেছিল ভাল খেলার ফলশ্রুতি হিসাবে। প্রথম গোলটি আসে ৫৩ মিনিটের মাথায়, যখন লাখদার বেলৌমির চমৎকার সেণ্টার জার্মান গোল-রক্ষকের মাথার ওপর দিয়ে টপকে যেতেই মাডজার বলটিকে গোলে ঠেলে দেয়। এই গোলের পর জার্মান খেলোয়াড়েরা যেন সংবিত ফিরে পান। তারা শুরু করেন একের পর এক বোমারু আক্রমণ। এই সময় অভাবনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে আক্রমণের মোকাবিলা করতে থাকেন আলজিরিয়ান গোলরক্ষক মেধি কারবা। তিনি একাই

সমগ্র জার্মান শক্তি চাপকে আগলাতে থাকেন। ৬৮ মিনিটের সময় হেনজ রুমেনিগে অসাধ্য সাধন করেন। তার একটি জোরালো শট মেধি কারবাকে পরাস্ত করলে ম্যাচের মধ্যে সমতা ফিরে পায় পশ্চিম জার্মানী। কিন্তু এই সমতা পশ্চিম জার্মানী ধরে রাখতে পারলো না। পরের মিনিটেই পাল্টা আক্রমণে গিয়ে আলজিরিয়া আবার বাড়িয়ে নিলো ব্যবধান। লখিদার বালৌসির চমৎকার প্রয়াসে ৬৯ মিনিটে জয়-সূচক গোল পেয়ে গেল আলজিরিয়া—এই জয়ের ফলেই তারা বিশ্ব ফুটবলে বিস্ময় সৃষ্টি করে বিগত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান পশ্চিম জার্মানীকে ম্যাচ হারতে বাধ্য করলো।

আলজিয়ার হাতে পশ্চিম জার্মানীর এই পরাজয়কে বিশ্বের সুধীজন, বিশ্বকাপ আসরের এক সেরা অঘটন বলে চিহ্নিত করলেন। তারা বললেন, ১৯৫০ সালে আমেরিকার হাতে ইংল্যাণ্ডের পরাজয়ের পর, এতবড় অঘটন বিশ্ব ফুটবলে আর ঘটে নি। তবে তারা এও স্বীকার করলেন, আলজিরিয়ার এই জয় মোটেই দৈবকৃত নয়, তারা যোগ্য দল হিসাবেই ম্যাচে জয় পেয়েছে।

ভ্যালেনসিয়ার সংগঠক দেশ স্পেন ১-১ গোলে খেলা শেষ করলো হণ্ডুরাসের সঙ্গে। বিলবাওতে ফ্রান্সকে চমৎকার ফুটবল খেলে ৩-১ গোলে হারালো ইংল্যাণ্ড।

২ নম্বর গ্রুপে ওভিয়েদোতে অস্ট্রিয়া ১-০ গোলে ম্যাচ হারালো চিলিকে। ২২ মিনিটের মাথায় অস্ট্রিয়ার পক্ষে চমৎকার এই গোলটি দিলেন স্খাশনার। ৫ নম্বর গ্রুপে উত্তর আয়ারল্যাণ্ড বনাম যুগোশ্লাভিয়ার ম্যাচ খারাখোজাতে শেষ হলো গোলশূন্য ভাবে। নবাগত কুয়েত আবার বিস্ময় সৃষ্টি করে ভাদোলিদে ম্যাচ রুখে দিলো চেকোশ্লাভিয়াকে। উভয় দলই দিলো একটি করে গোল। প্রথম ২১ মিনিটের মাথায় চেকদল পেনালটি থেকে গোল পেয়ে এগিয়ে যায়। ৫৮ মিনিটে কোয়েতের পক্ষে গোলটি শোধ করলেন ফাইসল আল দাখিল। তার এই গোলটি নিঃসন্দেহে ছিল প্রশংসনীয়।

এক নম্বর গ্রুপে ইতালি আবার পয়েন্ট হারালো। গত ম্যাচে তারা পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ভাবে খেলা শেষ করেছিল, এবার ভিখোয় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ম্যাচ ইতালি বিবর্ণ খেলে খেলা শেষ করলো ১-১ গোলে। ১০ মিনিটের মাথায় বুনোকস্তি প্রথম গোল দিয়ে ইতালিকে এগিয়ে দিলেন। কিন্তু এই ব্যবধান শেষ মুহূর্তে মুছে দিলো পেরু। কঠিন লড়াই করে ৮২ মিনিটের মাথায় তারা গোল করলেন—গোল দিলেন পেরুর ডিয়াজ।

আলিকান্তে আর্জেন্টিনা-হাঙ্গেরীর লড়াই হলো উপভোগ্য। গত ম্যাচে বেলজিয়ামের কাছে পরাজয়ের গ্লানিকে মনের মধ্যে কোনরকম স্থান না দিয়ে আর্জেন্টিনা অতি সহজে ৪-১ গোলে ম্যাচ হারালো হাঙ্গেরীকে। এই ম্যাচে স্বমূর্তিতে দেখা গেলো মারাদোনাকে। গত ম্যাচের সমস্ত জড়তা ও দুর্বলতা কাটিয়ে মারাদোনা এই ম্যাচে দলকে সক্রিয় করে তুললেন। তার প্রচণ্ড গতির কাছে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় হাঙ্গেরীর রক্ষণভাগ। তারা মারাদোনাকে কিছুতেই বাগে আনতে পারলেন না। হাঙ্গেরীর সমস্ত স্ট্রাটিজিকে উল্টে দিয়ে একা মারদোনা দিলেন দুটি গোল। বাকি দুটি গোল এলো তারই দেওয়া পাস থেকে। এই ম্যাচে হাঙ্গেরীর গোলরক্ষক ফেরেক্স মায়াডোয়ারের ভূমিকা ছিল উল্লেখ করার মতো। একমাত্র তার জন্যই আর্জেন্টিনার পক্ষে যেমন ব্যবধান বাড়ানো সম্ভব হয় নি, তেমনি মারাদোনার পক্ষে সম্ভব হয় নি হ্যাটট্রিক করা। খেলার ৬১ মিনিটের মাথায় আর্জেন্টিনা ৪-০ গোলে এগিয়ে যায়। ৭৬ মিনিটের মাথায় হাঙ্গেরীর পক্ষে একটি মাত্র গোল করলেন পালোস্কেই।

সেভিয়ায় ব্রাজিল অনবদ্য ফুটবল খেলে দ্বিতীয় ম্যাচে অতি সহজে জয় পেলো স্কটদলের বিরুদ্ধে। ব্রাজিলের এই জয়ের জন্য কোনরকম গা ঘামানোর প্রয়োজন হলো না। শিল্পসমৃদ্ধ ব্রাজিলের দলবদ্ধ ফুটবল তাদের সহজে জয় এনে দিলো। সঙ্গীতের সুরে, নৃত্যের ছন্দে ব্রাজিল দল এমন গতিবেগ সৃষ্টি করেছিল, যার সঙ্গে স্কট দল

কোনরকমেই সঙ্গতি বজায় রাখতে পারলো না। অনবদ্য ভূমিকায় জিকো গোটা দলকে সারা মাঠ জুড়ে খেলালেন। ব্রাজিলের মসৃণ ও বিন্যস্ত ক্রীড়াধারার পাশে স্কটদলের পক্ষে মাঝ মাঠ অতিক্রম করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল। ব্রাজিল যে বিশ্বের একটি সেরা দল, তারা যে স্পেনে চতুর্থবার বিশ্বকাপ জয়ের জন্য আত্মবিশ্বাস নিয়ে তৈরি হয়ে এসেছে তা এই ম্যাচেই স্পষ্ট বোঝা গেল। ৩৩ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল দিলেন জিকো। তার এই গোল খেলার মধ্যে সমতা ফিরিয়ে আনে। খেলার ১৮ মিনিটের মাথায় স্কটদল একটি ফাঁকায় বল পেয়ে গোল করে যায়, গোলটি করেন নায়ডান। এই ম্যাচে স্কটল্যাণ্ড প্রথম দিকে কিছুটা আক্রমণের ভূমিকা নেয়। কিন্তু তাদের সমস্ত গঠনমূলক পরিকল্পনা ভেস্তে যায় গোলটি হওয়ার পর। ব্রাজিলের সঙ্ঘবদ্ধ ঝড়ো আক্রমণ সামলাতে তারা কোণঠাসা হয়ে পড়েন। প্রথম গোল দিলেন ব্রাজিলের সেরা ফুটবলার জিকো। এরপর ৪৮ মিনিটে গোল দিলেন আসকার, এডগার এবং শেষ গোলটি দিলেন ৮৬ মিনিটে ফালকাও। এই ম্যাচে জয়ের সুবাদে ব্রাজিল দুটি খেলায় চার পয়েন্ট সংগ্রহ করে দ্বিতীয় পর্যায়ে খেলার ব্যাপারে একরকম প্রায় নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। তাদের শেষ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হলো ২২ জুন এই সেভিয়ায়। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয় নিউজিল্যাণ্ড দলের সঙ্গে। এই ম্যাচে নবাগত নিউজিল্যাণ্ড শোচনীয়ভাবে বিধ্বস্ত হলো। ব্রাজিলের শিল্পসুষমা মিশ্রিত ফুটবলের জাদু মায়ামুগ্ধ করে রেখেছিল নব্বুই মিনিট। ব্রাজিল তাদের পুরনো ধাঁচের ফুটবলকে এই ম্যাচে আগাগোড়া বহাল রেখেছিলো। একদিকে তাদের অনুপম শিল্পছন্দ, আর এদিকে প্রচণ্ড গতি—নিউজিল্যাণ্ড দলকে কোন মুহূর্তের জন্য মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয় নি। খেলা দেখে মনে হয়েছে একদল ছাত্র যেন গুরুর কাছে বসে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শিক্ষায় লিপ্ত। এই ম্যাচে ব্রাজিলের পক্ষে প্রথম স্বপ্নের গোলটি দিলেন জিকো। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোলটি দিলেন এডগার এবং শেষ গোলটি এলো ফালকাওয়ের

জোরালো শট থেকে। ব্রাজিল এই জয়ের ফলে প্রথম পর্যায়ের ৬ নম্বর গ্রুপে হলো চ্যাম্পিয়ান। এই গ্রুপে দ্বিতীয় হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন। তারা তিনটি ম্যাচে তিন পয়েন্ট পেয়ে পৌঁছে গেল গোল এ্যাভারেজে দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলায়। প্রথম ম্যাচে সোভিয়েত ২-১ গোলে ব্রাজিলের কাছে হার স্বীকার করার পর জয় পেলো দ্বিতীয় ম্যাচে নিউজিল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচে তারা ৩-০ গোলে পরাস্ত করেন নিউজিল্যাণ্ডকে। শেষ ম্যাচে অবশ্য কঠিন লড়াই করেও সোভিয়েত দল জয়ের মুখ দেখতে পেল না স্কটদলের বিরুদ্ধে। তারা প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলে রুখে দিল রুশীদের। শ্বাসরুদ্ধকারী ম্যাচটি শেষ হলো ২-২ গোলে। এই ম্যাচে সোভিয়েত দল শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ২-১ গোলে এগিয়ে থেকেও জয়লাভে বঞ্চিত হলো। খেলা ভাঙার দু'মিনিট আগে স্কট অধিনায়ক সোনেস মূল্যবান গোলটি দিয়ে খেলায় সমতা নিয়ে এলেন। এত করেও স্কটদল কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌঁছাতে পারল না। তাদের হাত থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে ওঠার সুযোগ ছিনিয়ে নিয়ে গেল সোভিয়েত দল। এই গ্রুপে (৬ নম্বর) প্রথম পর্যায়ের ফলাফল দাঁড়ালো :—

ব্রাজিল	৩—৩—০—০—১০— ২—৬
সোভিয়েত	৩—১—১—১— ৬— ৪—৩
স্কটল্যাণ্ড	৩—১—১—১— ৮— ৮—৩
নিউজিল্যাণ্ড	৩—০—০—৩— ২—১২—০

(ব্রাজিল ও সোভিয়েত দ্বিতীয় পর্যায়ে ওঠে।)

এক নম্বর গ্রুপে পোল্যাণ্ড চ্যাম্পিয়ান

আগেই বলেছি এক নম্বর গ্রুপের ফেবারিট দল ইতালি পরপর দুটি ম্যাচে খুব একটা সুবিধে করতে পারে নি। আত্মরক্ষায় ব্যস্ত ইতালিয়ানরা বিবর্ণ ম্যাচ খেলে পরপর দুটি ম্যাচে জয়ের মুখ দেখতে

পেলো না। এই গ্রুপে একই অবস্থা দাঁড়ালো শক্তিশালী পোল্যাণ্ড দলের। তারা ইতালির বিরুদ্ধে ম্যাচের ফলাফলে দ্বিতীয় ম্যাচেও খেলা শেষ করলো কমজোরী ক্যামেরুনের বিরুদ্ধে। ফলে এই গ্রুপে তিনটি দলের মধ্যে শুরু হলো প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তৃতীয় ম্যাচে পোল্যাণ্ড পেরুকে ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত করে দ্বিতীয় পর্যায়ে খেলার সুযোগ তৈরি করে নিলো। অন্যদিকে ইতালিকে আবার শেষ ম্যাচে রুখে দিল ক্যামেরুন। তারা ম্যাচ শেষ করলো ১-১ গোলে। ফলে এক নম্বর গ্রুপের ফলাফল দাঁড়ালো যথাক্রমে ঃ—

পোল্যাণ্ড	৩—১—২—০—৩—১—৪
ইতালি	৩—০—৩—০—২—২—৩
ক্যামেরুন	৩—০—৩—০—১—১—৩
পেরু	৩—০—২—১—৬—২—২

(পোল্যাণ্ড ও ইতালি উঠলো দ্বিতীয় পর্যায়ে)

বেলজিয়ামের কোয়েকের সেরা গোল

উদ্বোধনী ম্যাচে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে স্পেনের বিশ্বকাপে চমক এনেছিল বেলজিয়াম। এই ম্যাচে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণের সামনে দুরন্ত আর্জেন্টিনা ম্যাচ হারতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় ম্যাচে সেই বেলজিয়াম আবার জয় পেল সালভাদর দলের বিরুদ্ধে। হাঙ্গেরীর কাছে শোচনীয় ভাবে বিধ্বস্ত সালভাদর এই ম্যাচে যথেষ্ট ভাল ফুটবলের পরিচয় দিল। এলছির নুয়েভো স্টেডিয়ামে ম্যাচটি ছিল প্রবল উত্তেজনা ভরা। গোলের জন্য বেলজিয়ামকে যথেষ্ট লড়াই করতে হয়। এই দিন মধ্য আমেরিকার সালভাদর মূলতঃ রক্ষণাত্মক নীতিতে খেলা শুরু করে। তাদের রক্ষণভাগের কঠিন দৃঢ়তায় বেলজিয়াম কোনক্রমেই সুবিধে করতে পারে নি। খেলায় একটি

মাত্র গোল আসে আঠারো মিনিটের মাথায়। প্রায় পঁয়ত্রিশ গজ দূর থেকে নেওয়া একটি ফ্রিকিক থেকে বেলজিয়ামের পক্ষে জয় সূচক গোলটি করেন কোয়েক। তার এই শটটি বাতাসে অসম্ভব রকম বাঁক নিয়ে গোলে প্রবেশ করে। কোয়েকের এই গোলটি নিঃসন্দেহে এবারের বিশ্বকাপের সেরা গোল। সাতান্ন মিনিটের সময় এই কোয়েক ৪০ গজ দূর থেকে আর একটি দর্শনীয় শট করেছিলেন। বলটি এ ক্ষেত্রে অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল। এলছিতে শেষ ম্যাচে বেলজিয়াম হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে ১-১ গোলে খেলা শেষ করার সুবাদে অতি সহজে উঠে গেল দ্বিতীয় পর্যায়ে। এই ম্যাচে হাঙ্গেরীর ভার্গা প্রথম গোল দিয়ে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধের ৭২ মিনিটে বেলজিয়ামের পক্ষে গোলটি শোধ করলেন জারনিয়াটিনস্কি। এই ম্যাচ অমীমাংসিত রাখার সুবাদে বেলজিয়াম তিনটি খেলায় পাঁচটি পয়েন্ট লাভ করে তিন নম্বর গ্রুপে চ্যাম্পিয়ান হলো। দ্বিতীয় দল হিসাবে এই গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগে জায়গা পেল গতবারের চ্যাম্পিয়ান আর্জেন্টিনা। তিন নম্বর গ্রুপের লীগ শেষে ফলাফল দাঁড়ালো ঃ—

বেলজিয়াম	৩—২—১—০— ৩— ১—৫
আর্জেন্টিনা	৩—২—০—১— ৩— ২—৪
হাঙ্গেরী	৩—১—১—১—১২ – ৬—৩
সালভাদর	৩—০—০—৩— ২—১৩—০

ইংল্যাণ্ড সবকটি খেলায় জিতলো

চার নম্বর গ্রুপের প্রথম খেলায় ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সকে হারালো ৩-১ গোলে। এই খেলায় ইংল্যাণ্ড খেলোয়াড়েরা অসাধারণ বিন্যস্ত ফুটবলের পরিচয় দিলেন। এই গ্রুপে প্রথম চমক আনলো এশিয়ার কোয়েত দল। তারা প্রথম ম্যাচে রুখে দিল চেকশ্লোভিয়াকে। ইংল্যাণ্ড

দ্বিতীয় ম্যাচে এই চেক দলকে হারালো ২-০ গোলে। গোল দিলেন ফ্রান্সিস। ফ্রান্স দ্বিতীয় ম্যাচে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে শোচনীয় ভাবে বিধ্বস্ত করলো কোয়েতকে। এই ম্যাচে ফ্রান্সের পক্ষে ৮১ মিনিটের মাথায় বোসিস চতুর্থ গোলটি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোয়েতের খেলোয়াড়েরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। তারা গোলটি বাতিল করার দাবী জানিয়ে মাঠ ছেড়ে চলে যান। তাদের অভিযোগ এই গোলটির সময় মাঠের বাইরে থেকে বাঁশির শব্দ শোনার ফলে কোয়েতের খেলোয়াড়েরা কিছুটা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছিলেন এবং সেই সুযোগেই ফ্রান্স এই গোলটি দিয়ে দেয়। সাত-আট মিনিট ম্যাচ বন্ধ থাকার পর রেফারি আলোচনা ভিত্তিতে গোলটি বাতিল করে খেলাটি পুনরায় চালু করেন। কোয়েতের দুর্ভাগ্য—তারা এত কাণ্ড করেও চতুর্থ গোলটি এড়িয়ে যেতে পারে নি—বাতিল হওয়া চতুর্থ গোলটির জায়গায় আইন সম্মতভাবে খেলার অন্তিমলগ্নে গোলটি করলেন সেই ম্যাক্সিম বোসিসই। ফ্রান্সের পক্ষে সেদিন বাকি তিনটি গোল করেন স্বেংঘিনি, প্লাতিনি এবং ডিডিয়ার সিক্স। কোয়েতের পক্ষে একটিমাত্র গোল করেন আবদুল্লা বুলোসি। শেষ ম্যাচে ফ্রান্স চেকশ্লোভিয়ার সঙ্গে ১-১ গোলে খেলা শেষ করায় তারা পায় দ্বিতীয় পর্যায়ে খেলার সুযোগ। ইংল্যাণ্ড তাদের প্রথম পর্যায়ের খেলা শেষ করলো কুয়েতকে ১-০ গোলে হারিয়ে। গোলটি দিলেন ট্রেভর ফ্রান্সিস। এই জয়ের সুবাদে ইংল্যাণ্ড তিনটি ম্যাচে পেলো পুরো পয়েন্ট। বলা বাহুল্য প্রথম পর্যায়ের লীগে একমাত্র ইংল্যাণ্ড ও ব্রাজিল ছাড়া আর কোন দলই পুরো পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারে নি। চার নম্বর গ্রুপের ফলাফল দাঁড়ালো :—

ইংল্যাণ্ড	৩—৩—০—০—৬—১—৬
ফ্রান্স	৩—১—১—১—৬—৫—৩
চেক	৩—০—২—১—২—৪—২
কোয়েত	৩—০—১—২—২—৬—১

(ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স দ্বিতীয় পর্যায়ে উঠলো।)

রুমেনিগা জার্মানীর মূলধন

খিজোনের এল মলিনন স্টেডিয়ামে পশ্চিম জার্মানী দাপটে ফুটবল খেলে আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে পূর্ব পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলে পুনরায় প্রতিযোগিতায় ফিরে এলো। জার্মান দলের এই জয়ের পিছনে মূল প্রেরণা যুগিয়েছিলেন ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল এবং বর্তমান জার্মান ফুটবলদলের অধিনায়ক কার্ল হেইনেজ রুমেনিগা। এই ম্যাচে রুমেনিগা একাই গোটা দলকে টেনে নিয়ে গেলেন। খেলার শুরুতে প্রথম গোল করলেন রুমেনিগা। পরের অর্ধে তিনি আরও দুটি গোল দিয়ে দিয়ে এবারের আসরে দ্বিতীয় ব্যক্তি হ্যাটট্রিক করলেন। প্রথম হ্যাটট্রিক এবারের আসরে করেছিলেন হাঙ্গেরীর কিস। দলের হয়ে এই ম্যাচে চতুর্থ গোলটি করলেন ৮০ মিনিটের মাথায় বদলি ফুটবলার রেইনর্ডাস। চিলির পক্ষে একটি মাত্র গোল করেন মাস্কোসো। বলা বাহুল্য এই ম্যাচটি পশ্চিম জার্মানীর কাছে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে প্রয়োজনীয় এই জয়—রুমেনিগা একার দায়িত্বে সেই জয় এনে দিয়ে পশ্চিম জার্মানীর মনে নতুন করে আশার আলো জ্বালিয়ে তুললেন। শেষ ম্যাচে পশ্চিম জার্মানী অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে রুবেশের গোলে জয় পেয়ে উঠে এলো দ্বিতীয় পর্যায়ে। এই গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় দল হিসেবে গোল এ্যাভারেজে জয় পেলো অস্ট্রিয়া। পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে শেষ ম্যাচে অস্ট্রিয়ার গড়া-পেটা খেলা দেখে দর্শকেরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। ম্যাচ শেষে বিক্ষুব্ধ জনতা জার্মান পতাকা পুড়িয়ে ফেললেন এবং মাঠে নেমে পড়ে ভাঙচুর শুরু করলেন। দর্শকদের এই আচরণ একেবারে মিথ্যে ছিল না। আলজিরিয়া যাতে ইউরোপীয় গোষ্ঠীকে হারিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে খেলার সুযোগ না পায় তার জন্য অনেকের ধারণায় ইউরোপের

দুটি দেশ যুক্তিবদ্ধ হয়ে এই গড়াপেটা ম্যাচটি খেলেন। এই খেলার চেহারা দেখে পৃথিবীর সেরা সাংবাদিকেরা উভয় দলকে যথেষ্ট নিন্দা করেন। প্রকাশ্যে ফিফার কাছে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আলজিরিয়ার তরফ থেকে অভিযোগপত্র পেশ করা হয়। কিন্তু ফিফা কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে মুখে কোন রা কাটলেন না যদিও ফিফা প্রেসিডেণ্ট ম্যাচটিকে নিন্দনীয় বলে ঘোষণা করেছিলেন। এই গ্রুপে শেষ পর্যন্ত ফলাফল দাড়ালো ঃ—

পশ্চিম জার্মানী	৩—২—০—১—৬—৩—৪
অস্ট্রিয়া	৩—২—০—১—৩—১—৪
আলজিরিয়া	৩—২—০—১—৫—৫—৪
চিলি	৩—০—০—৩—৩—৮—০

(পশ্চিম জার্মানী ও অস্ট্রিয়া দ্বিতীয় পর্যায়ে ওঠে।)

যুগোশ্লাভিয়া ম্যাচ ছেড়ে দিল

পাঁচনম্বর গ্রুপে কমজোরী হণ্ডুরাস এবার যথেষ্ট বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। তাদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ সংগঠনকারী দেশ স্পেন সর্ব-শক্তি প্রয়োগ করেও সহজে জয় পেলো না। প্রচণ্ড লড়াই করার পর ২৬ মিনিট বিতর্কিত একটি পেনালটি গোলে স্পেনের কাছে হার স্বীকার করতে বাধ্য হলো হণ্ডুরাস। এই গ্রুপে যুগোশ্লাভ ও আয়ারল্যাণ্ডের মধ্যে ম্যাচ শেষ হয় গোলশূন্য ভাবে। পরের ম্যাচে ফ্রান্স-যুগোশ্লাভের মধ্যে খেলাটি মোটেই উচ্চাঙ্গের হলো না। বরং এই ম্যাচে যুগোশ্লাভ যেভাবে প্রথমার্ধে খেলেছিল তাতে তাদের হারার কথা ছিল না। বরং একসময় তারা ১-০ গোলে এগিয়ে থাকে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে যুগোশ্লাভ যেন ইচ্ছাকৃতভাবে খেলার ওপর আগ্রহ ছেড়ে দিয়ে স্পেনকে জয়ের সুযোগ করে দিল। আত্মরক্ষায়

বিব্রত স্পেন যুগোশ্লাভের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে হারা ম্যাচ জিতে গেল পেনালটি থেকে। এই পেনালটির সিদ্ধান্ত মনে হয় যুগোশ্লাভিয়ার মানসিক দৃঢ়তায় চিড় ধরায়। তারা পরাজয় নিশ্চিত জেনে খেলার ওপর আগ্রহ ছেড়ে দেওয়ায় স্পেনের পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি করতে সাউরার কোন অসুবিধে হলো না। শেষ ম্যাচে যুগোশ্লাভিয়া হণ্ডুরাসকে ১-০ গোলে হারিয়েও কোন সুবিধে আদায় করতে পারল না। স্পেনের কাছে পরাজয়ের ফলে যুগোশ্লাভকে পিছিয়ে দিয়ে উত্তর আয়ারল্যাণ্ড উঠে যায় দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলায়। হণ্ডুরাস উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের কাছ থেকে বীরোচিত ভূমিকায় যুদ্ধ করে এই গ্রুপের শেষ খেলায় পয়েন্ট ভাগ করে নেয়। লীগ শেষে ফলাফল দাঁড়ালো :—

উত্তর আয়ারল্যাণ্ড	৩—২—১—০—২—১—৫
স্পেন	৩—১—১—১—৩—৩—৩
যুগোশ্লাভিয়া	৩—১—১—১—২—১—৩
হণ্ডুরাস	৩—০—২—১—৩—৪—১

(উত্তর আয়ারল্যাণ্ড ও স্পেন দ্বিতীয় পর্যায়ে উঠে।)

একটানা তেরোদিন বিশ্বকাপের প্রথম পর্যায়ের খেলা চলার পর শুরু হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলা। প্রথম পর্যায়ের চব্বিশ দল থেকে বারোটি দলকে নিয়ে শুরু হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের তালিকা। এই বারোটি দলের মধ্যে একমাত্র উত্তর আয়ারল্যাণ্ড ছাড়া বাকি এগারোটি দল হলো বাছাই দল।

বিশ্বকাপের প্রথম পর্যায়ে মোট গোল হল ১০১টি। এর মধ্যে সর্বাধিক গোল দেয় হাঙ্গেরী। তারা তিনটি ম্যাচে গোল দেয় মোট বারোটি। এই বারোটি গোলের মধ্যে একা সালভাদর দলের বিরুদ্ধে তারা গোল করে ১০টি। ব্রাজিল দল তিনটি খেলায় গোল দেয় দশটি। হাঙ্গেরীর দুর্ভাগ্য যে তারা সর্বোচ্চ গোল দেওয়া সত্ত্বেও

দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌঁছতে পারে নি। এবারের আসরে অধিকাংশ দলই খুব কম গোল দিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে খেলার সুযোগ পায়। এদের মধ্যে ইতালি ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ড দেয় মাত্র দুটি করে গোল।

প্রথম পর্যায়ের খেলায় মোট ছাপান্নজন খেলোয়াড়কে তাদের বদ আচরণের জন্য সতর্ক করা হয়। বহিষ্কার করা হয় তিনজন খেলোয়াড়কে। হলুদ কার্ড দেখানো হয়েছে মোট একুশজন খেলোয়াড়কে। লাল কার্ড দেখানো হয় তিনজনকে—এই তিনজন হলেন চেকোশ্লাভিয়ার ল্যাডিস্লাভ ডিজেক, হণ্ডুরাসের গিলবার্ট ইয়ারমুড ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের মাল ডোনাগিকে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের বারোটি দলকে মোট চারটি বিভাগে ভাগ করা হয়। খেলাকে গুটিয়ে আনা হয় দুটি শহরে—মাদ্রিদ ও বার্সিলোনায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের চারটি বিভাগকে যথাক্রমে ভাগ করা হয়—

গ্রুপ ক   পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, সোভিয়েত।
গ্রুপ খ   পশ্চিম জার্মানী, ইংল্যাণ্ড ও স্পেন।
গ্রুপ গ   ইতালি, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল।
গ্রুপ ঘ   উত্তর আয়ারল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্স।

উপরোক্ত বারোটি দলের মধ্যে ব্রাজিল ছিল ফেবারিট। গ. বিভাগে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা এক গ্রুপে থাকায় সকলেই আশা করলেন ব্রাজিল'ই দ্বিতীয় পর্যায়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হবে। ফাইনালে সম্ভাব্য দল হিসাবে ব্রাজিলের মুখোমুখি কোন দল লড়াই করবে, তাই নিয়ে শুরু হলো জল্পনা-কল্পনা। অনেকেই এই ব্যাপারে স্থির কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেন না। তারা আশা করলেন বিরাশির ফাইনালে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে হয়ত মোকাবিলা করতে পারে সোভিয়েত, পশ্চিম জার্মানী অথবা ইংল্যাণ্ড! তবে সমস্ত অঙ্কই নির্ভর করছে দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলার ওপর।

দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলা

দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু অঘটন ঘটে গেল। যে বেলজিয়াম প্রথম পর্যায়ের লীগে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে চমক তুলেছিল, সেই তারা এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম খেলায় হেরে বসলো পোল্যাণ্ডের কাছে। বোনিয়েকের দেওয়া তিনটি গোলে পোল্যাণ্ড জয় পেল বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলায় প্রথম হ্যাটট্রিক করলেন বোনিয়েক। পরের ম্যাচে পোল্যাণ্ড দুরন্ত লড়াই করলো সোভিয়েত দলের সঙ্গে। এই ম্যাচে কোন পক্ষই ৯০ মিনিটের খেলায় গোল করতে পারলো না। শেষ ম্যাচে সোভিয়েত দল বেলজিয়ামকে ১-০ গোলে হারালেও তাদের প্রতিযোগিতা থেকে সরে যেতে হলো। দ্বিতীয় বিভাগের দুটি খেলায় তিন পয়েণ্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ান হলো পোল্যাণ্ড।

দ্বিতীয় পর্যায়ের খ বিভাগের খেলায় দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রতিযোগিতা থেকে সরে যেতে হলো ইংল্যাণ্ডকে। তারা প্রথম পর্যায়ের দুটি খেলাতেই পরাজয় এড়িয়ে গেলেও, জয়ের মুখ দেখতে পেল না। স্পেন ও পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে দুটি খেলা গোলশূন্য ভাবে শেষ করার ফলে তাদের অপরাজিত থেকেও টুর্নামেণ্ট থেকে বিদায় নিতে হলো। শেষ ম্যাচে পশ্চিম জার্মানী স্পেনকে ২-১ গোলে হারিয়ে উঠে এলো সেমিফাইনালে। এই ম্যাচে স্পেনীয় খেলোয়াড়েরা প্রাণপণ লড়াই করেছিলেন। কিন্তু বড় ম্যাচ জিততে গেলে যে স্ট্যামিনার প্রয়োজন তা স্পেন দলের ছিল না। তাই বিপুল জনসমর্থন পাওয়া সত্ত্বেও তারা সুযোগকে কাজে লাগাতে পারলো না। দ্বিতীয়ার্ধে ড্রেমলার উজ্জীবিত হয়ে ওঠার ফলেই পশ্চিম জার্মানী ম্যাচে এগিয়ে যায়। প্রথম গোল করলেন লিটবারস্কি।

পঞ্চাশ মিনিটে ড্রেমলারের শট গোলরক্ষক লুইস আরাতোনাভার হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলে লিটবারস্কি বলটিকে গোলে ঠেলে দেন। দ্বিতীয় গোল হয় ৭৫ মিনিটে। লিটবারস্কির পাস থেকে ফিশার করলেন দলের দ্বিতীয় গোল। শেষ দিকে স্পেন জোরদার লড়াই চালিয়ে একটি গোল শোধ করলেও—তারা ম্যাচ বাঁচাতে পারলো না। ফলে জার্মান দল উঠে এলো সেমিফাইনালে।

ঘ বিভাগের খেলায় চমক তুললো ফ্রান্স। তারা অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে জয় পেল ১-০ গোলে। গোল করলেন জেনঘিনি। তার ফ্রিকিক অস্ট্রিয়া গোলরক্ষক ফ্রিডেল কলচিলিয়ার নাগাল টপকে গোলে প্রবেশ করে। এই ম্যাচে ফ্রান্সের আরও বড় ব্যবধানে জয় এলেও কারো কিছু বলার থাকতো না। পরের ম্যাচে অস্ট্রিয়া উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের মধ্যে খেলাটি শেষ হলো ২-২ গোলে। ফলে অস্ট্রিয়ার পক্ষে সেমিফাইনালে ওঠার সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। শেষ ম্যাচে ফ্রান্স উত্তর আয়ারল্যাণ্ডকে ৪-১ গোলে হারিয়ে অতি সহজে চলে গেল সেমিফাইনালে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে সব চেয়ে আকর্ষণীয় খেলা ছিল গ বিভাগে। এই বিভাগে ছিল বিশ্বের তিনটি সেরা দল—ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা এবং ইতালি। এই তিন দলের মধ্যে প্রথম পর্যায়ের খেলার বিচারে বিশেষজ্ঞের দল ব্রাজিলকেই ফেবারিট হিসাবে চিহ্নিত করলেন। ইতালি সম্পর্কে কারো মনে বড় একটা উৎসাহ ছিল না। কিন্তু এই পর্যায়ের খেলা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজির মতো উল্টে গেল সমস্ত ভাবনা চিন্তা—কোন অঙ্কই এই গ্রুপের খেলায় কার্যকরী হলো না। যে ইতালি সম্পর্কে সবাই উদাসীন ছিলেন, সেই ইতালি দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলায় বাজিমাৎ করে—বিশ্বকাপ আসরে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করলো।

দ্বিতীয় পর্যায়ের গ বিভাগের প্রথম খেলায় গতবারের চ্যাম্পিয়ান আর্জেন্টিনার সুপার স্টার মারাদোনা এই ম্যাচে সফল হতে পারলেন

না। ইতালির পক্ষে এই উল্লেখযোগ্য ম্যাচে দুটি গোল পেলেন মার্কো-তারাডলি ও অ্যান্টনিও ক্র্যাব্রিনি। আর্জেন্টিনার পক্ষে গোল শোধ করলেন অধিনায়ক পাসারেলা। শুধু প্রথম ম্যাচে নয়—দ্বিতীয় ম্যাচেও আর্জেন্টিনাকে শোচনীয়ভাবে বিধ্বস্ত হতে হলো ব্রাজিলের হাতে। শিল্প সমৃদ্ধ ব্রাজিল দল ঝড়ের বেগে ফুটবল খেলে ৩-১ গোলে বিধ্বস্ত করলো প্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনাকে। ব্রাজিলের পক্ষে তিনটি গোল দিলেন যথাক্রমে জিকো, সার্জিনহো এবং জুনিয়র। আর্জেন্টিনার পক্ষে একটি মাত্র গোল এলো দিয়াজের দুরন্ত শট থেকে। ব্রাজিলের কাছে আর্জেন্টিনার এই শোচনীয় পরাজয়ের পর মারাদোনা বললেন, "এই বিশ্বকাপের সঙ্গে সঙ্গে আর্জেন্টিনার ফুটবলের স্বর্ণযুগ শেষ হয়ে গেল। একটি সাফল্যের চক্র ঘুরে এল আর্জেন্টিনা এবং আবার আমাদের ধাপে ধাপে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছতে হবে।"

পরপর দুটি ম্যাচে আর্জেন্টিনার পরাজয়ের ফলে এই গ্রুপে তুমুল সংঘর্ষের মুখোমুখি হলো ব্রাজিল এবং ইতালি। এই ম্যাচকে ঘিরে ব্রাজিলের পক্ষেই ছিল ব্যাপক জনসমর্থন। তারা যে ইতালিকে সহজে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছতে পারবে এই বিষয়ে কারো মনে কোন সন্দেহ ছিল না।

পাওলা রোসি ইতালিকে স্বপ্ন দেখালো

ইতালিকে সহজে ম্যাচ হারিয়ে ব্রাজিল যে জয় পাবে এই বিশ্বাসবোধে সবাই প্রায় নিশ্চিন্ত ছিলেন। চ্যাম্পিয়ান ব্রাজিল দলের কোচ তেলে সান্তানা কখনই আশা করেন নি তার হাতের তৈরি ব্রাজিল ডিফেনডারদের অকেজো প্রমাণ করে গত বিশ্বকাপের সাড়া জাগানো ইতালিয়ান নায়ক পাওলা রোসি দীর্ঘকাল বাদে ফুটবলে পা দিয়ে একাই পরপর তিনটি গোল চাপিয়ে ব্রাজিলের সমস্ত সম্ভাবনাকে

মুছে ফেলে তার গালে চুন-কালি লেপে দেবেন। এই ম্যাচে রোসি দৈব নির্ভর যন্ত্রের মতো ফুটবল খেললেন। গত দুবছর রোসির সঙ্গে ফুটবলের কোন সম্পর্ক ছিল না। তার বিরুদ্ধে ছিল বিস্তর অভিযোগ—ফলে ইতালি ফুটবল ফেডারেশন রোসিকে সাসপেণ্ড করেছিলেন। জাতীয় দলে নির্বাচিত হওয়ার আগে রোসি মাত্র দুটি ম্যাচ খেলেছিলেন। এবার বিশ্বকাপের আগের চারটি খেলায় তিনি বড় একটা সুবিধে করতে পারেন নি। বিজ্ঞাপিত নায়ক আর্জেন্টিনার মারাদোনা ও ব্রাজিলের জিকোর পাশে তিনি ম্লান নক্ষত্রের মতো বিচরণ করছিলেন। সেই রোসি হঠাৎ ফুটবল রঙ্গমঞ্চে আত্মনির্ভরতায় প্রতিষ্ঠা পেলেন ব্রাজিলের বিরুদ্ধে একাই তিন-তিনটি গোল দিয়ে। রোসির তৎপরতায় এই দিন ব্রাজিলের পক্ষে সম্ভব হয় নি একটিবারও গোল করে এগিয়ে যাওয়া।

প্রথম পাঁচ মিনিটের মাথায় ক্র্যাবিনির সেণ্টার ব্রাজিলের ডিফেনডারেরা দেখে শুনে ছেড়ে দিলেন। তারা ভাবতে পারেন নি তৎপর রোসি সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে ছুটে গিয়ে সেই বলে মাথা ছোঁয়াতে পারেন, হলোও তাই—ডিফেন্সের ভুলে রোসি হেড করার সুযোগ পেয়ে ইতালিকে প্রথম এগিয়ে দিলেন। বারো মিনিটের মাথায় জিকোর সঙ্গে বল নিয়ে পেনালটি বক্সে ঢুকে সক্রেটিস কোণাকুণি শটে গোল শোধ করলেন। এরপর মাঝমাঠে চললো লড়াই। ব্রাজিল ধীরে ধীরে খেলায় ফিরে আসার চেষ্টা করতে লাগলো। ২৫ মিনিটের সময় বক্সের মাথায় দাঁড়িয়ে সেরেজো বল বিপদসীমার বাইরে পাঠাবার চেষ্টা না করে নিখুঁত পাসে তুলে দিলেন রোসির পায়ে। কৃতজ্ঞচিত্তে রোসি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে দলের হয়ে দ্বিতীয় গোল করলেন। পিছিয়ে পড়া ব্রাজিল এবার শুরু করলো একটানা ঝড়ো আক্রমণ। ৬৮ মিনিটে ফালকাও বাঁ পায়ের জোরালো শটে খেলার সমতা ফিরিয়ে আনলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ব্রাজিলের—এইদিন যেন তাদের রোসির হাতে পরাজয়ের লিখন বহু আগে লেখা হয়ে গিয়েছিল। তা না হলে ৭৪ মিনিটের

নিরীহ কর্ণার শটটি অতগুলো ব্রাজিলিয়ান ডিফেনডারের নাগাল টপকে কিভাবে এসে পৌঁছেছিল রোসির কাছে? রোসি হয়ত নিজেও বুঝতে পারেন নি—গোল করার মতো এমন একটা সহজ সুযোগ তার কপাল ছুঁয়ে যাবে। রোসির দেওয়া এই তৃতীয় গোলেই ব্রাজিলের সমস্ত আশা ভেঙেচুরে দিল—জাগিয়ে তুললো ইতালির মনে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ব্রাজিল গোল শোধ করার জন্য প্রাণপণ লড়াই করেছিল, কিন্তু তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হলো—জিকোর ফ্রিকিক শেষ মুহূর্তে ক্রসপিশে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যেতেই তেলে সান্তানা বুঝতে পারলেন, ম্যাচ তার হাতছাড়া হয়ে গেছে। মাত্র ৯০ মিনিটের মধ্যে বিশ্বফুটবলের হারিয়ে যাওয়া নায়ক পাওলা রোসি আবার অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরে এলেন বিশ্বফুটবল রঙ্গমঞ্চে—প্রমাণ করলেন তার নিজের অস্তিত্বকে। ইতালি দ্বিতীয় পর্যায়ের দুটি খেলায় জয়ের ফলে পাওলা রোসি হয়ে উঠলেন স্পেনের বিশ্বকাপ আসরে অন্যতম সেরা নায়ক।

দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলা শেষে ফলাফল দাঁড়ালো :—

ক বিভাগ

পোল্যাণ্ড	২—১—১—০—৩—০—৩
রাশিয়া	২—১—১—০—১—০—৩
বেলজিয়াম	২—০—০—২—০—৪—০

খ বিভাগ

পঃ জার্মানী	২—১—১—০—২—১—৩
ইংল্যাণ্ড	২—০—২—০—০—০—২
স্পেন	২—০—১—১—১—২—১

গ বিভাগ

ইতালি	২—২—০—০—৫—৩—৪
ব্রাজিল	২—১—০—১—৫—৪—৩
আর্জেন্টিনা	২—০—০—২—২—৫—০

ঘ বিভাগ

ফ্রান্স	২—২—০—০—৫—১—৪
অষ্ট্রিয়া	২—০—১—১—২—৩—১
আয়ারল্যাণ্ড	২—০—১—১—৩—৬—১

উপরোক্ত চারটি বিভাগের চারটি চ্যাম্পিয়ান দল উঠে এলো সেমিফাইনালে। সেমিফাইনালের দুটি খেলায়, একটিতে ইতালিকে মিলিত হতে হলো পোল্যাণ্ডের সঙ্গে, অন্যটিতে পশ্চিম জার্মানী মুখোমুখি হলো ফ্রান্সের সঙ্গে।

আবার সেই রোসি

বার্সিলোনায় অনুষ্ঠিত প্রথম সেমিফাইনালে আবার সেই গত দিনের মত মহানায়কের ভূমিকায় আবির্ভূত হলেন অভিজ্ঞ রোসি। ফুটবল যে শুধু মাত্র শারীরিক শক্তি বা প্রথা প্রকরণের খেলা নয়, এই খেলায় যে বুদ্ধির মুন্সিয়ানা প্রয়োজন তার প্রমাণ পাওয়া গেল পাওলো রোসির দু'-দুটি গোলের মধ্যে। ফুটবলের সমস্ত কাজকর্মকে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেও, ঠিক সময় ঠিক জায়গায় উপস্থিত থেকে যে গোল করা কত সহজে যায় তার প্রমাণ দিলেন রোসি। অথচ এইদিন পোল্যাণ্ডের শক্ত ডিফেনডারেরা রোসির দিকে কড়া নজর রেখেছিলেন। তারা ঠিকই করেছিলেন রোসিকে কিছুতেই গোলের সামনে বল ছুঁতে দেবেন না। অথচ আশ্চর্য সবাইকে বোকা বানিয়ে অভিজ্ঞ রোসি পোল্যাণ্ডের শক্ত প্রাচীর টপকে অতি সহজে দিয়ে দিলেন দু'-দুটি গোল। বিশেষ করে তার দ্বিতীয় গোলটি ছিল ছবির মতো। দেখে মনে হয়েছে তিনি যেন আগেভাগেই আন্দাজ করে নিতে পেরেছিলেন, কোথায় গিয়ে দাঁড়ালে বাঁদিক থেকে করা মাপা সেণ্টারটি তার মাথায় এসে পড়বে। তাই পোল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা সবাই অবাক হয়ে গেলেন, যখন তারা দেখতে পেলেন রোসি তাদের সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে একেবারে চুপিসারে এককোণে দাঁড়িয়ে পড়ন্ত

বলটিকে মাথা দিয়ে গোলে ঠেলে দিচ্ছেন। তখন আর কারো কিছু করার উপায় ছিল না—রোসির কপাল-ছোঁয়া বল ততক্ষণে জাল কাঁপিয়ে দিয়ে ইতালির জয়কে নিশ্চিত করে দিয়েছে। এই ম্যাচটি খুব একটা উচ্চমানের না হলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিপূর্ণ ছিল। পোল্যাণ্ড দল যে গোল করার সুযোগ পায় নি বা সুযোগ তৈরি করতে পারে নি তা নয়—তবে দলকে জেতাবার জন্য যে ধরনের ফুট-বলের প্রয়োজন ছিল তা তারা সাধ্য দিয়েও আদায় করতে পারে নি। শতাধিক যুদ্ধের নায়ক লাটোকে এইদিন অসম্ভব ক্লান্ত বলে মনে হয়েছে। বেনিয়েক পাশে না থাকায় মনে হয় তিনি খেলার মধ্যে কিছুতেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারছিলেন না। তবে এইদিন পোল্যাণ্ডকে জেতাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন দীর্ঘকায় কুপ-সেভিচ্। ইতালির পক্ষে প্রথম গোলটি আসে একটি ফ্রিকিক থেকে। বলটিকে ফ্রিকিকের সাহায্যে পেনালটি বক্সের মধ্যে ভাসিয়ে দিলে রোসি তার সদ্ব্যবহার করেন। প্রথম গোলটি করার সময় রোসির সামনে ছিলেন পোল্যাণ্ডের তিন-তিনজন ডিফেনডার। দ্বিতীয় গোলটি হয় আরো নিখুঁত। উইং দিয়ে আক্রমণ শানিয়ে ইতালি এই গোলটি পায়। লেফট্ উইং থেকে করা মাপা সেণ্টারে মাথা ছুঁয়ে রোসি যেমন রাতারাতি নিজেকে আবার বিখ্যাত করে তুললেন, তেমনি রোমবাসীর মনে জাগিয়ে তুললেন বিশ্বজয়ের সংকল্প। শেষ দুটি ম্যাচে ইতালির জয় তো রোসির জয়। দুটি ম্যাচে পাঁচটি গোল দিয়ে স্পেনের বিশ্বকাপে রাতারাতি পাওলা রোসি হয়ে উঠলেন বিশ্বনায়ক—ফিরে পেলেন তারা হারানো সিংহাসন। মারাদোনা, জিকোকে ছাপিয়ে রোসি দুটি ম্যাচের বিনিময়ে পৌঁছে গেলেন কোটি টাকার বাজার দরে। দীর্ঘ বারো বছর বাদে ইতালি আবার উঠলো বিশ্ব-কাপ ফাইনালে। ইতালি শেষবার ফাইনালে উঠেছিল ১৯৭০ সালে। এই ম্যাচে তারা ব্রাজিলের কাছে হেরে যায়। এখন প্রত্যেকের লক্ষ্য ফাইনালে রোসি কি করেন—তিনি এখন ইতালির তুরুপের তাস।

শতাব্দীর আর একটি সেরা ম্যাচ

বিশ্ব ফুটবলে শতাব্দীর সেরা ম্যাচ হিসাবে এতকাল চিহ্নিত ছিল ইতালি বনাম পশ্চিম জার্মানীর ১৯৭০ সালের সেমিফাইনাল ম্যাচটি। সেদিনের এই ম্যাচের নিষ্পত্তি ঘটেছিল ১২০ মিনিট খেলার শেষে —জয় পেয়েছিল ইতালি। দুরন্ত লড়াই করেও পশ্চিম জার্মানী সেই ম্যাচে হারতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৮২ সালে স্পেনের বুকে ফরাসী-জার্মান লড়াই আগের সেই উৎকর্ষতার মান মাত্রা যে ছাপিয়ে গিয়েছিল, একথা নিঃসন্দেহে সবাই স্বীকার করবেন। একশো কুড়ি মিনিট যুদ্ধের পরেও এই খেলার নিষ্পত্তি হয় নি। অপেক্ষা করতে হয়েছে টাইব্রেকার পদ্ধতির জন্য। আশ্চর্য এক অভাবনীয় লড়াই—শ্বাসরুদ্ধ এই টাইব্রেকার পদ্ধতিতেও কোন ফলাফল পাওয়া গেল না। উভয় দলই নিজেদের মর্যাদায় অক্ষুণ্ণ থাকলেন। কেউ কারো কাছে হারতে রাজি নয়। শেষ পর্যন্ত "সাডেন ডেথ"-এর আশ্রয় নিতে হলো —দুশো মিনিট মাঠে বিধ্বস্ত হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত হার-না-মানা হারে চোখের জলে বিদায় নিলো ফ্রান্স। এই ম্যাচ চোখে দেখার পরও বিশ্বাস হয় নি—একি আমরা ফুটবল দেখছি না অন্য কিছু। যেমন গতি, তেমনি প্রথাকরণের নিখুঁত গণিত গণনা। গোটা ম্যাচটি ঘিরে যেমন ছিল শ্বাসরুদ্ধ উত্তেজনা, তেমনি ছিল শিল্পের ঔজ্জ্বল্য এবং বিচিত্রতা। শেষ পর্যন্ত দুরন্ত লড়াই করে সমস্ত উত্তেজনার অবসান ঘটলো 'সাডেন ডেথ্' পদ্ধতিতে, একরকম ভাগ্য-জোরে জার্মান ম্যাচ হাতে পেয়ে গেল ৮-৭ গোলের ব্যবধানে। এই ম্যাচে নির্দিষ্ট সময় খেলা শেষ হয় ১-১ গোলে। এরপর শুরু হয় অতিরিক্ত সময়ের খেলা। এই অতিরিক্ত সময় ফ্রান্স যে ভাবে ফুটবল খেলে ৩-১ গোলে এগিয়ে ছিল, তাতে তাদের পক্ষে ম্যাচে হারার কথা ছিল না। অতিরিক্ত

সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকৃতপক্ষে ম্যাচে ফিরে আসে জার্মানী। বদলী রুমেনিগা মাঠে নেমেই বদলে দিলেন খেলার চিত্র। প্রথম তিনি মাঠে নেমেই একটি গোল দিয়ে ব্যবধান কমিয়ে আনলেন। এই গোলের পরই জার্মান দল খেলার মধ্যে প্রাধান্য ফিরে পায় এবং চালাতে থাকে একের পর এক আক্রমণ। শেষ মুহূর্তে ফিশারের কাছ থেকে বল পেয়ে চমৎকার গোলটি করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনলেন রুবেশ। ফলে অতিরিক্ত সময় খেলা যখন শেষ হলো তখন ফলাফল দাঁড়ালো ৩-৩।

টাই-ভাঙা পদ্ধতিতে ম্যাচ জেতার সুযোগ প্রথম আসে ফ্রান্সের হাতে। উল্লি স্টিয়েলিকে একটি পেনালটি শট সদ্ব্যবহার করতে না পারায় ফ্রান্স এগিয়ে যায় ৩-২ গোলের ব্যবধানে। কিন্তু ঠিক তার পরের শটটিতে ফ্রান্সের দিদিয়ের সিক্স গোল করতে না পারায়, প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে আবার টাই ভাঙার খেলায় ফিরে আসে সমতা। ফলে এই পর্যায়ে খেলাটি শ্বাসরুদ্ধ উত্তেজনার মধ্যে শেষ হয় ৪-৪ গোলে। শেষ পর্যন্ত পরবর্তী স্তরে 'সাডেন ডেথ্' পদ্ধতিতে ভাগ্য-জোরে ম্যাচ হাতে পেয়ে যায় পশ্চিম জার্মানী। তারা ২-১ গোলে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ম্যাচের নিষ্পত্তি ঘটে। বীরের মতো লড়াই করে ম্যাচ হারতে হয় ফ্রান্সকে।

ফ্রান্স ম্যাচ হারলেও, তাদের কাছে পরাজয় ছিল দস্তুর মতো বীরোচিত। তাদের বিন্যস্ত ক্রীড়াপদ্ধতি ও গতির কাছে পশ্চিম জার্মানীকে বহু সময় মাঠের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় নি। সারাক্ষণ এই ম্যাচে জার্মান খেলোয়াড়েরা দেয়ালে পিঠ রেখে লড়াই করেছিলেন। দুর্ভাগ্য ফ্রান্সের—শেষ মুহূর্তে ম্যানুয়েল অ্যামোরসের একটি জোরালো শট ক্রশবারে লেগে আশ্চর্যজনক ভাবে ফিরে যায়। যদি ভাগ্য-বিড়ম্বিত ফরাসীরা এই গোলটি পেয়ে যেতেন, তাহলে কিছুতেই তাদের এইভাবে ম্যাচটি হারাতে হতো না। বরং অনায়াসে তারা পৌঁছতে পারতেন ফাইনালে। আসলে বড় আসরে ফুটবল খেলতে

গেলে স্ট্যামিনার যে কত প্রয়োজন হয় তা বোঝা গেল, এই ঐতিহাসিক উত্তেজনাময় ম্যাচে জার্মানীর জয় ছিল দেখার পর। বলা বাহুল্য এই নিয়ে জার্মান দল ইতালির মতো চারবার উঠলো ফাইনালে। সেই সঙ্গে তারা অংশ নিলো বিশ্বের দুটি সেরা ম্যাচে— যে দুটি ম্যাচ বিশ্ব ফুটবলের বুকে 'শতাব্দীর সেরা' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

ইতালির জয় অনিবার্য ছিল

দ্বিতীয় পর্যায়ে বিশ্বের সেরা তিনটি দলকে নাটকীয়ভাবে বিধ্বস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বকাপ জয় ইতালির কাছে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। কোথায় ফাইনাল খেলে ব্রাজিলের জিকো গলায় সোনার মেডেল ঝোলাবেন, সক্রেটিস দেশের হাতে তুলে দেবেন স্বর্ণকাপ, এটাই তো ছিল ৮২'র আসরে পণ্ডিতদের গণনা। অথচ সকলের সমস্ত অঙ্ককে ভুল প্রমাণ করে, নাটকীয়ভাবে ফুটবল রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে বিগত নায়ক পাওলো রোসি যেমন নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিলেন, সেই সঙ্গে চুয়াল্লিশ বছর বাদে ইতালির হাতে তুলে দিলেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ান-শিপের সেরা শিরোপা—'ফিফা কাপ'।

মাদ্রিদের রাজসিক পরিবেশে ইতালির জয় অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। প্রথম পর্বে পশ্চিম জার্মানী তেড়েফুঁড়ে শুরু করলেও, গোল করার মতো কোন যোগ্য সুযোগ আদায় করতে পারে নি। ইতালির কঠিন ডিফেন্সের সামনে বারবার বাধা পেয়ে ফিরে গেছেন পশ্চিম জার্মানীর আক্রমণকারীরা। রুমেনিগা, ব্রাইটনার, ফিশার মাঝমাঠ থেকে সাধ্যমতো প্রথা প্রকরণকে কাজে লাগিয়ে উপরে উঠে এলেও, বাধা পেয়ে ফিরে গেছেন ইতালির রক্ষণভাগের অমানুষিক দৃঢ়তায়। একটা বলকে কিভাবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে বিপদ সীমানার বাইরে ঠাণ্ডা মাথায় বার করে নিতে হয় তার প্রমাণ বার বার দিয়েছেন

জেন্টিল, কালোভাতি, ক্যাব্রিনি। প্রথম কুড়ি মিনিট জার্মান আস্ফালন শেষ হলে মাঝমাঠে খেলা ধরলো ইতালি। কন্টি প্রচণ্ড গতিতে জার্মান রক্ষণভাগকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে প্রায় যখন গোলের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন—ঠিক তখনই তাকে পিছন থেকে অবৈধ ভাবে প্রতিরোধ করার চেষ্টায় পেনালটির নির্দেশ দিলেন ব্রাজিলিয়ান রেফারি। তুর্ভাগ্য ক্যাব্রিনির, জীবনপণ লড়াই করেও দিনটি তার কাছে পুরোপুরি সুখের হলো না। বিশ্বকাপের ফাইনালের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ খেলায় তিনি জনসমক্ষে পেনালটির মতো সহজ সুযোগ নষ্ট করলেন। ক্যাব্রিনির এই পেনালটি অপচয় সবাই ভেবেছিলেন ইতালি হয়ত মানসিক দিক দিয়ে তুর্বল হয়ে পড়বে। বিশেষ করে যারা সংস্কারের তুর্বলতায় ভোগেন তারা মনে মনে অন্য হিসাব কষতে লাগলেন। কিন্তু সেই অঙ্ক যে কত মিথ্যে আবার তা প্রমাণ করে ইতালিকে দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম জয়ের মুখ দেখালেন বিরাশির ফুটবলের সেরা নায়ক পাওলো রোসি। দ্বিতীয়ার্ধে ইতালি শুরু করে নতুন ধারায় খেলা। তারা আত্মরক্ষার খোলস ছাড়িয়ে শুরুতেই আক্রমণে ফিরে যায়। ডান দিক থেকে বেশ কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টার পর জেন্টিল এক সময় জার্মান ডিফেনডারকে ভেঙেচুরে চমৎকার একটি নিচু সেন্টারে বলটি ভিতরে গড়িয়ে দিলেন। চকিতে সেই বলে বাজপাখির মতো ছুটে গিয়ে সবাইকে অপ্রস্তুত করে পাওলো রোসি বিস্ময়কর ভাবে মাথা ছুঁয়ে দিলেন। বল গোলে প্রবেশ করামাত্র সবাই অবাক! ইতালি এগিয়ে গেল। এই গোলের পরই যেন ইতালিয়ানরা সমস্ত খেলাটিকে একেবারে নিজেদের পকেটে পুরে ফেললেন। দ্বিতীয় গোলটি দর্শনীয় ভাবে দিলেন দীর্ঘকায় তারাদলি। চমৎকার এই গোলটির জন্য যে কোন পরিমাণ অর্থ দর্শকেরা ব্যয় করতে মনে হয় কার্পণ্য বোধ করবেন না। কন্টির কাছ থেকে বলটি পাওয়ার পর তারাদলি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে যে গোলটি করলেন, তা যেমন ইতালিকে ব্যবধান বাড়াতে সাহায্য করেছিল,

তেমনি তিনি নিজেকে লোভনীয় করে তুলেছিলেন যে কোন ফুট-বলারের কাছে। এই দিন মাঝমাঠে তারাদলির ভূমিকা ছিল অবর্ণনীয়, দলের সমস্ত দায়িত্ব তিনি যেন একাই কাঁধের ওপর তুলে নিয়েছিলেন। হয়ত তারই জন্য তাকে এই ম্যাচে 'ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ' হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। জার্মান আক্রমণের সমস্ত প্রবণতা ধূলিসাৎ হয়ে যায় তৃতীয় গোলটি হওয়ার পর। এই গোলটিও তারাদলির তুলনায় কম দর্শনীয় ছিল না। ডানদিক থেকে কন্টির কাছ থেকে বল পেয়ে আলতোবেলি চমৎকার ভাবে আগুয়ান গোলরক্ষককে ডান দিকে সরিয়ে নিয়ে বাঁ পায়ের শটে দর্শনীয় গোলটি করলেন। এই গোলের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইতালির বিশ্বকাপ জয় অনিবার্য হয়ে যায়। রুমানিগা প্রাণপণ চেষ্টা করেও এই ম্যাচে গোল করার সুযোগ পেলেন না। খেলা শেষ হওয়ার সাত মিনিট আগে ব্রিটনার চমৎকার শট নিয়ে জার্মান পক্ষের একটি মাত্র সান্ত্বনা-সূচক গোলটি পেলেন। সব মিলিয়ে বলা যায় বিরাশির ফাইনাল ম্যাচটি যেন ইতালির জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। রুমেনিগার দুর্ভাগ্য তিনি এই ম্যাচে গোল করার মতো কোন সুযোগ পেলেন না। ফলে বিরাশির নায়ক, পাওলো রোসি মোট ছয়টি গোল দিয়ে এবারের টুর্নামেন্ট হলেন সেরা গোলদাতা—সেই সঙ্গে হাতে পেলেন টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের সম্মান।

৩-১ গোলে ফাইনাল শেষ হলো। অন্যদিকে তৃতীয় স্থান নির্বাচনের খেলায় ফ্রান্স ৩-১ গোলে হেরে গেল পোল্যাণ্ডের কাছে।

৮২'র আসরে মোট ৫২টি খেলায় গোল হয় ১৪৬টি। পাওলো রোসির পক্ষে এবার সাংবাদিকেরা দিলেন সর্বোচ্চ ভোট—৪৩৭টি। ৮২'র রমণীয় বিশ্বকাপের আসর শেষ হলো—আবার অপেক্ষা করতে হবে চার বছর—১৯৮৬। আগামী আসর কোথায় বসবে, সেকি কলাম্বিয়ায় নাকি অন্য কোথাও?

কে কোথায় কোনবারের চ্যাম্পিয়ান (১৯৩০-৮২)

সাল	স্থান	চ্যাম্পিয়ান দল	রানার্স	ফলাফল
১৯৩০	উরুগুয়ে	উরুগুয়ে	আর্জেন্টিনা	৪—২
১৯৩৪	ইতালি	ইতালি	চেকোশ্লাভিয়া	২—১
১৯৩৮	ফ্রান্স	ইতালি	হাঙ্গেরী	৪—২
(১৯৩৯—১৯৪৯ পর্যন্ত বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয় নি)				
১৯৫০	ব্রাজিল	উরুগুয়ে	ব্রাজিল (লীগ ভিত্তিতে খেলা)	
১৯৫৪	সুইজারল্যাণ্ড	পঃ জার্মানী	হাঙ্গেরী	৩—২
১৯৫৮	সুইডেন	ব্রাজিল	সুইডেন	৫—২
১৯৬২	চিলি	ব্রাজিল	চেকোশ্লাভিয়া	৩—১
১৯৬৬	ইংল্যাণ্ড	ইংল্যাণ্ড	পঃ জার্মানী	৪—২
১৯৭০	মেক্সিকো	ব্রাজিল	ইতালি	৪—১
১৯৭৪	পঃ জার্মানী	পঃ জার্মানী	হল্যাণ্ড	২—১
১৯৭৮	আর্জেন্টিনা	আর্জেন্টিনা	হল্যাণ্ড	৩—১
১৯৮২	স্পেন	ইতালি	পঃ জার্মানী	৩—১

তৃতীয় স্থান ও চতুর্থ স্থান কারা পেয়েছেন (১৯৩০-৮২)

সাল	দেশ	তৃতীয়	চতুর্থ	ফলাফল
১৯৩৪	ইতালি	জার্মানী	অস্ট্রিয়া	৩—২
১৯৩৮	ফ্রান্স	ব্রাজিল	হাঙ্গেরী	৪—২
১৯৫০	ব্রাজিল	সুইডেন	স্পেন	*
১৯৫৪	সুইজারল্যাণ্ড	অস্ট্রিয়া	উরুগুয়ে	৩—১
১৯৫৮	সুইডেন	ফ্রান্স	পঃ জার্মানী	৬—৩
১৯৬২	চিলি	চিলি	যুগোশ্লাভ	১—০
১৯৬৬	ইংল্যাণ্ড	পর্তুগাল	রাশিয়া	২—১
১৯৭০	মেক্সিকো	পঃ জার্মানী	উরুগুয়ে	১—০
১৯৭৪	পঃ জার্মানী	পোল্যাণ্ড	ব্রাজিল	১—০
১৯৭৮	আর্জেন্টিনা	ব্রাজিল	ইতালি	২—১
১৯৮২	স্পেন	পোল্যাণ্ড	ফ্রান্স	৩—১

বিভিন্ন দেশের বিশ্বকাপে সার্বিক ফলাফল (১৯৩০-৮২)

দেশ	চূড়ান্ত পর্ব	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ
ব্রাজিল	১২	৩	১	২	১
ইতালি	১০	৩	১	×	১
পঃ জার্মানী	১০	২	২	২	১
হাঙ্গেরী	৮	×	২	×	১
উরুগুয়ে	৮	২	১	×	২
আর্জেন্টিনা	৮	১	১	×	×
যুগোশ্লাভিয়া	৮	×	×		১
ফ্রান্স	৮	×	×	১	১
মেক্সিকো	৮	×	×	×	×
চেকোশ্লাভ	৭	×	২	×	×
সুইডেন	৬	×	১	১	১
ইংল্যাণ্ড	৭	১	×	×	×
হল্যাণ্ড	৫	×	২	×	×
অস্ট্রিয়া	৫	×	×	১	১
পোল্যাণ্ড	৪	×	×	২	×
রাশিয়া	৫	×	×	×	১
স্পেন	৬	×	×	×	১
রুমানিয়া	৪	×	×	×	×
সুইজারল্যাণ্ড	৬	×	×	×	×
বুলগেরিয়া	৩	×	×	×	×
স্কটল্যাণ্ড	৫	×	×	×	×

বিশ্বকাপে স্টপ স্কোরার (১৯৩০-৮২)

সাল	খেলোয়াড়	দেশ	গোলসংখ্যা
১৯৩০	স্টাবিল	আর্জেন্টিনা	৮টি
১৯৩৪	নেজেদলি	চেকোশ্লাভ	৪টি
,,	শিয়াভিও	ইতালি	৪টি
,,	কনেন	জার্মান	৪টি
১৯৩৮	লিওনিডাস	ব্রাজিল	৮টি
১৯৫০	আদেমির মেনেজেস	ব্রাজিল	৭টি
১৯৫৪	কোজিস	হাঙ্গেরী	১১টি
১৯৫৮	ফনটাইন	ফ্রান্স	১৩টি
১৯৬২	আলবার্ট	হাঙ্গেরী	৪টি
১৯৬২	গ্যারিঞ্চা	ব্রাজিল	৪টি
১৯৬২	ভাভা	,,	৪টি
১৯৬২	জারকোভিক	যুগোশ্লাভ	৪টি
১৯৬২	ইভানভ	রাশিয়া	৪টি
১৯৬২	এলসানচেজ	চিলি	৪টি
১৯৬৬	ইউসোবিও	পর্তুগাল	৯টি
১৯৭০	মুলার	পঃ জার্মানী	১০টি
১৯৭৪	লাটো	পোল্যাণ্ড	৭টি
১৯৭৮	কাম্পেস	আর্জেন্টিনা	৬টি
১৯৮২	পাওলো রোসি	ইতালি	৬টি

কোন বিশ্বকাপে কত গোল (১৯৩০-৮২)

সাল	খেলা	গোল সংখ্যা
১৯৩০	১৮টি	৭০টি
১৯৩৪	১৭টি	৭০টি
১৯৩৮	১৮টি	৮৪টি
১৯৫০	২২টি	৮৮টি
১৯৫৪	২৬টি	১৩০টি
১৯৫৮	৩৪টি	১২৮টি
১৯৬২	৩২টি	৮৮টি
১৯৬৬	৩২টি	৯১টি
১৯৭০	৩২টি	৯৫টি
১৯৭৪	৪০টি	১০১টি
১৯৭৮	৩৮টি	১০১টি
১৯৮২	৫২টি	১৪৬টি
একাদশ বিশ্বকাপ পর্যন্ত—	৩৬১টি	১১৯২টি

বিশ্বকাপে সফল অধিনায়ক

সাল	দেশ	অধিনায়ক	রানার্স	অধিনায়ক
১৯৩০	উরুগুয়ে	নাসাজি	আর্জেন্টিনা	ফেরিয়া
১৯৩৪	ইতালি	কম্বি	চেকোশ্লাভ	প্লানিকা
১৯৩৮	ইতালি	মিজ্জা	হাঙ্গেরী	সারোশি
১৯৫০	উরুগুয়ে	ভারেলা	ব্রাজিল	অগাস্টো
১৯৫৪	পঃ জার্মানী	ওয়ালটার	হাঙ্গেরী	বোজসিক
১৯৫৮	ব্রাজিল	বেলিনি	সুইডেন	বার্গমারক
১৯৬২	ব্রাজিল	মাউরো	চেকোশ্লাভ	নোভাক
১৯৬৬	ইংল্যাণ্ড	ববিমুর	পঃ জার্মানী	স্কালজ
১৯৭০	ব্রাজিল	আলবার্টো	ইতালি	ফ্যাচেত্তি

সাল	দেশ	অধিনায়ক	রানার্স	অধিনায়ক
১৯৭৪	পঃ জার্মানী	বেকেনবাউয়ার	হল্যাণ্ড	ক্রুয়েফ
১৯৭৮	আর্জেন্টিনা	পাসারেলা	হল্যাণ্ড	ক্রল
১৯৮২	ইতালি	দিনোডফ	পঃ জার্মানী	রুমেনিগা

স্বদেশে যাঁরা বিশ্বকাপ পেয়েছেন

সাল	স্থান	বিজয়ী	রানার্স
১৯৩০	উরুগুয়ে	উরুগুয়ে	আর্জেন্টিনা
১৯৩৪	ইতালি	ইতালি	চেকোশ্লাভিয়া
১৯৬৬	ইংল্যাণ্ড	ইংল্যাণ্ড	পঃ জার্মানী
১৯৭৪	পঃ জার্মানী	পঃ জার্মানী	হল্যাণ্ড
১৯৭৮	আর্জেন্টিনা	আর্জেন্টিনা	হল্যাণ্ড

বিশ্বকাপে হাজার গোল

গোল সংখ্যা	গোল দাতা	দেশ	সাল
১	ম্যাকঘি	যুক্তরাষ্ট্র	১৯৩০
১০০	জোনাসন	সুইডেন	১৯৩৪
২০০	ওয়াটারস্ট্রোয়েম	সুইডেন	১৯৩৮
৩০০	চিকো	ব্রাজিল	১৯৫০
৪০০	লেফার	তুরস্ক	১৯৫৪
৫০০	রান	পঃ জার্মানী	১৯৫৮
৬০০	জারকোভিন	যুগোশ্লাভ	১৯৬২
৭০০	চালর্টন	ইংল্যাণ্ড	১৯৬৬
৮০০	জিয়ারজিনো	ব্রাজিল	১৯৭০
৯০০	ইয়াজালডে	আজেন্টিনা	১৯৭৪
১০০০	রেনসেনব্রিঙ্ক	হল্যাণ্ড	১৯৭৮

বেশিবার যাঁরা বিশ্বকাপ খেলেছেন (১৯৩০-৮২)

কত বার		নাম	দেশ
৪	,,	উয়েজিলার	পঃ জার্মানী
৪	,,	পেলে	ব্রাজিল
৪	,,	ববিচালর্টন	ইংল্যাণ্ড
৩	,,	রিভালিনো	ব্রাজিল
,,	,,	গ্যারিঞ্চা	,,
,,	,,	ডিডি	,,
,,	,,	জিলমার	,,
,,	,,	জালমা স্যাণ্টোস	,,
,,	,,	ইয়াসিন	রাশিয়া
,	,,	ইভানভ	,,
,,	,,	ওভারাথ	পঃ জার্মানী
,,	,,	বেকেনবাউয়ার	,,
,,	,,	গর্ডন মুলার	,,
,,	,,	শেপ মেয়ার	,,
,,	,,	স্নেলিঞ্জার	,,
,,	,,	গ্রসিকস	হাঙ্গেরী
,,	,,	নোভাক লাসিস্লাভ	চেক
,,	,,	লাটো	অস্ট্রিয়া
,,	,,	ক্যাম্পেস	আর্জেন্টিনা

বিশ্বকাপ প্রসঙ্গ

* বিশ্বকাপ (১৯৩০-৮২) মোট বারো বার অনুষ্ঠিত হয় ।

* বারো বারের মধ্যে এই আসর সাত বার অনুষ্ঠিত হয় ইউরোপে এবং পাঁচ বার দক্ষিণ আমেরিকায় ।

* ইউরোপে অনুষ্ঠিত সাত বারের আসরে ছয় বার এই কাপ জয় করে ইউরোপের দেশগুলি এবং একবার দক্ষিণ মার্কিন মণ্ডলের দেশ।

* দক্ষিণ আমেরিকায় অনুষ্ঠিত পাঁচ বারের আসরে পাঁচ বারই এই কাপ দক্ষিণ আমেরিকার দেশ জয় করে।

* ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে মাত্র তিনটি দেশ এই কাপ ছয় বার জয় করে। যথাক্রমে—ইতালি ৩ বার, পঃ জার্মানী ২ বার, ইংল্যাণ্ড একবার।

* দক্ষিণ আমেরিকায় তিনটি দেশ বিশ্বকাপ মোট ছয় বার জয় করে। যথাক্রমে—ব্রাজিল তিনবার, উরুগুয়ে দু বার, ও আর্জেন্টিনা একবার।

* বারো বারের মধ্যে পাঁচটি দেশ স্বদেশে বিশ্বকাপ জয় করে। যথাক্রমে—ইতালি, পঃ জার্মানী, ইংল্যাণ্ড, উরুগুয়ে ও আর্জেন্টিনা।

* বিশ্বকাপে প্রথম কিক অফ কবার সম্মান পায় ফ্রান্স দল।

* বিশ্বকাপে প্রথম গোল করেন ফ্রান্সের লেফট ইন লুই লরেণ্ট।

* বিশ্বকাপে প্রথম হ্যাটট্রিক করেন বেলজিয়ামের ফরোয়ার্ড ফ্লোরেন্স।

* বিশ্বকাপে প্রথম চারটি গোল করেন আয়ারল্যাণ্ডের মুর।

* বিশ্বকাপে প্রথম বহিষ্কৃত হন পেরুর অধিনায়ক ডিলা ক্যাসিয়াস।

* বিশ্বকাপে প্রথম রিপ্লে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৪ সালে ইতালি বনাম স্পেনের মধ্যে।

* বিশ্বকাপে প্রথম পেনালটিতে গোল করেন ইতালির ইয়ারা-গোরি।

* বিশ্বকাপে প্রথম পেনালটি অপচয় করেন স্পেনের বিরুদ্ধে ব্রাজিলের রাইট ইন ডি. ব্রিটো।

* বিশ্বকাপে প্রথম আত্মঘাতি গোল করেন সুইজারল্যাণ্ডের লোয়েবার।

খেলার আরও কয়েকটি বই

জয়ন্ত দত্ত-র

পেলের ডায়েরী	১২·০০
আমি ভিশ বলছি	১৫·০০
দুরন্ত ক্রিকেটার কপিলদেব	১২·০০

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়-এর

স্মরণীয় ইনিংস

[এই বইতে আছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও অস্ট্রেলিয়ার একমাত্র টাই টেস্টের বিবরণ। আছে স্মরণীও ক্রিকেটারদের স্মরণীয় এক একটি করে ইনিংস। যেমন—লেন হাটন, ডন ব্র্যাডম্যান, সোবার্স, ফ্রাঙ্ক ওরেল, গডার্ড, কানহাই, পাতৌদি]   ৮·০০